সময়ের সংলাপ

গাজীউল হাসান খান

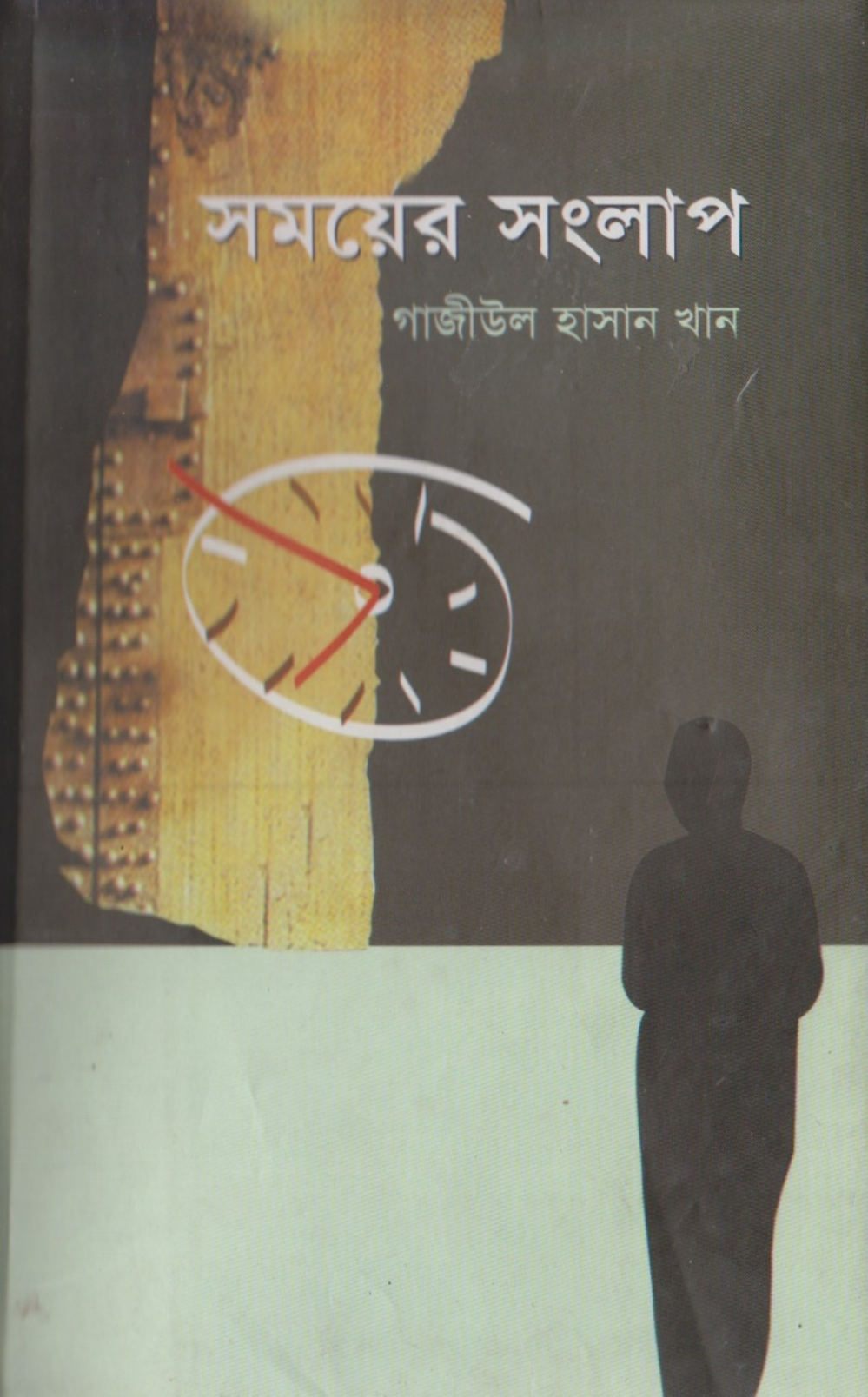

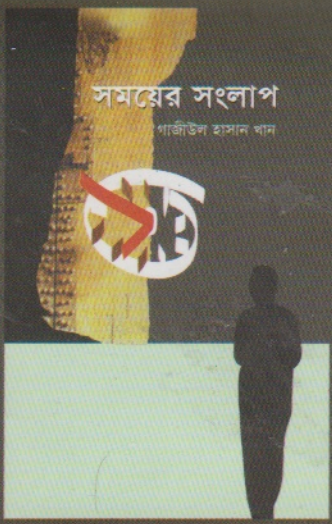

আইয়ুবশাহীর গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাষট্টি সালে কুমিল্লায় গ্রেফতার হন তৎকালীন ছাত্রনেতা গাজীউল হাসান খান। সেই থেকে রাজনৈতিক কারণেই ক্রমশ সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। ষাটের দশকের পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ এবং সাংবাদিকতায় উচ্চতর ডিপ্লোমা করার সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও কিছুটা পরবর্তী সময়ে গঠিত বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতা চালিয়ে যান। আটষট্টি থেকে অনিয়মিতভাবে লেখাজোখা শুরু করলেও সত্তরের দিকে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সিতে (এনা) যোগ দেন একজন রাজনৈতিক রিপোর্টার হিসেবে। এর মাঝে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম কাতারে থেকে লড়েছেন আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। তারপর একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে অবদান রাখেন। সংগঠিত করেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প এবং সংগ্রামী ছাত্রজনতাকে।

গাজীউল হাসান খান স্বাধীনতার পর আবার পূর্ণকালীন সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। সে সময় তিনি মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর তথ্য ও প্রচার বিষয়ক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন কমনওয়েলথ সচিবালয়ের বৃত্তি নিয়ে ছিয়াত্তরে লন্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে উনআশি সালে তারই সম্পাদনায় 'দেশবার্তা' নামে একটি সংবাদপত্র বের করেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বাইরে প্রথম বাংলা দৈনিকের মর্যাদা লাভ করেন। সেসময় তিনি প্রবাসী বাংলাদেশী শিশুদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় ফ্ল্যাপে দেখুন

সময়ের সংলাপ

www.pathagar.com

সময়ের সংলাপ

গাজীউল হাসান খান

মিজান পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজা (তৃতীয়তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ০১১ ৮৬৪৩২৬, ০১৭১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স ০৮৮ ০২ ৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল একুশে বইমেলা ২০০৬

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ফেরদৌস খান

বর্ণবিন্যাস
মিজান কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজা (চতুর্থতলা) ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশদাস লেন ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১১২৩৯৫

মূল্য ঃ
১৮০ টাকা মাত্র

ISBN
984-8685-99-5

Samoyer Sanglap Written by Gaziul Hasan Khan
Published by: Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Flool), Dhaka-1100
Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka-1100

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী, মৌলবাদী
ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার
অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার
প্রচেষ্টায় যারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত
তাদের প্রতি

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে হিসেবে ২০০৫ সাল বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। জাতীয় দৈনিক নয়া দিগন্ত, আমার দেশ ও দিনকাল এবং সাপ্তাহিক খবরের অন্তরালে পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কিছু কলাম নিয়ে এ পুস্তক। এর অধিকাংশই "সময়ের সংলাপ" শিরোনামে কলাম হিসেবে প্রতি শনিবার দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণেই এ পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে "সময়ের সংলাপ"। এ পুস্তকে জানুয়ারী ২০০৫ থেকে জানুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লেখা স্থান পেয়েছে। লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখিত সময়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশসহ বিভিন্ন ঘটনা ও ইস্যু বেছে নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত কলামে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজিত বহুমুখী সমস্যা, জনমত, সরকারী পদক্ষেপ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও দিন, তারিখ ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এগুলো ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে আসতে পারে।

এ পুস্তকে প্রকাশিত কলামের ইস্যুগুলো অধিকাংশই চলমান রয়েছে। আত্মঘাতি রাজনীতি, উৎপাদন, উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা, পানি সম্পদ ও পরিবেশ সহ বিভিন্ন ইস্যু সর্বশেষ তারিখ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত সময়ে বিভিন্ন ইস্যুগুলো যেভাবে ওঠে এসেছে, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো থেকেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট এবং বিরোধী ১৪-দলীয় জোটের কার্যক্রম ও অবস্থা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। সুতরাং সকল পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক, গণমাধ্যমে কর্মরত পেশাজীবী এবং সচেতন পাঠকদের কাছে প্রকাশিত তথ্যগুলো যদি কোনো কাজে আসে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। স্থানাভাবে অনেক লেখাই এ পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেটা হলে সম্ভবত একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা আরও সহজ হতো। তাই আমার সকল সীমাবদ্ধতাকে সহজভাবে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

গাজীউল হাসান খান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আমাদের রাজনীতি ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব ৯/ **ফারাক্কার অপর নাম ঃ টিপাইমুখ** ১৩/ দারিদ্র্য বিমোচনে ২০০৬ সাল খাসজমি ব্যবহার ও সমবায় আন্দোলন ১৭/ অপপ্রচার উসকানি ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ২১/ আত্মঘাতি বোমা না আত্মঘাতি রাজনীতি ২৬ / সরকার পতনের আন্দোলন বনাম সংলাপ ৩০ / বোমা যখন বেহেস্তের চাবি ৩৪ / সার্ক ঃ পুরণো ফ্যাক্টরগুলো এখনও বলবত ৩৮/ **মহা চ্যালেঞ্জের বছর ঃ বৃহস্পতি ও শনি ৪২/ গণ প্রতিরোধ বনাম বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ৪৬ /** টুইসডে গ্রুপ কী দেশের বাইরে বসবে ? ৫১/ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির মুন্সিয়ানা ৫৬/ **ভারতের দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি ও ত্রিদেশীয় চুক্তি ৬০/** চেনা রাজনীতির অচেনা খেলোয়াড় ৬৫/ বর্তমান সঙ্কট উত্তরণের শুভ কামনায় ৭০/ ইসলাম যখন অপতৎপরতার শিকার ৭৫/ বিস্ফোরণ নাটকের অন্তরালে প্রকৃত নায়ক কারা ? ৮১/ আধিপত্য নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চাই ৮৫/ আগামী নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত ৮৯/ সংস্কার প্রস্তাব ও ১৪-দলের অক্টোবর ফ্যাক্টর ৯৪/ **টেংরাটিলা নয়, দেশবাসীর অন্তর জ্বলছে ৯৮/** পলাশী ঃ আমাদের সংবাদপত্র ও রাজনীতি ১০২/ কালো টাকা সাদা টাকা বিতর্ক ১০৬/ সংসদ অকার্যকর হলে তার জন্য দায়ী কে? ১১১/ অভিনন্দন ঃ সৎ রাজনীতিকের খোঁজে হাইকোর্ট ১১৬/ সুপ্রিম কোর্টে শক্তির লড়াই ! ১২০/ **পানি সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐক্য ১২৪/** আমাদের সীমান্তে সমস্যার বেড়াজাল ১২৯/ চীনের কাছে ভারতের শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ ১৩৩/ দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিস্থাপকতায় চীনের ভূমিকা অপরিসীম ১৩৭/ রাজনীতি হোক উন্নয়নের চালিকা শক্তি ১৪১/ **এবার ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কন্ডোলিৎসা। ১৪৫/ বাংলাদেশীরা কারো 'ডিকটেশন' পছন্দ করে না ২৪৯/** 'বাঁচাও নদী ... বাঁচাও বাংলাদেশ' ১৫৪/ **দুর্নীতি দমন কমিশনের ভবিষ্যত নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ১৫৮/** তেত্রিশ বছরের মধ্যে হরতালে কেটেছে প্রায় সাড়ে তিন বছর ১৬৩/ **শ্যাম সরণের অপব্যাখ্যা ও ভারতীয় মনোভাব ১৬৮/** সার্ক সম্মেলন, বিরোধী দলীয় আন্দোলন ও অবরোধের ওশালতি ১৭২/ **রাজনীতি এখন বিচারকের কাঠগড়ায় ১৭৭/ দেশ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কবলে** ১৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের রাজনীতি ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব

নয়া দিগন্ত, ১৪ জানুয়ারী, ২০০৬

জনগণের সাথে দলগত কিংবা পেশাগতভাবে যারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রাজনীতি তাদেরই সাজে। বাণিজ্যিক কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থে যারা রাজনীতিতে আসে তাদের জন্য আর যা-ই হোক রাজনীতি নয়। দেশের সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দ করে না। নির্বাচনের সময় তাই দেখা গেছে, কিছু ভোটার পয়সা খায় ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতি প্রার্থীর আর ভোট দেয় যারা সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত তাদের। এরশাদের স্বৈরশাসনকাল এবং তার পরবর্তী সময়ে বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তি রাজনীতিতে এসেছেন। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং সামরিক ও অসামরিক আমলাদের আধিপত্য লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রমনা সাধারণ মানুষ এবং রাজনীতিঘেঁষা প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোতে তাই একসময় সমালোচনা উঠেছিল যে, রাজনীতি এখন ক্রমশ ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এ দেশের প্রখ্যাত বামপন্থী লেখক-কলামিষ্ট বদরুদ্দীন উমর তার লেখায় এ ব্যাপারে রীতিমতো ক্ষোভ ও আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন। তার ধারণা অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা, যারা ব্যবসায়িক স্বার্থ কিংবা নাম ও যশের জন্য রাজনীতিতে আসেন, দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে তারা তেমন কোনো অবদান রাখতে পারেন না। কারণ দেশের সাধারণ মানুষের সাথে তাদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া প্রকৃত তথ্য কিংবা তত্ত্বগতভাবে তারা জনজীবন থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে অর্থাৎ সত্তর দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ (জাসদ) কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন জাতীয় সংসদে বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। এ দাবি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে মাথা ফুঁড়ে উঠে ব্যাপকতা লাভ করতে না পারলেও দেশের বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর গুরুত্ব কিংবা কার্যকারিতার দিনটি কখনো উড়িয়ে দেয়নি।

সত্তর দশকের শেষের দিকে তার নেতৃত্বে প্রথমে জাতীয়তাবাদী জোট ও পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠনের সময় তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে তার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুদক্ষ পেশাজীবীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। পেশাজীবীর অর্থ এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার কিংবা কালো টাকার মালিক নয়। তিনি শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, কারিগর ও প্রযুক্তিবিদদের রাজনীতি এবং

www.pathagar.com

বিশেষ করে প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে অতি দ্রুত একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি পেশাজীবীদের সার্থক অংশীদারিত্ব শহীদ জিয়াকে রাষ্ট্র পরিচালনায় দিয়েছিল এক জাদুকরী সাফল্য।

মাঠ পর্যায়ের সব নেতা-নেত্রীর জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশ্যই একটি পেশা থাকতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক প্রভাবকে বিক্রি করে কেউ সারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করবে। অপরদিকে যেনতেনভাবে বা যেকোনো প্রভাবেই হোক দুটো পয়সা যারা কামাতে পেরেছেন তাদের অনেকেই আজকাল জাতীয় সংসদের সদস্য হতে চান। তারা মনে করেন রাজনীতি করতে কোনো যোগ্যতা লাগে না। পয়সার বিনিময়ে এ দেশে সবকিছুই কেনা যায়। এ ক্ষেত্রে যারা একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক ধারা বেয়ে বিভিন্ন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, জাতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ সংসদে তারা যদি প্রতিনিধিত্ব চান তাহলে সেটা তো অগণতান্ত্রিক কিংবা অসমীচীন হবে না। এ দেশের পেশাজীবীরা আমাদের বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সঙ্কটময় মুহূর্তে এ দেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, এমনকি মসজিদের ইমামরাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে থাকেন। আর এরাই মূলত এ দেশের সুশীল সমাজ। অথচ নিজ নিজ ফোরাম ছাড়া বৃহত্তরভাবে পেশাগত দিক থেকে এদের কথা বলার কোনো জায়গা নেই। একটি বিশেষ স্তর বা লেভেলের বাইরে যাওয়ার প্রবেশাধিকার তাদের নেই। জাতীয় জীবনের বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে পেশাজীবীরা ক্রমশ এখন কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন বলে অনেকের ধারণা। সেখানে বিত্তশালী ব্যবসায়ী, উদীয়মান শিল্পপতি এবং অন্যরা তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজে পথ করে নিতে পারছেন বলে পেশাজীবীদের বিশ্বাস।

নিজ নিজ পেশায় মেধাসম্পন্ন, সুদক্ষ, পরিশীলিত এবং প্রতিশ্রুতিবান তরুণরা অবশ্যই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের উপরই নির্ভর করছে এ দেশের অগ্রগতি কিংবা সমৃদ্ধি। যে পন্থা অবলম্বন করলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা পেশাজীবীদের সর্বোচ্চ অবদান নিশ্চিত করতে, সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ত্বরান্বিত করতে এবং গণতন্ত্রায়নের পথকে সুগম করতে পারেন, সেপথ কেন চরম অবহেলায় পরিহার করা হবে? এটিই পেশাজীবীদের মধ্যে কারো কারো কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আমাদের দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (বাইক্যামেরাল) সংসদের বিধান এখনো হয়নি। ভবিষ্যতে হবে না, এমন নয়। দুই কক্ষযুক্ত সংসদে রাজনীতিকদের পাশাপাশি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের অধিকারী পেশাজীবীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ ক্ষেত্রে সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ জাতীয় রাজনীতিতে আসতে পারবেন বলে মনে করি। এ ধরনের ব্যবস্থায় দেশের বৃহত্তর

www.pathagar.com

স্বার্থে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা অনেক সহজসাধ্য হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নন-ইস্যুকে ইস্যু করে আন্দোলনের নামে দেশে অস্থিরতা ও সঙ্কট সৃষ্টি করা কারো পক্ষেই খুব সহজ হবে না। তদুপরি গণবিরোধী কিংবা দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে কারও পক্ষে কোনো আইন প্রণয়ন করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার অসীম দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতার কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার আগেই এ চরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিতে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সব পর্যায়ের মানুষের ঐক্য এবং অবদান আবশ্যক। তাই তিনি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সমভূমি পর্যন্ত সব মানুষ এবং পেশাজীবীদের এক সূত্রে গেঁথে জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সব ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, উৎপাদন, উন্নয়ন এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন দেশের প্রতিভাবান পেশাজীবীদের। রাজনীতিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং মেধাসম্পন্ন সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের। প্রশাসন ও রাজনীতিতে তাদের বসিয়ে দিয়েছিলেন তাদের যোগ্য স্থানে। এতে তিনি অতি দ্রুত ফল পেয়েছিলেন। তখন দেশে শুরু হয়েছিল উন্নয়নের জোয়ার। সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছিল বাস্তবমুখী পরিকল্পনা এবং আধুনিকতার ছপি। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন তিনি। রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিভিন্ন স্তর এবং এমনকি গ্রাম সরকারের পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে ছেয়েছিলেন শহীদ জিয়া। ফলে ষড়যন্ত্র কিংবা চক্রান্তের রাজনীতি এবং নন-ইস্যু কখনো রাজনীতিতে ইস্যু করার সুযোগ পায়নি কেউ। তিনি ডান ও বামসহ সব যোগ্য রাজনীতিককে জাতীয় সংসদে বসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার চরম ব্যত্যয় দেখা দিয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহল আশঙ্কা করছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শহীদ জিয়া রাজনীতিগতভাবেই মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছিলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের অস্তিত্ব দেখা যায়। ব্রিটেন ও ভারতসহ নানা দেশে রয়েছে এ ব্যবস্থা। যুগের অগ্রগতি, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে গণতন্ত্রায়ন, বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, মানবাধিকার, পানিসম্পদসহ পরিবেশবাদীদের আন্দোলন যখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্বহীন রাজনীতি আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে এক পর্যায়ে ধীরগতিসম্পন্ন বা শুষ্ক করে দেবে। এ প্রতিনিধিত্বহীন রাজনীতি এখন চীন, রাশিয়া এমনকি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পেশাজীবীরাই প্রশাসন চালান। আইন প্রণয়ন, বাজেট নির্ধারণ, পররাষ্ট্রনীতিসহ তাত্ত্বিক, আদর্শিক ও নীতিগত বিষয়াদি নির্ধারণ করেন সিনেট ও কংগ্রেস নির্বাচিত রাজনীতিকরা। এতে তাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতার সংঘাত দেখা দেয় না। অথচ আমাদের দেশে সংসদ সদস্য ও

www.pathagar.com

উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে দেখা দিয়েছে এক চরম অচলাবস্থা। যার ফলে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের প্রথম স্তর উপজেলা পর্যায়েই এখনো কোনো ব্যাপক কার্যক্রম চালু হতে পারেনি।

এগুলো ফয়সালা করা ছাড়া সর্বস্তরে গণতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো শক্তিশালী হবে না। দলীয় রাজনীতির নামে বার বার চাঁদাবাজি, মাস্তানি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মাথা চাড়া দিতে থাকবে। সর্বস্তরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দেখা দিতে পারে হতাশা, ক্ষোভ, সন্ত্রাসসহ নানামুখী সামাজিক সঙ্কট ও অনাচার। প্রতিযোগিতা ও জবাবদিহিতা ছাড়া সৎ ও সুদক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আজকের তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ সমাজে এগুলো পাশ কাটিয়ে বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। তাই এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা সমাজ এগুবে না, জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। আমাদের সামনে রয়েছে একটি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন সাধারণ নির্বাচন। আমাদের গণতন্ত্র, অর্থনীতি, উন্নয়ন, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও স্থিতিশীলতাসহ বহু কারণেই আগামী নির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং আগামীতে কিভাবে নির্ধারিত হবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব তা এখনই ঠিক করা আবশ্যক বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। তারা মনে করেন বিএনপি-জামায়াত জোটসহ সব বড় জোট ও দলে পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ দেশের বড় দলগুলো আমাদের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও তাদের নেতৃবৃন্দকে চেনেন ও জানেন। শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদসহ সব পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টানো প্রয়োজন। আগামী নির্বাচনে পেশাজীবীদের সন্তোষজনকভাবে মনোনয়ন দেয়া, তাদের অংশীদারিত্ব এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সব দলেরই একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হবে। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। উৎপাদন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

ফারাক্কার অপর নাম ঃ টিপাইমুখ

নয়া দিগন্ত, ৭ জানুয়ারী, ২০০৬

নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই ভারত তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের সাথে সম্ভবত কিছু পরামর্শ করার ধার ধারেনা। তোয়াক্কা করে না ভারতের কোনো কর্মকান্ড কিংবা পরিকল্পনার কারণে অন্যদের কী সর্বনাশ হবে। উভয় দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৩টি অভিন্ন নদীতে বাংলাদেশের সাথে তেমন কোনো চূড়ান্ত পরামর্শ বা যৌথ সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভারত যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি এখন বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে সর্বমোট ২২৬টি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করেছে। যার লক্ষ্য হবে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ৯৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। ২০১২ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার' অংশ হিসেবে ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীসমূহের ওপর ১৬টি বৃহৎ বাঁধ চালু করেছে এবং আটটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি ভারত আরও ৬৪টি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

ভারত সরকার একতরফাভাবে এ সমস্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অভিন্ন নদীর ওপর একতরফাভাবে এ ধরনের বাঁধ নির্মাণ আন্তর্জাতিক নিয়ম ও চুক্তির লঙ্ঘন বলে বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের উজানে টিপাইমুখে বরাক নদীর ওপর ভারত বর্তমানে যে বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করছে তা বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এসব সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভারত স্থানীয় জনসাধারণ, পরিবেশবাদী এবং প্রতিবেশী দেশের সংশ্লিষ্ট মহলকে নিদারুনভাবে উপেক্ষা করেছে। এর মধ্য দিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক বিধান, বিশেষ করে জাতিসংঘের উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক ঘোষণার বরখেলাপ করেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। ভারতের বরাক নদীতে প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সুরমা বেসিন অঞ্চল বিশেষত বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে পানির মারাত্মক ও তীব্র সংকট দেখা দেবে। বাংলাদেশের একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী বলেছেন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ ও টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব সত্যিকারভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেছেন যে, ভারত সবসময়ই এসব ব্যাপারে কুয়াশাচ্ছন্ন ভূমিকা পালন করে। তারা একদিকে বলে

www.pathagar.com

চলেছে বাংলাদেশের স্বার্থহানি হবে এমন কোনো প্রকল্প তারা গ্রহণ করবে না এবং এ অঞ্চলে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পও কোনদিনই বাস্তবায়িত হবে না। অন্যদিকে কিছুদিন আগেও ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের অধীন ক্যান-বেতওয়া সংযোগের ব্যাপারে দুটি রাজ্যের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়েছে। ইন্টারনেট ও অন্যান্য সূত্রে জানা গেছে যে, ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ৩০ শতাংশেরও অধিক কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলেছে। টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে অব্যাহত গতিতে।

সম্প্রতি টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের নব সূচনার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ঢাকায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) দু'দিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক টিপাইমুখ বাঁধ সম্মেলন' শেষ হয়েছে। এতে ভারতীয়সহ দেশ-বিদেশের তিন শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি 'ঢাকা ঘোষণা' এবং কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঢাকা ঘোষণায় ভারত সরকারকে অবিলম্বে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাতিল করার জন্য সর্বসম্মতভাবে দাবী জানানো হয়। সভায় বক্তারা সার্ক দেশসমূহ, গণচীন ও মিয়ানমারকে নিয়ে এ অঞ্চলে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করার তাগিদ দিয়েছেন। তারা সার্ক সনদে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি সংযুক্ত করার দাবী জানান। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পরিবেশবাদীরা আরও বলেছেন যে, এ এলাকার নদীসমূহ, তাদের উপকারীতা ও অপকারীতার ওপর নির্ভরশীল ব্যাপক জনগোষ্ঠির ওপর নদীসমূহের সার্বিক প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্যবিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতেই বিদ্যমান সকল নদী চুক্তির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর তারা জোর দেন। এর পরপরই গত ৪ ও ৫ জানুয়ারী আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি) ঢাকায় 'উজানে পানি প্রবাহে বাধা ঃ বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয়' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সরকারী ও বিরোধী দলের নেতারা বলেছেন, পরিকল্পিতভাবে ভারত বাংলাদেশকে ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত করছে। সংগঠকরা বলেছেন, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রসহ আন্তর্জাতিক নদীর পানির হিস্যা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে। দু'দেশের মধ্যে প্রবাহমান আন্তর্জাতিক নদীর পানি একতরফাভাবে কারো পক্ষেই প্রত্যাহার করা ঠিক নয়। এটি একটি অন্যায্য, অর্থনৈতিক ও বেআইনী কাজ বলে তারা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই বলেছেন যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের মানুষের আবেগ ও সরলতার সুযোগ নিয়ে ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কার কার্যক্রম শুরু করে। এরপর দু'বার চুক্তি হলেও বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত পানি পাচ্ছেনা। ফারাক্কার পর ৩৫টি অভিন্ন নদীতে ভারত বাঁধ নির্মাণ করেছে বাংলাদেশের সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই। তিনি আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের নেতাদের মধ্যে ঐক্য না হলেও জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

www.pathagar.com

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পানি সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিন্তু মূল সমস্যাটা এখানেই। ভারত প্রতিবেশীদের সাথে এ ধরণের কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয় বলে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা অভিযোগ করেছেন। তারা বলেছেন, অভিন্ন নদীতে সংযোগ খাল খনন এবং বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যে ভারত একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিরাজিত সমস্যাকে ক্রমশ আরও জটিল করে তুলছে। এ ব্যাপারে দেশের ১৪ কোটি মানুষের প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো। প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী বলেছেন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার কোনো অবস্থাতেই চায় না। কারণ নিজে মরে কখনো বন্ধুত্ব রক্ষা করা যায় না। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের সৃষ্ট বিভিন্ন পানি সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমরা গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড় ধরনের বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর' শীর্ষক সেমিনারে বরাক নদীর ওপর ভারতের নির্মাণাধীন বাঁধ প্রকল্প সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস। ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, টিপাইমুখ ড্যাম সেচ প্রকল্প হবেনা এবং ভারত এখান থেকে পানি প্রত্যাহারও করবে না। এ প্রকল্প নাকি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুকনো মৌসুমে উভয় দেশের পানির সমস্যা দূর করবে। একদিকে বলা হচ্ছে টিপাইমুখ কোনো সেচ প্রকল্প হবে না, অপরদিকে বলা হচ্ছে এটি শুস্ক মৌসুমে পানির সমস্যা দূর করবে। তাছাড়া এতদিন টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে তেমন কোনো কথাবার্তাই বলা হয়নি। কোনো আলোচনাই করা হয়নি বাংলাদেশের সাথে। গোপনে গোপনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ভারত। তারপর যখন প্রকল্পের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজন হলে সেনা বাহিনীর পাহারায় প্রকল্পটির কাজ শেষ করা হবে। এ থেকেই ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই তারা একের পর এক অভিন্ন নদীগুলোতে একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে যাচ্ছে। ভাটি অঞ্চলের প্রতিবেশীদের সংগে এ ব্যাপারে কোনো আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করছে না তারা। অথচ এ ব্যাপারে চরম আপত্তি ওঠেছে আসাম ও নাগাল্যান্ড সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশবাদীদের তরফ থেকে। তারা সরকারের এ ধরণের প্রকল্পের প্রতিবাদে বলেছেন যে, এগুলো বাস্তবায়িত হলে এ বিশাল অঞ্চলের পরিবেশ ও ভূ-প্রকৃতির সর্বনাশ হবে। বর্ষা মৌসুমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা বর্ষার বানে ভেসে যাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর খরায় বিপর্যস্ত হবে ভূ-প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র।

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অর্থাৎ আসাম, মেঘালয় ও মনিপুর রাজ্যের সীমান্তে বরাক ও তুইভাই নদীর সংযোগস্থলে টিপাইমুখে ভারত ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসমপন্ন একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে এখানে নির্মিত হচ্ছে এক বিশাল বাঁধ এবং জলাধার, যার জন্য সারা বছর

www.pathagar.com

প্রয়োজন হবে বরাকের প্রচুর পানি। অভিন্ন নদী বরাকের ওপর বাঁধ নির্মাণ ও জলাধারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার শাখা নদী সুরমা ও কুশিয়ারার স্বাভাবিক প্রবাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে বৃহত্তর সিলেটেসহ পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের কৃষি, বনাঞ্চল, পরিবেশ ও ভূ-প্রকৃতি ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ কথা ভারতকে জানানো হয়েছে। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণকালের মতো কোনো দিকে কান না দিয়ে ভারত একতরফাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়নে। অথচ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে মেঘনার পানিপ্রবাহের এক সিংহভাগ আসে সুরমা ও কুশিয়ারা থেকে। শুষ্ক মৌসুমে এমনিতেই সুরমা ও কুশিয়ারাতে পানি প্রবাহ ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসে। এক্ষেত্রে যেখানে পানি প্রবাহ অনেক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সেখানে পানি প্রবাহ আরও আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রমত্তা মেঘনার পানি প্রবাহের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে বাংলাদেশের সেচ, কৃষি কাজ, নৌ পরিবহন এবং বাণিজ্যসহ অনেক কর্মকান্ড।

এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশীদের জন্য অবাধ পানি সরবরাহ হচ্ছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। সুতরাং এ ব্যাপারে শুধু সরকার নয়, এদশের ১৪ কোটি দেশপ্রেমিক মানুষের এক গুরুদায়িত্ব হচ্ছে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার সাথে সাথে জাতীয় দায়িত্ব পালন করা। আন্তর্জাতিক নদ-নদী কিংবা অভিন্ন নদ-নদীর পানিপ্রবাহ এবং তার সুষ্ঠু বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ও আইন-কানুন রয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে যদি যথাযথ কিংবা পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক আইন না থাকে তবে এ ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ বলে দেশবাসী মনে করে। পানি ও পরিবেশ সমস্যা আজ আর কোনো আঞ্চলিক সমস্যা নয়। জাতিসঙ্ঘ আভাস দিয়েছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়াবে পানি সম্পদ ও পরিবেশ সমস্যা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনই পড়েছে সে সমস্যায়। এ ক্ষেত্রে গত সপ্তাহে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের সম্মেলনে একটি কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তা হলো আমাদের গনমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে। বাংলাদশের নদী, পানি সম্পদ, ভূ-প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে আমাদের গণমাধ্যম, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যেন কোনো ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং সরকারকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মিডিয়া বা গণমাধ্যমের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে পরিবেশবাদীরা মনে করেন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের এ অভিন্ন নদীগুলোর ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি। তাছাড়া এ মুহূর্তে আরও প্রয়োজন ভারত ও বাংলাদেশী পরিবেশবাদী, রাজনীতিক ও সমাজসেবীদের মধ্যে তথ্য ও ভাবের অধিক আদান-প্রদান। আমাদের দুটি দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা এবং পরিবেশ ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ক্ষেত্রে সীমাহীনভাবে সাহায্য করবে গণমাধ্যম বা প্রেস।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনে ২০০৬ সাল
খাসজমি ব্যবহার ও সমবায় আন্দোলন

নয়া দিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫

এই নববর্ষে একজন অতি প্রাচীন কবির কথা মনে পড়ে গেল, যিনি বলেছিলেন ঃ

'এমন মানবজমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা
মন তুমি কৃষিকাজ জানোনা।'

যদিও এই জমি সেই জমি কিনা জানিনা, তবুও আমি জমির কথাই বলবো। এদেশের বেদখলকৃত ৬৬ হাজার একর খাসজমির কথা বলবো। সরকারি তথ্যমতে সারাদেশে এ বেদখলী জমির মধ্যে গত ৯ মাসের বিশেষ অভিযানে মাত্র সাড়ে চার হাজার একর ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৫৬ হাজার বর্গমাইল মূল ভূখণ্ডের এই ক্ষুদ্র দেশে ৬৬ হাজার একর সরকারি খাসজমি খাঁটি সোনার মতই মূল্যবান। এ জমি দেশ ও তার সাধারণ মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ জমি হতে পারে দেশের অনেক তরুণ-তরুণীর আত্মকর্মসংস্থানের চাবিকাঠি। ভাগ্য পরিবর্তনের বিশেষ মাধ্যম। পুনরুদ্ধারকৃত খাসজমি, সরকারি ঋণ এবং সমবায় পদ্ধতি এই দেশে বহুমুখি কৃষিজাত উৎপাদন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার পুনরুদ্ধারকৃত সাড়ে চারহাজার একর খাসজমির অর্থমূল্য এক হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বাকি জমি আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে অবিলম্বে একটি যুৎসই আইন তৈরি করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ঢিমেতালে বেদখল হওয়া খাসজমি উদ্ধারের কাজ চলছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তাই এ ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবকে প্রধান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও খাসজমি উদ্ধারের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোয়নি। সে কারণেই নতুন আইন প্রণয়ন ও দায়ের করা মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। তাছাড়া খাসজমি

www.pathagar.com

পুণর্দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধান করারও প্রস্তাব এসেছে যা নতুন আইনে বিধান রাখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন আইন ও শাস্তির বিধান করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটারের ওপর বিশেষভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে একসময় সমবায় আন্দোলনের ঘাটি হিসেবে গড়ে ওঠেছিল কুমিল্লা। তখন এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ড. আখতার হামিদ খান। তিনি কৃষি, কৃষিভিত্তিক সাজ-সরঞ্জাম এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভিত্তিতে এক সফল আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। কুমিল্লা পদ্ধতি নামে তার বিভিন্ন কার্যক্রম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে পরবর্তী আমলে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, লুটপাট, দুর্নীতি এবং সমবায়ের সম্পত্তি জবরদখলের কারণে সমগ্র আন্দোলনটিই ঝুলে পড়ে। এরই প্রেক্ষাপটে গত ২৫ ডিসেম্বর কুমিল্লা সমবায় ইউনিয়ন কুমিল্লা শহরে সমবায়ের সম্পত্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে ভূমিদস্যুদের হাত থেকে সমবায়ের ভূ-সম্পত্তি রক্ষার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়া কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেডের নিজস্ব জমিতে নির্মিত কোয়ার্টারে অবৈধভাবে বসবাস করার অভিযোগ এনেও বক্তব্য রাখেন অনেকে। গোলটেবিলের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী নাজমুস সা'দত কুমিল্লায় সমবায় আন্দোলন ও তার সম্পত্তি আত্মসাতের এক দুঃখজনক চিত্র তুলে ধরেন। সে গোলটেবিলে অংশ নিয়েছিলেন সমবায় আন্দোলনের অনেক প্রবীন নেতা ও নারী নেত্রীরা। তাদের বক্তব্যে যে হতাশার চিত্র ফুটে ওঠেছিল তার মূলেও রয়েছে সেই একই দুবৃত্তায়ন ও আইনানুগ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার ফিরিস্তি।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং কেটিসিসিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ড. আখতার হামিদ খান ষাটের দশকে কুমিল্লা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার সময় তার বাসভবন হিসেবে শহরের রানীর দীঘির উত্তর কোনে একটি দ্বিতল ভবন, পুকুর ও গার্ডেনের জন্য খালি ভূমি এবং চলাচলের রাস্তাসহ ১ দশমিক ০৫৫ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষি মহল বিভিন্ন কৌশলে এ মহান ব্যক্তির বাড়ীটির পুকুর, বাগান ও খালি অংশটুকু গ্রাস করে নেয়। তার স্মৃতি বিজড়িত এ বাড়ীতে পাঠাগার, মিউজিয়াম ও ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড এখনো পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে একটি স্বল্প মেয়াদী ট্রেড কোর্সও চালু রয়েছে। তারপরও সম্পত্তির ৯০ শতাংশ দখল হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট ১০ শতাংশ গ্রাস করার জন্য চলছে নানান পায়তারা। ইতোমধ্যে এ সমস্ত জায়গাজমি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে বিক্রিও করা হয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেডের নিজস্ব জমিতে নির্মিত কোয়ার্টার সমূহে অবৈধভাবে বসবাস

www.pathagar.com

করছে অনেকে। কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেডের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছেন না। কিছু করতে গেলেই জেলা প্রশাসকের ওপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়। কতিপয় রাজনীতিক ব্যক্তিগব প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনের নামে অবৈধভাবে গোপনে বন্দোবস্ত নিচ্ছে কোটি কোটি টাকার সরকারী খাস জমি। কুমিল্লা কো-অপারেটিভের ৩৫ হাজার নিয়মিত সদস্য রয়েছে এখনও। সব মিলিয়ে অর্থাৎ ক্ষুদে সমবায়ীসহ সমবায় আন্দোলনের সাথে একসময় কুমিল্লায় প্রায় দু'লাখ সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। তারা সময়ভিত্তিক কৃষি খামার কিংবা শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার জন্য পাচ্ছেনা সে জমি। তদুপরি সমবায় আন্দোলন এবং তাদের নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষার জন্য নেতৃবৃন্দকে এখন প্রত্যেক থানায় প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলার কথা চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। সমবায়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে তারা অনশন ধর্মঘটে যাওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন অনেকে।

এ দেশে সমবায়ের ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের। অথচ দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমবায় আন্দোলন ও তার ভূ-সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে ধরনের যুগোপযোগী ও শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করার কথা ছিল, স্বাধীনতার পর গত ৩৫ বছরেও তা হয়নি। সরকারের খাস জমির যা অবস্থা সমবায়ের জায়গা সম্পত্তিরও একই অবস্থা। চারিদিকে চলছে অন্যায় দখলদারিত্ব এবং সরকারী সম্পদ অপহরণের হিংস্র পায়তারা। অথচ সরকারের ৬৬ হাজার একর খাসজমি সমবায়ের অধীনে এলে এবং সমবায়ের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি কঠোর আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা গেলে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এদেশে এক বিস্ময়কর আর্থ-সামাজিক বিপ্লব সাধন করা যেত। সরকারের খাস জমি সমবায়ের ভিত্তিতে কর্মহীন ও বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রফতানীযোগ্য তরি-তরকারী উৎপাদন, মৎস্য, ডেইরী ও পল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলার জন্য বন্দোবস্ত দেয়া গেলে এ দেশের জিডিপি'র পরিমাণ আরও কত বেড়ে যেত তা চিন্তা করা যায় না। সমবায়ের ভিত্তিতে এদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল দেশের শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে দেশে এখন শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা প্রায় পৌণে তিন কোটিতে পৌঁছেছে। তাদের কথা আমাদেরকেই ভাবতে হবে। নতুবা সম্পদ ও উপায় থাকা সত্ত্বেও দেশ বঞ্চিত হবে, দুর্ভোগ পোহাবে এবং ডেকে আনবে নাশকতামূলক ও ধ্বংসাত্মক অনেক অনাকাঙ্খিত পরিণতি।

এ দেশে সমবায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে। সেদিন সমবায় অধিদফতরের রেজিষ্ট্রার শেখ আলতাফ আলী বাসসকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এতো প্রতিকুল অবস্থায়ও সর্বশেষ হিসাবে দেশের সমবায় সমিতিসমূহের এখন কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বর্তমান সরকারের

www.pathagar.com

সময়ে কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭৬ কোটি ৯৩ লাখ টাকা, যা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে কার্যকরী মূলধনের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। সমবায় অধিদফতরের হিসাব গত ৩০ জুন, ২০০৪ পর্যন্ত সমবায়ের মাধ্যমে বেতনভোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ২৮ হাজার তিন জনের। এছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। সমবায়ীদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটলে এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

নিয়মিত কর্মসংস্থান এবং বাধাধরা উপার্জন ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব। বর্তমানে দেশের ৪০ শতাংশের ওপরে আছে মানুষ যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। বর্তমান সরকারের বহুমুখী আর্থ সামাজিক কার্যক্রমের কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার ক্রমশ এখন বছরে মাত্র এক শতাংশ করে হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ৪০ বছর সময় লাগবে বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করতে। অথচ আমাদের নিজস্ব সম্পদের (খাস জমি ও অন্যান্য) ওপর ভিত্তি করে সর্বস্তরে সমবায়ের মাধ্যমে বছরে শতকরা প্রায় ৩ ভাগ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান করা সম্ভব হতে পারে বলে সমবায় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্তমানে সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ক্ষমতাসীন বিএনপি দলের মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইয়া। ভূইয়া সাহেব এককালে এদেশের প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি ও পরবর্তীতে গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত বামপন্থী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তার নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হতে পারে। বাংলাদেশে হতে পারে সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দু। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতিসঙ্ঘ যে "মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল" ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন তারচেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারে। ড. ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে তেমনি সাফল্য অর্জন করতে পারে। এ আন্দোলন কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ এবং উৎপাদনক্ষম করতে শুধু সাহায্যই করবেনা বরং বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে একটি ঐক্যবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশ হিসেবে। এটিই হোক আমাদের ২০০৬ সালের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

অপপ্রচার উসকানি ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা

নয়া দিগন্ত, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৫

জন্মলগ্ন থেকে এদেশ এবং তার মানুষগুলো নিয়ে যেন ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। ধারাবাহিকভাবে এদেশের বিরুদ্ধে চলছে একের পর এক পরিকল্পিত অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র। একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যন্তরীণ কোনো কোনো রাজনৈতিক শক্তির অপপ্রচার ও অব্যাহত ষড়যন্ত্র, অপরদিকে একে একটি করদরাজ্যে পরিণত করার জন্য আধিপত্যবাদী বিদেশী শক্তির সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে এ দেশটি যেন বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছেনা। একে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে নানা অজুহাতে এবং বারবার ঠেলে দেয়া হচ্ছে নিত্য-নতুন সঙ্কটে। মূলত সে কারণেই সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশটি মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়েও বারবার হোঁচট খাচ্ছে।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উদার গণতান্ত্রিক দেশ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামাঞ্চল প্রধান দেশ হিসেবে এদেশের মানুষের মাঝে অবশ্যই ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও আচার-আচরণ পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হবে। এর অর্থ এই নয় যে নামাজী কিংবা দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ দেখলেই এটিকে একটি ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। এদেশে দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ কেউ নতুন দেখেনি। তাছাড়া বিশ্বের বহু দেশেই মানুষকে দাড়ি রাখতে কিংবা বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির টুপি পড়তে দেখা যায়। এর অর্থ এই নয় যে তারা সবাই ধর্মান্ধ কিংবা মৌলবাদী। জীবনধারা ও স্বভাবগতভাবেই বাংলাদেশের অধিকাংশ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্যরা অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। তারা কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠির রাজনীতি কিংবা ক্ষমতা দখল অথবা আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে নিজেদের সনাতনী ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করবেনা। বরং অযাচিতভাবে সেখানে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সর্বতোভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রুখে দাঁড়াবে। অতীতের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, এদেশের মানুষ কখনোই তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর হস্তক্ষেপ সহ্য করেনি। বরদাস্ত করেনি তাদের স্বাধীনতার ওপর কারও ন্যূনতম কর্তৃত্ব কিংবা আধিপত্যবাদী আচরণ। তাই শুধু ব্রিটিশ শাসনামলেই নয়, এমনি মোঘল কিংবা উত্তরের অন্যান্য মুসলিম শাসকদের আমলেও তৎকালীন, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষকে বহুবার বিদ্রোহ-বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে।

এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন সুফী-সাধক, আলেম-ওলামা এবং আওলিয়া-দরবেশরা। তারা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিবাদী মানুষ এবং ইসলামী দর্শনে বিশেষভাবে বুৎপত্তি সম্পন্ন। তারা কেউ যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা সন্ত্রাস-বোমাবাজির মাধ্যমে ইসলামের

www.pathagar.com

প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাননি। এটি সম্ভবও ছিল না। কারণ ইসলাম হচ্ছে শান্তি, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম। ইসলামের অন্তর্নিহিত বাণী এবং বিশেষ করে কোরআনের অবিনাশী শিক্ষাকে আত্মস্থ করা এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় তার যথাযথ অনুশীলন ছাড়া বাকি সবই কোনো না কোনোভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই উদ্দেশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিলের জন্য হয় তবে তা অবশ্যই ইসলামের আদর্শ বিরোধী হতে বাধ্য। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা জীবননাশের সাথে সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডই ইসলাম বিরোধী। এতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা নয়, ইসলামের পবিত্র নামের ওপর কলঙ্ক লেপন করা হয়। এ কাজগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

আল্লাহপাক তার প্রেরিত পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে, ইসলাম তার ধর্ম। এটি রক্ষণাবেক্ষণে আর কারও উদ্বিগ্ন হওয়া কিংবা সমাজে সন্ত্রাস, অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। শান্তি ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে ইসলামের পথে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং অন্যের কাছে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই হচ্ছে একজন ইসলাম প্রচারকারীর মূল দায়িত্ব। সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইসলামের প্রচার, ইসলামী শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানসহ বিশ্বের দুয়েকটি দেশে ইসলামের নামে যে সমস্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাতে কী ফল হয়েছে তা আমরা এখন ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি। এতে সে সমস্ত দেশে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আবির্ভাব এবং দখলদারিত্ব ছাড়া আর কিছুই পাইনি। সুদূর উত্তর আফ্রিকার তিউনেশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের ইতিহাসে কোথাও সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আফগানিস্তানে বিগত দিনের তালেবানি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় ইসলামের নামে যে সমস্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাতে ইসলামের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। আফগানিস্তান নিয়ে ইসলামকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে প্রচুর। যতদিন আফগানিস্তান কমিউনিস্ট মস্কোর বিরুদ্ধে লড়েছে ততোদিন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদ পেয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তালেবানরা ক্ষমতা দখলের নামে ইসলামকে জড়িয়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হলো ঠিক তখন থেকেই শুরু হলো ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আনাগোনা যা শেষ পর্যন্ত মোল্লা ওমর এবং ওসামা বিন লাদেনের ওপর সর্বগ্রাসী হামলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে পিছিয়ে থাকা অসচেতন তালেবানদের বাড়াবাড়ি এ পবিত্র ধর্মটিকে পাশ্চাত্য জগত এবং বিশেষ ভিন্ন ধর্মীদের কাছে বেশ বিতর্কিত করে তুলেছে। সে সমস্ত বিভ্রান্ত মানুষ যখন ইসলাম সম্পর্কে বইপত্র লিখতে শুরু করে তখন বুঝতেই হবে মুসলমানদের আজ কী লেজে গোবরে অবস্থা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জামা'আতুল মোজাহিদীনের আত্মঘাতি বোমা হামলা এবং বিচারক ও আইনজীবীসহ নিরীহ মানুষ হত্যার সময় ভারতে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম, "বাংলাদেশ ঃ দ্য নেক্সট আফগানিস্তান?" লেখক কোনো সাধারণ মানুষ নন, 'দ্য হিন্দুস্তান টাইমস'-এর সাবেক সম্পাদক, হিরন্ময় কারলেকার। তিনি বর্তমানে 'দ্য পাইওনিয়ার' পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক। হিরন্ময় কারলেকার বাংলাদেশ সম্পর্কে কতটুকু জানেন জানিনা। বাংলাদেশ নিয়ে তার বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। ঠিক এ সময়ে বাংলাদেশ পরবর্তী আফগানিস্তান হবে কিনা সেটা নিয়ে কারলেকারের উদ্বেগ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে? কারলেকারের নতুন বইয়ের কয়েকটি কপি অনেকে দিল্লী থেকে আনিয়েছেন। আমার শুধু তার একটি কপি নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। এখনো পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বইয়ের ভেতরের পাতাগুলোতে মাঝেমধ্যে যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে তিনি তৎকালীন তালেবান অধ্যুষিত আফগানিস্তান, ইসলামী জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের উত্থান নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে আজকের বাংলাদেশও সেদিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপক্ষেতা, সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্র আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। সুশীল সমাজ সেটিকে ঠেকাতে পারছেনা। যেহেতু এখনো সম্পূর্ণ বইটি পড়া হয়নি, সে কারণে এই বই নিয়ে বিশেষ কিছু না বলে কারলেকারের আশঙ্কা নিয়ে দুয়েকটি কথা বলছি। বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আন্দোলনের ইতিহাস আফগানিস্তানের মতো নয়। বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশ শুধু আফগানিস্তানের নয়, সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এশিয়ার বড়বড় কয়েকটি দেশের তুলনায়ও এগিয়ে গেছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মোজাহিদীন ও জাগ্রত মুসলিম জনতার সদস্যদের রাজনৈতিক বা সমাজ সচেতনতা এবং এমনকি ইসলাম সম্পর্কে তাদের জঙ্গিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আফগানিস্তানের তৎকালীন তালেবানদের কিছুটা মিল থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তাছাড়া বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসায় পবিত্র কোরআন এবং ইসলামের শিক্ষা দেয়া হলেও সে শিক্ষার সাথে ধর্মান্ধতা কিংবা মৌলবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেরও কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। তারা একটি মুক্ত দেশে জন্মেছে এবং এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। তারা ইসলামী বিপ্লব করার জন্য মাদ্রাসায় পড়েনা। তাছাড়া তাদের পাঠ্যক্রমের সাথে বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহেরও কোনো সম্পর্ক নেই। এদেশের ৯০ শতাংশেরও অধিক মানুষ মুসলমান। তারা এদেশের সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আস্থাবান। এদেশে ইসলামী শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেনা। ইসলামী শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী দলও এদেশের চলমান সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্র ও সরকারের অংশ। তারা তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল। তাদের একাত্তরের ভূমিকা দেখে কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে ধর্মহীন হতে চায়, সেটি তাদের ব্যাপার। জামায়াত একাত্তরে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েই জাতীয় রাজনীতির অংশীদার হয়েছে এবং অবদান রাখছে।

দেশীয় রাজনীতি একাত্তরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিরদিন আবর্তিত হতে পারেনা। কারণ বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে নিত্যনতুন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে পারে যা এ জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনো চিরস্থায়ী ফ্যাক্টর হতে পারেনা। রাজনৈতিক অনৈক্য, অস্থিরতা, বিদ্বেষ ও হানাহানি বজায় রেখে কোনো জাতি কোনো ক্ষেত্রেই তার কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনা। আজ জামা'আতুল মোজাহিদীনের সন্ত্রাস ও বোমাবাজির দায়ভার জামায়াতে ইসলামীর কাঁধে চাপিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন চার-দলীয় জোটে ভাঙ্গন ধরানোর যে চেষ্টা চলছে দেশের জনসাধারণ সে ব্যাপারে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। তাছাড়া এখন বোমাবাজির রহস্য ক্রমশ বেরিয়ে আসছে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন পরিষ্কারভাবে জানা যাবে এ আত্মঘাতি বোমাবাজির পেছনে কারা রয়েছে? এ বোমার সমস্ত রসদ এসেছে দেশের বাইরে থেকে। অর্থের উৎস সম্পর্কেও ক্রমশ অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেছেন, বাংলাদেশকে যারা অকার্যকর বা ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এর সাথে হয়তো বোমাবাজদের যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বাইরের প্রভাবের চেয়ে অভ্যন্তরীন প্রভাবই বেশি কাজ করছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেই সেখানে জঙ্গিবাদ থাকবেনা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বোমা তৈরীর যত উপাদান ও বিস্ফোরকদ্রব্য পাওয়া গেছে তার প্রায় সবকিছুই এসেছে ভারত থেকে। ভারত যদি এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশে বোমাবাজি ও নাশকতামূলক কাজ বন্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতের সাথে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি অর্থবহ সমঝোতা হলে দেশ সত্যিকার অর্থেই উপকৃত হবে।

সন্ত্রাস ও আত্মঘাতি বোমাবাজির মাধ্যমে শুধু জামা'আতুল মোজাহিদীনই দেশে আতঙ্ক ও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে না। সঙ্কট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে দেশের কতিপয় বিরোধী দলও। কথায় কথায় একটি নির্বাচিত সরকার পতনের দিন-তারিখ ঘোষনা করা সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক শক্তির কাজ হতে পারেনা। এ ব্যাপারে গত বুধবার পল্টনের মহাসমাবেশে ভাষনদানকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে নেতা উসকানিমূলক বক্তব্য দেবেন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি পেতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের বিরুদ্ধে উসকানিমলূক বক্তব্য

www.pathagar.com

দেয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্র করে এ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবেনা। তিনি বলেছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা।

প্রধানমন্ত্রীর কথায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। এর ফলে দেশের শান্তি ও উন্নয়নকামী মানুষ অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একমাত্র জনগণই পারে তাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে একটি দলকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসাতে। বুলেটের চেয়ে ব্যালট অত্যন্ত শক্তিশালী বলেই প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রথা বিশ্বব্যাপী এতোটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, উসকানি, সন্ত্রাস ও বোমাবাজি তার বিকল্প হতে পাওে না। কারও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দেশে অহেতুক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে দেয়া যেতে পাওে না। ইসলামী আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠার নামে দেশে বোমাবাজির মাধ্যমে আতঙ্ক ও অস্থিরতা সৃষ্টি করা আর গণঅভ্যুত্থানের নামে দিন তারিখ ঘোষণা করে একটি নির্বাচিত সরকার পতনের নামে উসকানি দেয়া সমান অপরাধ। কারণ দু'টিই এখন সভ্য ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে অত্যন্ত ধিকৃত কাজ।

www.pathagar.com

আত্মঘাতি বোমা না আত্মঘাতি রাজনীতি

নয়া দিগন্ত, ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৫

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সমস্যারও কিছু উৎকৃষ্ট সমাধানের সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস এবং বোমা হামলার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ যে স্বতস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে উঠছে এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে করি। পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে যে অপশক্তি আজ দেশ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদের সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহর-নগর পর্যন্ত মানুষ আজ ঘরে ঘরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। মানুষ ক্রমশ এখন যতই বুঝতে পারছে যে এটি একদিকে যেমন ইসলাম, অপরদিকে দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি মহল বিশেষের গভীর ষড়যন্ত্র, তখনই সর্বত্র তারা আবার জেগে উঠতে শুরু করেছে। তাই এ সময়টি আমাদের জাতির জীবনে এখন এক অগ্নিপরীক্ষার সময় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

জামা'আতুল মোজাহিদীনের আত্মপ্রকাশ এবং হঠাৎ করে দেশব্যাপী তাদের বোমা হামলার কারণে জনমনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারা এই জামা'আতুল মোজাহিদীন? তাদের পেছনে কারা শক্তি যোগাচ্ছে? অর্থ যোগান দিচ্ছে কারা এবং সরবরাহ করছে বিপুল পরিমাণ বোমার সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র? নির্বাচনকে সামনে রেখে বোমাবাজির মাধ্যমে দেশকে অস্থির করে তোলা, বিভিন্ন পেশাজীবী হত্যাসহ জনগণকে আতঙ্কগ্রস্ত করা এবং নানান অভিযোগ এনে বর্তমান চার-দলীয় জোট, বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াত ঐক্যে ফাটল ধরানোই এ হামলার মূল উদ্দেশ্য বলে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, এমনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, এ হামলার নীল নকসা প্রণয়ন করা হয়েছে দীর্ঘদিন আগে। এবং এর সাথে মৌলবাদ ও ধর্মীয় রাজনীতির প্রশ্নকে টেনে এনে একটি গোষ্ঠি নিজেদের এবং তাদের মদদদাতাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যই বাংলাদেশে আজ ইসলামকে দাঁড় করিয়েছে অপরাধীর কাঠগড়ায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এ অবশ্যম্ভাবী বিষয়টি সূচনা থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। তাছাড়া আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গোয়েন্দা তৎপরতাও এত শক্তিশালী নয় যে এর বিরুদ্ধে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

দেশব্যাপী ১৭ আগষ্টের বোমাবাজির পর নয়া আঙ্গিকে যে আত্মঘাতি হামলা শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। ইসলামের নামে বোমাবাজির মাধ্যমে আত্মহত্যা করে বেহেশতে যাওয়ার জন্য যারা তৈরী হয়েছিল তারা মোটেও জানেনা আসলে তারা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিচারক, আইনজীবী কিংবা সাধারণ মানুষ হত্যা করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা কিংবা আইনের বাস্তবায়ন করা যায়না। তারজন্য চাই সত্যিকার অর্থে কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের আদর্শের শান্তিপূর্ণ প্রচার, সেই সাথে

www.pathagar.com

নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষায় আরো আলোকিত করে তোলা এবং অন্যদেরকে সে কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের সম্পূর্ণ এক বিকৃতরূপ তুলে ধরার অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করলাম। দেশীয় রাজনীতিতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার স্লোগান প্রদানকারী গোষ্ঠী অর্থাৎ যারা সর্বত্র মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা এবং তালেবান কিংবা আল কায়েদাকে স্বপ্নে দেখেন, তারা এ অবস্থায় সরকারের পতন দাবী করে বসলেন। কিছু হলেই তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে একটি শ্লোগান, 'সরকারের পতন চাই'। তাছাড়া এমনও বলা হয়েছে যে সরকার পদত্যাগ করলে তাৎক্ষণিকাভাবে বোমাবাজি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সঙ্গত কারণেই জনগণ প্রশ্ন তুলছে, তাহলে আপনারাই কী এটা করাচ্ছেন যে সরকার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালে আপনারা তা বন্ধ করে দেবেন? এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও তার ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের অনেকে বলতে শুরু করলেন যে, দেশে মৌলবাদের উত্থান ও বোমাবাজির জন্য মূলত জামায়াতে ইসলামীই দায়ী। বুঝে হোক আর না বুঝেই হোক অনেকেই এর পুণরাবৃত্তি করতে শুরু করলেন। বলা হলো, বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট থেকে যে কোনোভাবেই হোক জামায়াতকে হটাতেই হবে। সর্বক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বিএনপি-জামায়াত সমঝোতা এবং জোট ভেঙ্গে দিতে হবে। নতুবা তারাই আবার ক্ষমতায় আসবে।

বিরোধী শিবিরে এ মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতির সূচনা হয়েছিল গত নির্বাচনের (২০০১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন) বহু আগে থেকে অর্থাৎ আওয়ামী শাসনামলের শেষ দিকে যখন বিএনপি-জামায়াত তৎকালীন সরকার বিরোধী আন্দোলনের জোট থেকে নির্বাচনী জোট গঠন করে তখন থেকেই জামায়াতের বিরুদ্ধে একটি মহল বিষোদগার ছড়াতে শুরু করে। জামায়াত জোট সরকারের অংশীদার হওয়ার ফলে এটি আরও বেড়ে যায়। পরোক্ষভাবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয় তালেবান ও আল-কায়েদার সাথে। অথচ বাকশাল নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন আবার আত্মপ্রকাশ করে তখন থেকেই জামায়াত বাংলাদেশের সাংবিধানিক, নিয়মতান্ত্রিক এবং পরবর্তী পর্যায়ে সংসদীয় রাজনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করে। জামায়াত যতদিন বিরোধী দলে ছিল ততদিন তাদের ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। এখন কেন উঠছে তা দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ভালো করেই জানেন।

এ অবস্থায় দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস ও আত্মঘাতি বোমা হামলা প্রতিরোধকল্পে দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আহবান জানান। সে সংলাপেও কেউ কেউ জামা'আতুল মোজাহিদিনের সন্ত্রাস ও বোমা হামলার পেছনে জামায়াতে ইসলামীর অদৃশ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তারা জামায়াতের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনেক অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে বলেছেন, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে বাস্তবে কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে কাউকে ছাড়

www.pathagar.com

দেয়া হবে না। তাছাড়া গত বুধবার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ চলাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটকে ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে যা হচ্ছে সে ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি বলেছেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে। কেউ ষড়যন্ত্র করে এ জোটে ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না। ২০০১ সালের নির্বাচনে জোট যে সফলতা লাভ করেছে, ২০০৭ সালের নির্বাচনেও সে রকম ফলাফলই আশা করেন তিনি। দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও বোমাবাজি বন্ধ করার লক্ষ্যে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান। এতে বর্তমান সন্ত্রাস ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে বলে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) ঢাকা ও চট্টগ্রাম অফিস থেকে বুধবার বিকেলে সকল সংবাদ সংস্থা, পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ডাক আসে তাদের কাছে জরুরী সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে ছুটে যাওয়ার জন্য। সেখানে সাংবাদিকদের জন্য বিরাট খবর অপেক্ষা করছিল। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রায় একই সময় এসেছিল দুটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর খবর। নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মোজাহিদীন (জেএমবি) প্রধান শায়খ আব্দুর রহমানের ছোটভাই ও তাদের সামরিক শাখার প্রধান আতাউর রহমান সানিকে ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ ডিসেম্বর। তাছাড়া তার কাছে খবর পেয়ে জেএমবি'র প্রধান হিসাবরক্ষক এবং অর্থ আদান-প্রদানে সহায়তাকারী ফরিদুজ্জামান ওরফে স্বপনকে গ্রেফতার করা হয় রাজধানীর কলাবাগান থেকে। অপরদিকে জেএমবি'র চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমান্ডার জাবেদ ইকবাল ওরফে মোহাম্মদ এবং কক্সবাজার জেলা কমান্ডার নাঈমুজ্জামান ওরফে জাফরকে র‍্যাব গ্রেফতার করে চট্টগ্রামের কর্নেলহাট এলাকার একটি আস্তানা থেকে। এদের মোট আট জনের গ্রেফতারের পাশাপাশি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে গ্রেনেডসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করে র‍্যাব।

জেএমবি'র উল্লেখিত নেতাদের গ্রেফতারের ঘটনা প্রকাশ হওয়ার একদিন আগে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন, শায়খ রহমান আমার ভগ্নিপতি, এখন সরকারের হেফাজতে রয়েছেন তিনি। তাকে দিয়ে জবানবন্দি রেকর্ড করানো হচ্ছে। এতে নাকি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাকে (মীর্জা আজম) বিভিন্ন ঘৃণ্য কর্মকান্ডের সাথে নাকি জড়ানোর অপচেষ্টা চলছে। জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান এখনো গ্রেফতার হয়েছেন কিনা কেউ জানেনা। এ ব্যাপারে সরকার এখনও কিছুই বলেনি। তবে মীর্জা আজম যে সমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন তাতে জনগণের মাঝে ইতোমধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। শায়খ আব্দুর রহমানকে দিয়ে কী সমস্ত জবানবন্দি রেকর্ড করানো হচ্ছে, তা তিনি জানলেন বা আঁচ করলেন কীভাবে? এখন জনমনে প্রশ্ন উঠছে যে, সন্ত্রাস ও বোমাবাজি রোধকল্পে প্রধানমন্ত্রী আহুত সংলাপে আওয়ামী লীগসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয়

www.pathagar.com

জোট কেন অংশ নিচ্ছে না। আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সংলাপের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা সহ ১৪ দলীয় জোটের নেতারা সন্ত্রাস-বোমাবাজির জন্য একদিকে মূলত জামায়াতকে দায়ী করেছেন, অপরদিকে সন্ত্রাস-বোমাবাজি বন্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য সরকারের পদত্যাগ দাবী করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির জন্য কী জামায়াতে ইসলাম দায়ী? আর সরকার পদত্যাগ করলে যে বোমাবাজি বন্ধ হবে তার নিশ্চয়তা তারা দেবেন কীভাবে? সে কারণেই বিএনপি'র মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তারা কি বোমাবাজির সাথে জড়িত যে সরকার পদত্যাগ করলে তারা তা বন্ধ করে দেবেন? দেশের মানুষ সকল প্রকার সন্ত্রাস ও বোমাবাজির অবসান চায়।

সন্ত্রাস ও বোমাবাজি একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা অভাবিত। সরকার এ ধরনের অনাকাঙ্খিত সমস্যা রোধকল্পে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে ইতোমধ্যে দেশের জনগণের আস্থা জন্মেছে। কারণ, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির প্রথম সারির গডফাদাররা এখন ক্রমশ ধরা পড়ছে। তাদের কাছ থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ধরা পড়ছে অস্ত্রশস্ত্রসহ বিশাল বিস্ফোরকের পাহাড়। তাই সর্বস্তরের মানুষ এখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদের বিরুদ্ধে। তারা জানতে পারছে বোমাবাজদের দেশী-বিদেশী 'কানেকশন' বা শক্তির উৎসের কথা। জেএমবি'র চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমান্ডার মোহাম্মদ উল্লেখ করেছে ভারত থেকে কীভাবে অস্ত্র আসছে, কারা কোথা দিয়ে সেগুলো পাঠাচ্ছে এবং কীভাবে সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক বিতরণ করা হচ্ছে। এর ফলে ঘটনার প্রকৃত চিত্র দ্রুত উন্মোচিত হচ্ছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যে আত্মঘাতি বোমাবাজি শুরু হয়েছে তা আসলে একটি দীর্ঘ পরিকল্পিত আত্মঘাতি রাজনীতি হিসেবেই এখন প্রতীয়মান হচ্ছে। এ আত্মঘাতি ক্ষমতার রাজনীতি ক্রমশ এখন দেশের উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিনিয়োগের সমূহ সম্ভাবনাকে ঠেলে দিচ্ছে এক চরম অস্থিরতা ও আশঙ্কার দিকে। এ অবস্থা থেকে সর্বস্তরের মানুষ এখন পরিত্রাণ চায়। তারা যেমন এ আত্মঘাতি রাজনীতি চায়না, তেমনি সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবও চায় না। পৃথিবীর কোথাও সন্ত্রাস এবং বোমাবাজির মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটেনি। প্রতিষ্ঠিত হয়নি ইসলামী শাসন ও আইন। সে কারণেই এ বিজয়ের মাসে মানুষ তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিঃসংশয় করতে চায়। অবসান ঘটাতে চায় দেশের স্বার্থ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের। একমাত্র তা হলেই এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ তা কখনও নিশ্চিত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

সরকার পতনের আন্দোলন বনাম সংলাপ

নয়া দিগন্ত, ১০ ডিসেম্বর ২০০৫

একচোখা রাজনীতি এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভীত ও ভবিষ্যতকে দুর্বল করে রেখেছে। বিরোধী দলগুলো যদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ক্ষমতাসীনদের সাথে না বসে তাহলে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হবে কী করে? আসলে স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও আমরা ঔপনিবেশিক রাজনীতির রাহুগ্রাস থেকে এখনো মুক্তি পাইনি। আমাদের রাজনৈতিক 'মাইন্ডসেট' বা মানসিকতা এখনো ঔপনিবেশিক আমলেই রয়ে গেছে। তাই যে কোনো নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রথমদিন থেকেই বিরোধী দলের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে কীভাবে তার পতন ঘটানো যায়। ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুর সমাধান না খুঁজে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে কীভাবে নানা অপকৌশলে সরকারকে অস্থির করা যায় এবং দেশকে করে তোলা যায় অস্থিতিশীল। এটাই যেন আমাদের বিরোধী দলসমূহের একমাত্র ভূমিকা বা রাজনৈতিক কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানী শোষক-শাসক এবং আধা-ঔপনিবেশিক শাসনামলে কিংবা স্বাধীনতার পর বিশেষ করে এরশাদের স্বৈর শাসনামলে এ দেশের গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলো যে ধরনের সরকার পতনের আন্দোলন করেছে, আজও তা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯১ থেকে এ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এরশাদের পতনের পর ক্ষমতায় এসে বিএনপি দেশে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে, যা একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে গিয়েছিল। সুতরাং দেশে পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে সাধারণ মানুষ ভেবেছিল এবার গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন এবং বর্ধিত বিনিয়োগের কারণে বেকারের কর্মসংস্থান হবে, দরিদ্রের অভাব দূর হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে।

পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রায় দেড় দশক পর অর্থাৎ বিএনপি'র ক্ষমতালাভের পর দেশে যখন আবার সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হলো তখন জনগণ ভেবেছিল এবার বুঝি দেশের দুটি প্রধানদলের রাজনীতিকরা দেশ ও জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করবে। কারণ সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবী আওয়ামী লীগের ছিল দলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। প্রয়াত জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই ওয়েস্টমিন্স্টার ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার কথা বলতেন। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং রাজনৈতিক কারণে এ পদ্ধতিকে তিনি আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করতেন। কিন্তু তার শাসনমলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে তাকে নাকি বাধ্য করা

www.pathagar.com

হয়েছিল একদলীয় স্বৈরশাসনের দিকে যেতে। সে করুণ অধ্যায় শেষ হয়ে এরশাদ পরবর্তী সময়ে যখন আবার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ খুশীই হয়েছিল। অভিনন্দন জানিয়েছিল বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন বিএনপিকে। কিন্তু একটি আলোকিত বিরোধী দলের গঠনশীল ভূমিকা বেশিদিন পালন করতে পারলো না তারা। ধার করা তত্ত্ব নিয়ে দাবী ওঠালো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, যা বিশ্বের কোনো সংসদীয় পদ্ধতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে দাবীকে কেন্দ্র করে আবার ঔপনিবেশিক কায়দায় সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করা হলো। শুরু হলো জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর, হরতাল, অবরোধ এবং সর্বোপরি বোমাবাজি। সে দাবীর প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াই আবার দায়িত্ব নিয়ে সংবিধানে ১৩তম সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ তখন সংসদে যায়নি। তার প্রায় ১০ বছর পর এখন আবার তাদেরই প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের দাবীতে আন্দোলনে নেমেছে আওয়ামী লীগ। আন্দোলনের লক্ষ্যে গঠন করেছে ১৪ দলীয় সরকার বিরোধী জোট।

এ অবস্থায় গত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো জামায়াতুল মোজাহেদিন নামক একটি উগ্র জঙ্গিবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাদের দাবী দেশে ইসলামি শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠা। কথিত মোজাহেদিনের দাবী-দাওয়া, আদর্শ কিংবা কর্মসূচির কথা জনগণ ভালো করে জানার আগেই শুরু হলো আদালত কিংবা বিচারালয় কেন্দ্রিক বোমাবাজি। এতে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কিছু বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ ও সাধারণ নীরিহ মানুষ। সাংবাদিকসহ আহত হয়েছেন অসংখ্য নির্দোষ ব্যক্তিবর্গ। এতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো দেশবাসী। এ ঘটনায় চারিদিকে কিছুটা আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। নীরিহ দেশবাসী জানের নিরাপত্তার জন্য চোখ তুলে তাকালো রাজনীতিকদের দিকে, যারা বর্তমানে সরকার কিংবা বিরোধী দলে রয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, এ বোমাবাজি নিয়েও দেশে এক নতুন রাজনীতি শুরু হয়েছে। জনগণ চাচ্ছে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি থেকে নিরাপত্তা। আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোট চাচ্ছে সরকারের পদত্যাগ। তারা বুঝাতে চাইলো এ বোমাবাজির জন্য সরকারই দায়ী। এতে জামায়াতে ইসলামিকে অভিযুক্ত করার জন্য জড়ানো হলো তাদেরই সৃষ্ট নানান বিতর্কে। তারপরও এসব ভুলে ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজি দমনের লক্ষ্যে সরকার দিলো রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি ঐক্যের ডাক। বিরোধী দলের নেতা এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কাছে প্রধানমন্ত্রী সংলাপের প্রস্তাব দিলেন। চিঠি পাঠালেন তার ব্যক্তিগত সহকারি সচিবের মাধ্যমে। কিন্তু তা গ্রহণ করলেন না তারা। ফিরিয়ে দেয়া হলো পত্র বাহককে।

এ ঘটনা এখানেই শেষ নয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তসহ জোট

www.pathagar.com

নেতারা বার বার বলতে থাকলেন, এ সরকার পদত্যাগ করলেই বোমাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। এর জবাবে বিএনপি'র মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বললেন, বোমাবাজি কি বিরোধী দলই করছেন যে সরকার পদত্যাগ করলেই তারা তা বন্ধ করে দেবেন? মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভঁইয়া, মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আবদুল্লাহ আল নোমান সহ সরকারী দলের প্রভাবশালী নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত এক সভায় সংলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার জন্য বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা করলেন। সুশীল সমাজ বললো, দেশের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দেয়া একটি অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক কাজ। এটি শুধু গণতান্ত্রিক দিক থেকেই নয়, আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাবের দিক থেকেও একটি অসদাচরণমূলক কাজ হয়েছে।

সংসদীয় রাজনীতির কিছু লৌকিকতা, শিষ্ঠাচার এবং মূল্যবোধগত সংস্কৃতি রয়েছে। সংলাপের প্রস্তাব সম্বলিত প্রধানমন্ত্রীর চিঠি ফেরত পাঠিয়ে বিরোধী জোট তা লংঘন করেছে । একগুয়েমি, অসদাচরণ কিংবা গায়ের জোরে গণতন্ত্র চলেনা। সকল অবস্থায় সংলাপ হচ্ছে সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গণতন্ত্র চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশ গ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে। সেখানে ব্যক্তিবিশেষের হুকুমজারি কিংবা আধিপত্য কোনোমতেই কার্যকর হতে পারেনা। কারণ জনগণ তা প্রত্যাখান করতে বাধ্য। একথা অনস্বীকার্য যে দেশ আজ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। এটি একটি জাতীয় সঙ্কট। এরজন্য সরকার কিংবা সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল দায়ী নয়। এ ঘটনা আওয়ামী লীগ কিংবা অন্যান্য যে কোনো দলের শাসনামলেই ঘটতে পারতো। আজকের বিশ্বে এটি কোনো অবিশ্বাস্য কিংবা অভাবিত বিষয় নয়। সুতরাং উগ্র ধর্মান্ধতা কিংবা শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি যে কোনো মূল্যের বিনিময়েই বন্ধ করতে হবে। একে কোনো মতেই চলতে দেয়া যায়না। এ ধরনের সন্ত্রাস কিংবা বোমাবাজি থেকে কেউ যদি রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর চেষ্টা করে তাহলে বলতে হবে তাদের রাজনীতিতে আসাই উচিত হয়নি। কারণ দলমত নির্বিশেষে এ অপশক্তিকে রোধ করা না গেলে চরম আতঙ্ক, অস্থিরতা ও অরাজকতার কারণে একদিন রাষ্ট্র কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বে। এতে সাংবিধানিক, সংসদীয় ও নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে। ফলে সুশৃঙ্খল ও সাংবিধানিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোনো দলের পক্ষেই ক্ষমতা ধরে রাখা কিংবা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। যেকোনো ক্ষেত্রে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সরকার ও জনগণকে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কোনো সরকারই এলোমেলো বৈশাখী ঝড়ে কাঁচা আমের মতো খসে পড়েনা। তথাকথিত গণ অভ্যুত্থানের নামে কোনো নির্বাচিত সরকারকে গায়ের জোরে অস্থির করে তোলা কিংবা ফেলে দেয়ার মতো অগণতান্ত্রিক কৌশল আজকের বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান থেকে শুরু করে কেউই আর সমর্থন করে না। কারণ এতে শুধু গণতন্ত্র পর্য্যুদস্ত হয়না, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ মানুষের স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। সে কারণে তাদের দেশে সরকার পতনের

www.pathagar.com

নামে রাজপথে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে দেয়া হয় না। সবকিছু ঘটে সংসদের অভ্যন্তরে কিংবা বৃহত্তরভাবে জনগণের ভোটে। তাই আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন সমমনা দলগুলো যদি মনে করে প্রতিবার বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এভাবেই তাদের বিরুদ্ধে সরকার পতনের আন্দোলন করতে হবে এবং তারা বিরোধী দলের কোনো গঠনশীল ভূমিকা পালন করবে না, তাহলে এদশে গণতন্ত্র কোনো দিন শঙ্কামুক্ত হবে কিনা বলা কঠিন। আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, এগুলোতে কোনো কাজ হবে না। নির্বাচনের আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই সরকার পতনের চিন্তা বাদ দিয়ে দেশব্যাপী নিজেদের পক্ষে জনমত গঠণ করুন। নতুবা রাজনৈতিক আম এবং ক্ষমতার ছালা দু'টোই যাবে। তাছাড়া ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে দেশ ধ্বংশকারী আর তথাকথিত সরকার পতনের আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর ও হরতালের মাধ্যমে দেশ ধ্বংশকারীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ দুটিই কী রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী অপশক্তি নয়? এভাবে অচলাবস্থা বা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে হলে আর গণতন্ত্র, নির্বাচিত সরকার অথবা সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র সংসদের কথা বলে লাভ কী? আর এদেশে যারা ইসলামি শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কারা? তারা যদি সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে বলতে হবে তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তারা আসলে ইসলাম বিরোধী কাজ করছেন। বোমাবাজি করে নিরীহ মানুষ হত্যা করে বেহেশতে যাওয়া যায় না। ইসলামও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যাপক জনগণকে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ, আইন, প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থনীতিসহ সবকিছু সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা আত্মঘাতি বোমা হামলা আর আত্মহত্যার কার্যক্রম কারও ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক কোনো কাজেই আসবে না।

এ অবস্থায় বিবেকহীন ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজি বন্ধ করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সকল দল ও মতের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গঞ্জে এবং শহর-নগরে সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তাদের দমন করা। আত্মঘাতি বোমাবাজদের আক্রমনে যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের গায়ে কোনো দলের নাম লেখা থাকে না। সে কারণেই নীরিহ মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দলের মাঝে সংলাপ এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। নতুবা এ সরকার চলে গেলেও বর্তমান ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজি নির্মূল হবে না। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবেনা আগামী নির্বাচন। প্রাণ হারাতে হবে অনেক প্রার্থী ও নিরীহ ভোটারদের। সুতরাং সরকার পতনের স্বাধীনতাপূর্ব ঔপনিবেশিক কৌশল দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকর রাখা যাবে না। এতে শুধু বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলই নয়, এ দেশটিই ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া একজন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন, 'অন্যরা যখন আক্রান্ত হয় তখন কেউই নিরাপদ বা মুক্ত থাকতে পারেনা।' আজ বিচারক কিংবা আইনজীবীদের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে কাল তা এদেশের বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীদের ওপরও শুরু হতে পারে। সেজন্যই এ বর্বরোচিত হামলা এবং অরাজকতা বন্ধ করার লক্ষ্যে সকল দলের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বোমা যখন বেহেস্তের চাবি

নয়া দিগন্ত, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৫

পবিত্র ধর্ম ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে কেউ যখন বেহেস্তে যাবার চাবিকাঠি মনে করে তখন বুঝতে হবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। আর এটিকে ইস্যু করে যারা হরতাল ও অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সরকার পতনের আন্দোলনকে জোরদার করতে চায়, তারা আসলে দেশকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছে সম্ভবত নিজেরাই জানেনা। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের স্থায়িত্ব রক্ষায় আজ যেখানে দল, মত ও পেশা নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে তখন বোমা হামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ এনে আদালতে রিট করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। বরং এ অবস্থায় খোলার আগুন থেকে তাদের চুলার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আজকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ তাদের কালকের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে। নতুবা তাদেরকেও সন্ত্রাসী ও বোমাবাজরা ভবিষ্যতে ছেড়ে দেবেনা। বরং তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় ও করুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কী কারণে তারা তা ভালো করেই জানেন।

অপরিকল্পিত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য; সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একজন শিক্ষিত, সচেতন এবং কর্মজীবী মানুষকে অনেক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হয়। ফলে তাকে ভিত্তিহীন আবেগপ্রবণতা দিয়ে ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক কোনো বিষয়েই বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী করা সহজ হয়না। কারণ প্রকৃত অবস্থা, চিরায়ত সত্য এবং কায়েমী স্বার্থের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা রয়েছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ, বেকার, দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং নিজের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে হতাশ যে কোনো যুবক-যুবতীকে অতি সহজেই বিপথগামী করা সম্ভব। ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠির স্বার্থে তাদের 'মগজ ধোলাই' করতে বেশি সময় লাগেনা।

সমাজ পরিবর্তনের জন্য বামপন্থীদের সশস্ত্র বিপ্লব কিংবা ইসলামী শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠার নামে নিরীহ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে কোনো মহৎ কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মাঝে পশ্চিমা ধনতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র আর অপরদিকে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদের প্রেক্ষিতে ও বিরাজমান পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। আসছে বিভিন্ন স্খলন, বিচ্যুতি ও নানা পার্থিব সংস্কার, যা ইহজাগতিক কায়েমী স্বার্থের কারণেই মূলত ঘটে যাচ্ছে। এসব মতবাদ যেমন মানবসৃষ্ট ও ইহজাগতিক তেমনি পরিষ্কারভাবে দ্বন্দ্বমূলক এবং ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সেকারণেই আজ বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সৃষ্ট ইসলামিক বিধান নিয়ে এত আলোচনা, গবেষণা এবং তাকে নতুন কলেবরে জানার এত আগ্রহ। এটি একটি বাস্তব সত্য। একে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনো রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সচেতন মানুষের কাজ নয়।

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহর বিধান 'ইসলাম' হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের ধর্ম। সামগ্রিক অর্থে ইসলাম একটি 'পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।' এ অবস্থায় জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের কোনো কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কতিপয় রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠি ইসলামের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কিংবা স্বার্থ উদ্ধারের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জনজীবন বিপন্ন করে তুলছে। এর নাম ইসলাম নয়। বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও নিরীহ মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়না। ইসলামে এর বিধানও নেই। একজন প্রকৃত মুসলমান হতে গেলে তার প্রয়োজন কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ও উপলব্ধি এবং তার প্রাত্যহিক চর্চা। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আগে কুরআনের শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশদভাবে জানতে হবে ইসলামি শাসন, আইন, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে। এগুলো ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। সে কারণেই ইসলামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, জীবননাশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরা মা-য়িদাহ্‌র ৩২ পারাতে আল্লাহ্‌পাক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "এই কারণেই আমি বনি ইসরাঈলদের প্রতি বিধান দিলাম, যে ব্যক্তি জীবননাশের বা দেশ ধ্বংসকারীতার অপরাধ ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করে, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করিল এবং কেহ কাউকে বাঁচাইলে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করিল; অধিকন্তু তাহাদের নিকট আমার রসুলগণতো উজ্জ্বল প্রমাণসহ আগমণ করিয়াছিল; অনন্তর নবীগণের পরেও ওদের অনেকে দেশে সীমা অতিক্রম করিয়া ফিরিতেছে।" এই বিধানের কারণে যারা ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি কিংবা অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে নিরীহ মানুষ হত্যা করার অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকেই বরং সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা এখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

কোনো একটি মুসলিম জনগোষ্ঠি তাদের দেশে গণতান্ত্রিকভাবেই ইসলামি শাসন এবং আইন প্রতিষ্ঠার দাবি উঠাতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন আদালতের বিচারক, আইনজীবি এবং নিরীহ মানুষকে বোমার আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নিদারুণভাবে হত্যা করার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। এতে বরং ইসলামের পবিত্র নামকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। ইসলাম হচ্ছে শান্তি, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও উদারতার ধর্ম। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) তার সাহাবা এবং উপস্থিত মুসলিম জনতার কাছে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে তার বাণী, ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি কাউকে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনেড বা বোমা সরবরাহ করেননি। সেজন্য তিনি বিশ্ব মুসলিমের কাছে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার কোরআন এবং তার (নবীর) সুন্নাহ। সে কারণে আজ যারা ইসলামের নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও গণবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে 'বিপদগামী।' তারা যদি সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এপথ পরিহার করতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে ষড়যন্ত্রকারী কিংবা চক্রান্তকারীদের সংস্পর্শ। যারা অপরের ক্রীড়নক হয়ে নিরীহ জনগণকে হত্যা এবং নিজের দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এটিকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তারা কোনো মতেই প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।

www.pathagar.com

কারণ একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছে দেশপ্রেম হচ্ছে তার ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একথাটি সবাইকে বুঝতে হবে। নতুবা এ ইসলাম তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ দেশের গ্রামেগঞ্জের অল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও বেকার কিছু যুবক-যুবতীর কাছে যারা বোমাবাজিকে পরকালে বেহেস্তে যাবার চাবিকাঠি হিসেবে তুলে ধরে বিপথগামী করেছে, তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বিগত বিএনপি সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামী যখন আওয়ামী লীগের পাশাপাশি সরকার বিরোধী আন্দোলন করেছে কিংবা আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিএনপি'র সাথে মিলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছে, ততদিন জামাতের বিরুদ্ধে কারও তেমন কোনো অভিযোগ ছিল না। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে জামায়াত বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট এবং বিশেষ করে পরে সরকারে যোগ দিলেই আওয়ামী লীগ শিবিরে যেমন তেমনি তাদের (জামায়াতের) ভেতরেও একটি ক্ষুদ্র অংশের মাঝে কঠোর সমালোচনা ও গাত্রগাহ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাভঙ্গের বিভিন্ন অভিযোগে জামায়াত তাদের দলের কিছু নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়। জানা গেছে তাদের অনেকেই পরবর্তীতে ঘোষিত জামাতুল মোজাহিদিনে যোগ দেয়। সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত এ দলটিই এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন কোর্টকাচারী বা আদালতে বোমা হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোটের অনেকে মনে করে বোমা হামলার পেছনে জামায়াতের হাত রয়েছে। জামায়াতসহ বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই মনে করেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতকে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই মূলত এ অভিযোগ তুলে ধরা হচ্ছে। এ অভিযোগ করেছেন জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও। তিনি মঙ্গলবার বোমা হামলার নিন্দা করে বলেছেন, বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার বিরোধী যে আন্দোলন চলছে তার সঙ্গে এ ঘটনাগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নিজামী বলেছেন, 'বোমা হামলার মূল টার্গেট হচ্ছে ক্ষমতাসীন জোটে ভাঙ্গন ধরানো এবং সরকারের দুর্নাম রটানো। তাছাড়া বিএনপি এসবের জন্য জামায়াতকে যাতে দায়ী করে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরী করা। তিনি বলেছেন, এ হামলায় চার দলীয় জোট নয়, আওয়ামী লীগই লাভবান হচ্ছে। যারা ধর্মের নামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং মানুষ হত্যা করছে তারা আসলে পথভ্রষ্ট। তারা ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, বোমা হামলায় এ পর্যন্ত যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে জামায়াতের একজন সদস্যও পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রতিক বোমা হামলার ঘটনায় স্থানীয়সরকার মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সারা দেশের আদালত প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বোমা হামলাকারীরা যতই শক্তিশালী হোকনা কেন, তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। আইনের হাত থেকে বোমা হামলাকারীরা কোনোক্রমেই রক্ষা পাবেনা বলে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বিএনপি মহাসচিব। বুধবার পূর্ব ঢাকার জুরাইনে আয়োজিত এক দলীয় সমাবেশ থেকে বিরোধী দলকে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

সংসদে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আসুন এ বোমাবাজি বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করি। ক্ষমতাসীন নেতারা বলেছেন, এ ইস্যুতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের মতো জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা আবশ্যক। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে এবং সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদের চিরতরে উৎখাত করতে হবে। গত রোববার ওসমানী মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় ইমাম সম্মেলন, ২০০৫-এ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যারা ইসলামের বিকৃতরূপ তুলে ধরছে এবং পবিত্র ধর্মের নামে দেশে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেছেন, যারা দেশ ও জাতির অগ্রগতি এবং সামাজিক শান্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই চক্রান্তকারীরা যেন ইসলামের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইমামদের প্রতি আহবান জানান।

এদেশে দুই লক্ষ মসজিদে চার লক্ষাধিক ইমাম রয়েছেন। তাদের মাঝে ৫৫ হাজার ইমাম রয়েছেন যাদের বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ ইমামরা উদ্যোগী হয়ে স্থানীয়ভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করলে দেশ থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজি বন্ধ করা অনেক সহজ হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে। বর্তমানে এ ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজিকে ইস্যু করে একটি বিশেষ মহল রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ইস্যুতে বিভক্ত হওয়া উচিত হবেনা বলে দেশবাসী মনে করে। সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি উচ্ছেদ করতে পারবেনা এমন নয়। কারণ এ দেশে স্থানীয়ভাবে সবাই সবাইকে চেনে। সুতরাং ইচ্ছা থাকলে বর্তমান সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদের প্রকৃত মদদদাতাদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন হবেনা। সন্দেহভাজনদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখাও দুঃসাধ্য নয়। যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী কিংবা আগ্রহী নয় সন্ত্রাস ও বোমাবাজি উচ্ছেদের প্রশ্নে তাদের কতটা সদিচ্ছা রয়েছে তা নির্ণয় করাও জনগণের পক্ষে কঠিন নয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যাপক এবং তীক্ষ্ণ নজরদারিও প্রয়োজন।

আদালত প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্থাপনায় বর্তমান ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বোমবাজির প্রেক্ষিতে দেখা গেছে বাংলাদেশের ১৪ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশ বাহিনীর শক্তি অতি সীমিত। বিভিন্ন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার মতো জনবল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাদের নেই। রাজধানী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। অথচ সে তুলনায় পুলিশ রয়েছে মাত্র ২০,০০০। এ সংখ্যা অতি দ্রুত অন্তত দ্বিগুণ করা আবশ্যক। ভারত এবং পাকিস্তানেও তেমন ব্যবস্থা রয়েছে। এর সাথে সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথোপযুক্ত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী। নতুবা একদিকে বর্তমান ধর্মীয় সন্ত্রাস বা বোমাবাজি এবং অপরদিকে দেশী-বিদেশী চক্রের বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা শুধু সদিচ্ছা দিয়েই সামাল দেয়া সম্ভব হবেনা।

www.pathagar.com

সার্ক ঃ পুরণো ফ্যাক্টরগুলো এখনও বলবত

নয়া দিগন্ত, ১৯ নভেম্বর, ২০০৫

সময়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় স্থায়িত্ব লাভের প্রশ্নে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক' উত্তীর্ণ হয়েছে বলে এখন কিছুটা দৃঢ়তার সাথেই বলা হয়। ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলনের সফল সমাপ্তি এবং 'ঢাকা ঘোষণায়' প্রকাশিত কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশের মূলত অর্থনৈতিক ফোরামকে এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি রাস্তা খুলে দিয়েছে। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে আজ সামগ্রিকভাবেই ভারত ও পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তা-চেতনায় একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এসেছে। এ অঞ্চলের ১৫০ কোটি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থেই আজ আর শুধু কথা না বলে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় এসে গেছে। সার্কভূক্ত দু'একটি দেশের অভ্যন্তরীন বিবাদ এবং বিরাজমান উত্তেজনার কারণে গত দু'টি দশক এ ফোরাম মোটেও সামনে এগুতে পারেনি। তাই মাঝেমধ্যে বরং মনে হয়েছে এ সংস্থার আসলে কোনো ভবিষ্যত নেই। এটি নেহাতই একটি 'টকিং শপ' বা সাউথ এশিয়ার নেতাদের একটি আঞ্চলিক 'সোশ্যাল ক্লাব'। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো সদস্যেরই এতে তেমন কোনো লক্ষণীয় আগ্রহ ছিল না।

আমি আগেও বহু লেখায় একটি কথা জোর দিয়ে বলেছি যে, শহীদ জিয়া সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা কিংবা বাংলাদেশে সার্কের জন্ম হয়েছে বলেই নয় বরং দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অগ্রগতির জন্যই এ অঞ্চলে বৃহত্তর সহযোগিতামূলক কার্যক্রম আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নতুবা দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ ও বেআইনীভাবে মানুষ পাচার রোধ, বৃহত্তর বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামোগত বিনির্মাণ সহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই ন্যূনতম কোনো আঞ্চলিক উন্নয়ন বা সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে না। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে, এবার ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সমস্ত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তারা অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, ১৯৮৫ সাল অর্থাৎ সার্কের আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে গত দু'দশক যাবত কোনো ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকভাবে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বরং এ সময়ে কোনো কোনো সদস্যের মাঝে আরো বেশি করে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, আধিপত্যবাদী মনোভাব এবং প্রতিবেশিদের অর্থনৈতিকভাবে দাবিয়ে রাখা কিংবা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ অবস্থায় অভিন্দন জানাই ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃবৃন্দকে যে, তারা এ অঞ্চলে বিরাজমান দীর্ঘদিনের পারস্পরিক অনাস্থা, অবিশ্বাস এবং এবং অবন্ধুসুলভ মনোজগত কিংবা 'মাইন্ডসেট' এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার একটি সুচিন্তিত ও সময়োচিত উদ্যোগ নিয়েছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে ত্রয়োদশ সম্মেলনে একটি কথা বলেছেন যে, বিগত দু'দশকে যা-ই হয়েছে তাকে নজরে রেখেই আগামী দশকটি হবে 'পরিবর্তনের দশক।' এবারের শীর্ষ সম্মেলনকে তিনি 'সুযোগের বার্তাবরণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সার্কভূক্ত সকল সদস্য দেশকে তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাত-জাতি আঞ্চলিক ফোরামের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আগামী ২০০৬-২০১৫ সালকে 'সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন দশক' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এটি জাতিসংঘ ঘোষিত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল'-এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশও। সে জন্য সম্মেলনের শুরুতেই তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক দারিদ্র্য বিমোচন তহবিল গঠণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি উদ্বোধনী অধিবেশনে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যও পাঁচটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ছাড়াও আঞ্চলিক বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর অবকাঠামো তৈরী এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য একটি দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব এসেছে।

সার্কভূক্ত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এবার বহু নতুন নতুন অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এসেছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে অনেক যাচাই-বাছাই করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। এখন নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও বলিষ্ঠ উদ্যোগের ওপরই আবার নির্ভর করছে সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন শেষে প্রকাশিত 'ঢাকা ঘোষণার' সফল বাস্তবায়ন। নতুবা অতীতে অর্থাৎ বিগত দু'দশকেও বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিন্তু তার পরপরই সেগুলো চলে গেছে হিমাগারে। দিনের আলোর মুখ দেখেনি তারা। এ সমস্ত থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্বাস ও অনাস্থা। সে কারণেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বলতে হয়েছে, সার্ক গঠনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে রাজনীতির কাছে জিম্মি করা যাবে না। তার এ মন্তব্যটি বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ বিশ্লেষক কিংবা সম্পাদকীয় লেখকরা অত্যন্ত সৎ, আন্তরিক ও বাস্তবসম্মত মন্তব্য বলে প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশকে আঞ্চলিকভাবে বাণিজ্য, উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি অত্যন্ত দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও সার্কের প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার বৃহত্তর স্বার্থে আগামী জানুয়ারী থেকে এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) চুক্তি বলবৎ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান সার্ক প্রধান বেগম খালেদা জিয়া।

সাফটা কার্যকর এবং ঢাকা ঘোষণা বাস্তবায়নের ওপরই এখন নির্ভর করছে প্রস্তাবিত দক্ষিণ এশীয় 'অর্থনৈতিক ইউনিয়ন' গঠনের সম্ভাবনা। একুশ শতককে বলা হয় এশিয়ার শতাব্দী। এশিয়ার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এই অগ্রযাত্রায় দক্ষিণ এশিয়াকে তার জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে অবশ্যই অগ্রসেনানীর ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু এ বিষয়টি সার্ক সদস্যভূক্ত দেশসমূহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও নীতি নির্ধারকরা কিভাবে নিয়েছেন জানি না তবে এ উপলব্ধি ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-চেতনার এখন আর কোনো বিকল্প দেখা যাচ্ছেনা। তবে ঢাকা ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ সার্ক

www.pathagar.com

স্ট্যান্ডিং কমিটির পরবর্তী বিশেষ অধিবেশনে সংস্থার তৃতীয় দশকের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। ঢাকা ঘোষণায় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা সাফটার বাণিজ্য, বর্ধিত বিনিয়োগ এবং সমন্বিত মান অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এর পরিসর বাড়িয়ে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতি প্রক্রিয়া আরো এগিয়ে নেয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে শুল্ক সংক্রান্ত পারস্পরিক প্রশাসন চুক্তি, সার্ক সালিশী প্রতিষ্ঠা চুক্তি এবং দ্বৈত করারোপ সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। যত অসুবিধাই থাক, এ প্রস্তাবিত চতুর্থ চুক্তিটি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত সার্কের তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশসমূহে আঞ্চলিক বিনিয়োগ বাড়বেনা। ফলে সে সমস্ত দেশসমূহে কাঙ্খিতভাবে উৎপাদন ও বাণিজ্য বাড়বেনা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবেনা, যা অত্যন্ত আবশ্যক।

দক্ষিণ এশিয়ায় সাফটা বা মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপনের প্রস্তাব ভবিষ্যতে সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেও সূচনায় বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভারত এবং তার তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও পাকিস্তানের মতো দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্যে প্রবেশ করার মতো বাস্তব অবস্থা বা সঙ্গতি বাংলাদেশে এখনো গড়ে ওঠেনি। তবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু অবস্থায় পৌঁছার। সেজন্য ঢাকা রুলস অফ অরিজিন, রাজস্ব ক্ষতিপূরণ ও স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা পরীক্ষা করছে। এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরণও বলেছেন যে, মুক্ত বাজার চালু হওয়ার আগে ফোরামের সদস্যদের উদ্বেগের কারণগুলোর সুরাহা হওয়া দরকার। তাছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজও এ ব্যাপারে বলেছেন যে, সার্ক দেশগুলোর মধ্যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু বাণিজ্য অঞ্চল শুরু করার ব্যাপারে শীর্ষ সম্মেলনের ঐকমত্য সত্ত্বেও অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধান করে সাফটার অধীনে কাজ শুরু করতে একটু সময় লেগে যেতে পারে। এতে আমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভারত মনেপ্রাণে চায় যথাশীঘ্র সাফটা বাস্তবায়িত হোক। তাতে তাদের লাভ অনেক, ক্ষতি খুবই সামান্য। বড় দেশ, বড় অর্থনীতি - তাই। তবে তার আগে আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত দক্ষিণ এশিয়ায় পরিপূর্ণভাবে মুক্ত বাণিজ্য চালু হলে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হবে। উন্নয়ন, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে, তার ওপরই নির্ভর করবে বাংলাদশের পরবর্তী পদক্ষেপ। কারণ একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, আমাদের দেশে এখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি। বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, বর্ধিত উৎপাদন ও বাণিজ্য ছাড়া কাঙ্খিত কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবেনা। তা ছাড়া বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীও আমাদেরকে কোনো স্থায়ী অর্থনৈতিক সমাধান এনে দেবেনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা ভাবনার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যান্যের মাঝে এবারের ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এবং ঢাকা ঘোষণায় দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিকভাবে একটি মুক্তবাজার গড়ে তোলার বাইরে দু'একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্ত্রাস দমন ছাড়াও বেশ কয়েকটি অভাবিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, সার্ক নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশে সহযোগিতা বাড়ানো এবং সদস্য দেশসমূহের সার্বভৌম সত্বা, ভৌগোলিক

www.pathagar.com

অখন্ডতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার অঙ্গিকার ঘোষণা। এতে দক্ষিণ এশিয়ার বড় রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিকভাবে আধিপত্য বিস্তার ও তাদের সম্প্রসারণবাদী কর্মকাণ্ড রোধ করার একটি দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যৌথ 'ঢাকা ঘোষণার' ক্ষেত্রে এ শীর্ষ সম্মেলনে এটা আশা করা যায়নি। 'ঢাকা ঘোষণার' এ দিকটি প্রতিপালিত হলে দক্ষিণ এশিয়ায় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের রাজনীতি অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে সন্ত্রাস ও সামাজিক অস্থিরতাও কমবে বলে বিশ্বাস। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সম্মেলনের সফল সমাপ্তিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ায় অবশ্যই আঞ্চলিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা ঘোষণায় আগামী এক দশকের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে 'রোডম্যাপ' প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ধারাবাহিক ও সাফল্যজনকভাবে অগ্রসর হলে এ অঞ্চলের ১৫০ কোটি মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ পরিবর্তন ছাড়া বিশ্বের বুকে দারিদ্র্য বিমোচন করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার আমাদের বিকল্প পথ খুব কমই আছে। ইতোমধ্যে আমেরিকা-প্যাসিফিকের আঞ্চলিক সংস্থা 'এপেক্স', ইউরোপের 'ইইউ' এবং দক্ষিণ এশিয়ায় 'আসিয়ান' আমাদেরকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। তার পাশাপাশি আমরা এখনো পড়ে আছি চরম হতাশাব্যঞ্জক এক অবস্থানে। তাছাড়া এখন ডাবলিউটিও (বিশ্ব বাণিজ্য) নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলছে নীতিগত দর কষাকষি। পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা। এ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে কাশ্মীর অথবা সাতকণ্যা নিয়ে, নেপাল মাওবাদী সংঘর্ষ, শ্রীলংকা তামিল ব্যাঘ্রদের উৎপাত কিংবা পাকিস্তান জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতী কার্যকলাপ নিয়ে আর কতকাল পড়ে থাকবে?

দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটি মানুষ এ অবস্থা থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ চায়। এ অভিশপ্ত বৃত্ত থেকে এখন বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো গতি নেই তাদের। সে কারণেই আফগানিস্তানও চায় সার্কের সদস্যপদ। আমাদের এ প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষকের মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে আসছে এশিয়ার দুই শক্তিশালী ব্যাঘ্র - চীন ও জাপান। এ সুযোগে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে তা যেমন অবিলম্বে দূর করা উচিত তেমনি সার্কের প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে যে সমস্ত জটিল দ্বিপাক্ষিক সমস্যগুলো প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করছে সেগুলোও দূর হওয়া উচিত। অভিন্ন নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মাণ এবং নদী সংযোগ কর্মসূচী হাতে নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করা উচিত। তাছাড়া সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করা এবং ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ফেরত না দেয়া আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জোরদার করার ক্ষেত্রে জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানের ক্ষেত্রেও এমন কিছু কিছু জটিল সমস্যা রয়েছে। সঙ্কট রয়েছে কাশ্মীর নিয়ে। এ ফ্যাক্টরগুলো এখনও বলবত রয়েছে। এগুলো অপসারিত না হলে গাছের উপর থেকে পানি ঢাললে কোনো লাভ হবেনা। তবে শান্তিপূর্ণভাবে বিরাজিত সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। তাই আমরা মনে করি সাময়িকভাবে সার্কের সামনে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও স্থায়ীভাবে এখন আর ১৫০ কোটি মানুষের ফোরাম সার্কের গতিরোধ করা সম্ভব হবেনা।

www.pathagar.com

মহা চ্যালেঞ্জের বছর ঃ বৃহস্পতি ও শনি

নয়া দিগন্ত, ১৫ অক্টোবর, ২০০৫

আগামী একটি বছরের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যত। অর্থাৎ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কীভাবে টিকে থাকবে তা নির্ভর করবে এদেশের আগামী এক বছরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর। গত ১৭ আগস্টের আগে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পরিচয় ছিল এক রকম। এখন তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে দেশব্যাপী বোমা হামলায়। বিশ্বের মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমা জগত, এতদিন বাংলাদেশকে চিনতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। আর এখন বাংলাদেশে তারা হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছে ইসলামী উগ্রপন্থী এবং জঙ্গীবাদীদের উত্থানের বিষয়টি। ১৭ আগস্টের আগে বাংলাদেশে অনেকে মৌলবাদীদের জঙ্গী বহিঃপ্রকাশ কিংবা এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত করার মতো অবস্থার কথা ধারণাও করতে পারেনি। 'বাংলাভাই'কে অনেকে মনে করেছে মিডিয়ার একটি কল্পিত চরিত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেছে, জাগ্রত মুসলিম জনতা যখন বামপন্থী কিংবা কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করছে তখন তারা তো আমাদেরই পক্ষের শক্তি। এ ব্যাপারে মিডিয়ার বাড়াবাড়ি বন্ধ করা উচিত।

১৭ আগস্ট আমাদের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে ভাটা পড়ার ধারাবাহিকতায় এ ধরনের জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ মানুষ আশা করেনি। তাছাড়া বোমা ফাটিয়ে যে ইসলামী শাসন কিংবা আইন প্রতিষ্ঠা করা যায় না এটি বোধ হয় তথাকথিত জঙ্গীবাদীরা জানে না। এতে শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা হচ্ছে।

এ ঘটনার সাথে দেশের শান্তি-শৃংখলা, আইনের শাসন, উৎপাদন ও বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রশ্নটি যেহেতু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেহেতু দেশের নেতৃস্থানীয় মানুষ বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে অবশ্যই বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগকারী যারা বাংলাদেশে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তারাও যে কিছুটা হোঁচট খাননি তা নয়। বাংলাদেশে সন্ত্রাস, রাহাজানি, মাস্তানি, চাঁদাবাজি ও বিশেষ করে দুর্নীতির অভিযোগ যখন সম্প্রতি কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল ঠিক তক্ষুনি ইসলামের নামে জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ এদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে পশ্চিমা দেশসমূহকেও যে কিছুটা ভাবিয়ে তুলেনি তা নয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আপসহীন ভাষায় যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তাতে দেশের জনগণ এবং বিদেশী নেতৃস্থানীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলো কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, তারা এ ধরনের জঙ্গী তৎপরতা ও সন্ত্রাস নির্মূল অভিযানে বাংলাদেশকে সম্ভব সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। ইসলামের নামে কোন মতেই এসব অনৈসলামিক ও গণস্বার্থ বিরোধী তৎপরতা চলতে দেয়া যেতে পারে না। এ ব্যাপারে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও জনগণেরও একটি বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। কারণ দেশটি অবশ্যই তাদের। এদেশের কেউ চায় না কতিপয় মানুষ কিংবা অশুভ চক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হোক। তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের এদেশে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আর কোনো অবকাশ থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের সকল স্বপ্ন ও চেতনার অপমৃত্যু ঘটবে। বর্তমান জোট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১০ অক্টোবর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সমাজকে অস্থিতিশীল, গণতন্ত্রকে বিপন্ন এবং সংবিধানকে অকার্যকর করার বিভিন্ন অপচেষ্টা যে কোনো মূল্যে রোধ করা হবে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রকে দেশ পরিচালনার পদ্ধতি এবং নির্বাচনকে সরকার গঠনের পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ীই এই দুই প্রথা ও পদ্ধতিকে রক্ষা করা হবে। এ অবস্থায় আবারও তিনি বিরোধীদলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছেন। বলেছেন, বিরোধী দলের সুবিবেচিত এবং যুক্তিপূর্ণ যে কোনো প্রস্তাব সরকার উপেক্ষা করবে না। অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল হিসেবে তাদেরকে অবশ্যই সংসদে ফিরে আসতে হবে। এ বক্তব্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জনগণ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ ভাষণে জনগণের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। কারণ এবারের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের সুবিবেচিত এবং যুক্তিপূর্ণ কোনো প্রস্তাব উপেক্ষা করা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর, দেশের স্বার্থ রক্ষা, ভবিষ্যত উন্নয়ন, উৎপাদন এবং বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সকল দল ও মতের সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছেন। দেশটি যেহেতু সবার, সরকারের একার নয়, সেহেতু এ বৃহত্তর দায়িত্ব তাদেরকে পালন করতেই হবে। নতুবা সংসদ অকার্যকর করে কিংবা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এদেশের মানুষ তেমন নেতৃত্বই চায় যারা দেশের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রীর ১০ অক্টোবরের ভাষণের পাশাপাশি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাও। তিনি তার বক্তব্যে জোট সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, চার বছরে জোট সরকার জনগণের কোনো সমস্যারই সমাধান করেনি বরং সরকার নিজেই এখন দেশের জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এ সরকারের সন্ত্রাস-দুর্নীতি ও কুশাসনের অবসান চেয়েছেন। ১৪ দলের ঘোষণা অনুযায়ী অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগ চেয়েছেন তিনি। নতুবা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবে

www.pathagar.com

বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন শেখ হাসিনা। এখানে দেশবাসীর প্রশ্ন হলো, এ কথাগুলো বা দাবিগুলো সংসদে গিয়ে উত্থাপন করতে বিরোধীদলের নেত্রীর অসুবিধা কোথায়? শেখ হাসিনা জোট সরকারের চার বছরে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুল্যস্ফীতি এবং দুর্নীতি রোধসহ অনেক ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরেছেন। তবে এ অভিযোগগুলোর ব্যাপারে বিশদ বক্তব্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব, দুর্নীতি দমনে দুর্নীতি দমন কমিশন ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধকল্পে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে বিরাজিত পূর্বাপর সকল পরিস্থিতিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জনগণ এসব নিয়ে এখন দেশব্যাপী সর্বত্রই আলাপ-আলোচনায় মশগুল রয়েছেন। তারা সকল বিষয়েই সরকার ও বিরোধীদলের বক্তব্য ও ভূমিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন। পাশাপাশি অপেক্ষা করছেন পরবর্তী এক বছরের জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা দেখার জন্য। দ্রব্যমূল্য ও দুর্নীতি বর্তমান সরকারের শাসনকালের নেতিবাচক দিক বলে উল্লেখ করেছেন অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদসহ দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে ইতিবাচক দিক হিসেবে তারা দেখিয়েছেন বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দিকটি। তারা বলেছেন, বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি ছিল আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সুখবর। সরকার যদি সম্পূর্ণ ব্যর্থই হতো তাহলে এতটা বিনিয়োগ আসছে কীভাবে? এ প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। তবে সবচেয়ে বড় দিক হলো, সকল প্রতিকূল অবস্থায়ও বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশকে এখনও একটি বিপুল সম্ভাবনার দেশ বলে বিবেচনা করেন। কারণ গত চার বছর আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা পাঁচ ভাগেরও বেশি, যা অনেক শিল্পোন্নত দেশের পক্ষেও এ সময় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে তারা বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ খুব একটা আশংকাজনক বলে অভিহিত করেননি।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় বর্তমান জোট সরকারের আর বাকি আছে মাত্র এক বছর সময়। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট একবার দিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার সংক্রান্ত ৩১-দফা প্রস্তাব। সে অবস্থান থেকে তারা মনে হয় এখন ক্রমশই সরে আসছেন। কারণ গণফোরামের সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন গত ১২ অক্টোবর বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব। জন দুর্ভোগ লাঘবে ঐকমত্যের সরকারের কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা না করলে, জনগণের চাহিদা পূরণ না করলে, দেশের ১৪ কোটি মানুষ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে। ড. কামাল ইতোপূর্বে বলেছিলেন, অক্টোবরের মধ্যে বর্তমান সরকার তছনছ হয়ে যাবে। এখন নতুন করে আবার চাচ্ছেন সংবিধান অনুযায়ী সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় সরকার গঠন। তবে তার প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের কোনো রূপরেখা তিনি দেননি। এমন কি এ কথাও স্পষ্ট করে বলেননি যে, তার প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার গঠন করতে হলে

www.pathagar.com

কোনো সাংবিধানিক সংশোধনীর প্রয়োজন আছে কী-না? যদি ন্যূনতম কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হয়, তাহলে বিরোধীদল সংসদে ফিরে আসবে কী-না? এ ব্যাপারে তিনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন তার কিছুই তিনি এখনও স্পষ্ট করে বলছেন না। তবে আশা করা যায়, ঈদের পর এ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু আলাপ-আলোচনা বা সংলাপ হতে পারে।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন সমস্যা, সংকট কিংবা জটিল পরিস্থিতি- কোনো কিছুই জাতীয় স্বার্থ, আমাদের সার্বিক উন্নয়ন এবং আর্থ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ঊর্ধ্বে নয়। বাংলাদেশী নেতৃস্থানীয় জ্যোতিষীদের মতে আগামী এক বছর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে শনির প্রভাব প্রাধান্য পেলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহস্পতির যোগ রয়েছে। বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা যতটা সমাধান হবে, ততটাই বেড়ে যাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে আমাদের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক মহলের ওপর। কারণ দেশবাসীর ভবিষ্যত সাফল্যের সমস্ত চাবিকাঠি এখন তাদের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। এ অবস্থায় তাদের সুমতি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তদ্বির শুরু হয়েছে। আগামী একটি বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বৃহত্তর সমঝোতার ওপর এ জাতির ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টি ঝুলে আছে। আশা করি, তারা এদেশের ১৪ কোটি মানুষকে হতাশ করবেন না। তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে তা কেউ বলতে পারে না। সে কারণে বাংলাদেশের মানুষ ক্রমশই এখন যেন অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছে। তারা এখন শনি ও বৃহস্পতির মাঝে যেন প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে।

www.pathagar.com

গণ প্রতিরোধ বনাম বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট

নয়া দিগন্ত, ৮ অক্টোবর

ধর্মের নামে, বিশেষ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আতঙ্ক সৃষ্টি, জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত কিংবা নিজের দেশ ধ্বংশ করা কোনো ঈমানদার মুসলমানের কাজ হতে পারেনা। সাম্প্রতিক বোমাবাজি কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিছু স্বল্পশিক্ষিত, বিভ্রান্ত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের আবেগ তাড়িত কাজ, যা সম্পূর্ণভাবে দেশ এবং ইসলামের স্বার্থ বিরোধী। পবিত্র ইসলামের সাথে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিধানের সম্পর্ক রয়েছে। শক্তি প্রয়োগ করে জ্ঞানার্জন কিংবা কোনো বিধান কার্যকরী করা সম্ভব নয়। তারজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা ও উপলব্ধি এবং সে অনুযায়ী আমল ও জীবনাচরণ। এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষই মুসলমান। তবে তারা সবাই ধর্মপ্রাণ কী না জানিনা। আর সত্যিকার অর্থে যারা ধর্মপ্রাণ তারা অবশ্যই ধর্মান্ধ কিংবা উগ্র মৌলবাদী নয়। তারা ঈমানদার, শান্তিপ্রিয় এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পালনকারী নাগরিক। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে তারাই এ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ।

রাষ্ট্রীয় জীবনে কিংবা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অনেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদানে প্রায়শই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। সেটা উদ্দেশ্যমূলক কী না জানিনা। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোন মতেই ধর্মহীনতা নয়। পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের একটি বিশেষ অংশ। তারপরও ধর্ম নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত কোনো কোনো রাষ্ট্রে অন্যান্যদের ওপর খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস কিংবা অন্য কিছু চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত। ব্রিটেন সহ বহু পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশে খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে অতীতে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আবার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো কোনো দেশেও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইসরাইল পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র এবং নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছে। তাছাড়া ধর্ম নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত রাষ্ট্র ভারতে চলছে 'হিন্দুত্বের' জিগির।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে চলছে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান বিধায় দেশের সংবিধানে অষ্টম সংশোধনী এনে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" বলে ঘোষণা করেছেন। সে অবস্থায় দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের

www.pathagar.com

মধ্যে বিতর্ক ওঠে যে, দেশে নেই ইসলামী অনুশাসন এবং ঘুষ, দুর্নীতি, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি ও সকল গর্হিত কাজ চলছে অবাধে অথচ রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামকে। এ বৈপরীত্যে দেশের মানুষ হতবাক হয়েছে। আপসহীন আন্দোলন হওয়া উচিত সেগুলোর বিরুদ্ধে। এ বিষয়টি এখানে টেনে এনে আমি আর জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইনা। তবে দু'চারটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা প্রয়োজন কারণ আমি এ লেখার সূচনাতেই বলেছি যে, এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান নামধারী হলেও সবাই কী ধর্মপ্রাণ বা ইসলাম চর্চাকারী মুসলমান ? যারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান নয় কিংবা যাদের মাঝে ইসলামের তেমন কোনো জ্ঞান নেই, তাদেরকে কে দেবে ইসলামের শিক্ষা, কে সৃষ্টি করবে গভীর উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি, আর কেইবা ছড়াবে বিশ্বাস এবং জ্ঞানের আলো ?

অন্য বিতর্কে না গিয়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমার বক্তব্য হলো, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে পারিবারিক এবং এমনকি ব্যক্তিজীবন পরিচালনার জন্যও রয়েছে মহান স্রষ্টার সুস্পষ্ট বিধান, যা মানবসৃষ্ট বিধানের সাথে কোনোমতেই তুলনীয় হতে পারেনা। এটি যারা বিশ্বাস করে না, সেটি তাদের ব্যাপার। পবিত্র কোরআনের তিন চতুর্থাংশ মানি আর এক চতুর্থাংশ মানতে পারলাম না, এ কথা বলে প্রকৃত অর্থে কেউ পার পাবে না। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান পরিপূর্ণভাবেই মানতে হবে, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের আলো ছড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের অবস্থান আসলে কোথায়? ইসলামের নামে নেতৃত্বের চরম কোন্দল, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, চক্রান্ত এবং প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপের কারণে সাধারণ মুসলমানরা বরং ক্রমশ এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে। ভারতে আশ্রয় নিয়ে কিংবা ভারতীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ 'ইসলামী বিপ্লব' সংগঠিত করা একটি ইসলাম বিরোধী বহুমুখী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস।

বিশ্বে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ কিংবা গণতন্ত্র এবং ইসলাম হচ্ছে তিনটি বহুল প্রচারিত মতবাদ। এর প্রথম দুটি মানবসৃষ্ট এবং শেষটি খোদ স্রষ্টার। ইতোমধ্যে আমরা সমাজতন্ত্রের পরিণতি দেখেছি। তাছাড়া পশ্চিমা গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এখন তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই অস্থিরতায় ভুগছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, শক্তিমান আরও শক্তিশালী হচ্ছে। পরিপুষ্ট হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী চক্র। অপশাসন, বাজার দখল, শোষন-বঞ্চনা, তাবেদারীসহ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং এমনকি অপসংস্কৃতিগত অনাচার দিনে দিনে বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের মতো আরও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এ অবস্থায় আগামীতে ইসলামী ব্যবস্থাকে সংশ্লিষ্ট মহল একটি মহা চ্যালেঞ্জের বিষয় হিসেবে দেখছে। তারা বুঝতে পারছে ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির

www.pathagar.com

কথা। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে এবং পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ছে। আফগানিস্তানের কথা বাদ দিলে ফিলিস্তিন কিংবা ইরাকের লড়াই মূলত সাম্রাজ্যবাদী দখলদার ও আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ইসলাম প্রতিষ্ঠার মৌলিক লড়াই নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীরা আজ বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রকে আঘাত করে দুর্বল, নতজানু এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল করে তুলছে। কাউকেই নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে দিচ্ছেনা। স্ব-নির্ভর হতে দিচ্ছেনা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও স্পেনসহ পশ্চিমা জগতে নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে প্রকাশ্যেই এখন ইসলামী উগ্রপন্থীদের দায়ী করে বুশ-ব্লেয়াররা বলছে, কোনো অবস্থাতেই তারা পশ্চিমা মতবাদ ও মূল্যবোধকে ধ্বংস হতে দেবে না। বিভিন্ন অভিযোগে তারা এখন ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপকে অবৈধ ঘোষণা করছে। তাছাড়া যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন করে অভিযুক্তদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এতে প্রকৃত ইসলামের কতটুকু ফায়দা হয়েছে ?

ইসলামী শিক্ষা, বিধান ও অনুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন অপরকে দাওয়াত (আমন্ত্রণ/নিমন্ত্রণ) করতে। শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দমূলক পরিবেশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) তার বিদায় হজ্বের বাণীতেও সে নির্দেশ দিয়ে গেছেন অনুসারীদের কাছে। ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানময় কোরআন এবং তার সুন্নতের (জীবনাচরণ) কথা। নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রান্তে তার বাণী পৌঁছে দিতে। মহান আল্লাহপাক কিংবা তার প্রিয় বাণীবাহক মোহাম্মদ (দঃ) কোথাও বন্দুক, কামান, বোমাবাজি কিংবা কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি। ইসলামের প্রথম অবস্থায় কয়েক বছর দাওয়াতের কাজ করার পর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন আল্লাহ পাকের কাছে অনুযোগ করলেন যে, মানুষের মাঝে তার দ্বীনের কাজ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হচ্ছেনা এবং তারা ইসলাম তেমনভাবে গ্রহণ করছেনা তখন জবাবে আল্লাহ পাক বলেছিলেন (হুবহু আক্ষরিক তর্জমা নয়), আপনার কাজ ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, আমার কাজ তাদেরকে হেদায়েত দেওয়া। কে ইসলাম গ্রহণ করলো আর কে করলো না সেটা আপনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করে যান। পবিত্র কোরআন আল্লাহর প্রেরিত জ্ঞান ভান্ডার এবং ইসলাম তার পরিপূর্ণ দ্বীন। এদের রক্ষণাবেক্ষণে পৃথিবীতে মানুষের ফ্যাসাদ সৃষ্টি কিংবা জঙ্গি তৎপরতা চালানোর কোনো আবশ্যকতা নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহই তার পাক কালাম কোরআন এবং ইসলামকে সর্বাবস্থায় হেফাজত করবেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারীরা যা আদিষ্ট হয়েছেন শুধু তা-ই করে যাবেন।

উপরে উল্লিখিত এতবড় এ বিষয়টি থেকে কী উগ্রপন্থীদের কিছুই শেখার নেই? তারা ইসলামের পথে মানুষকে কতটুকু আহ্বান করেছেন? কতটুকুই বা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ইসলামের শিক্ষা বা জ্ঞানের আলো ? ইসলাম শুধু মুসলমানের ধর্ম নয়। এটি বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র সরল পথ। এটি সর্বজনীন। সুতরাং

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে এসব দায়-দায়িত্বের কথা পাশ কাটিয়ে যারা নেতৃত্বের সংঘাত, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে দেশে কিংবা বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায় তারা শুধু পশ্চিমাদেরকেই নয়, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকেও ক্রমশ ক্ষেপিয়ে তুলছেন। কারণ তাদের অপকর্মের কারণেই আজ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু দেশে মুসলমান খেটে খাওয়া মানুষ এখন অবাধে ও নির্ভয়ে দিনের আলোতেও চলাফেরা করতে ভয় পায়। অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে তাদের ওপর। এতে কী ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায় উপকৃত হচ্ছে ?

ইসলাম একটি শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সর্বস্তরে ন্যায়, সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ধর্ম। এটি আসতে হবে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, উপলব্ধি, গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। বন্দুক, কামান, বোমা বিস্ফোরণ কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে গেলে ইউরোপব্যাপী গত দুই শতাব্দি আগে খ্রিষ্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মাঝে যে সংঘর্ষ হয়েছে আজকের মুসলমানরাও দেশে দেশে সে ধরণের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এসব করে "ইসলামী বিপ্লব" সংঘটিত করা যাবেনা। এটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করে কিংবা দেশ ধ্বংস করে হবে না। এ ব্যাপারে সুরা মা-য়িদাহ্‌র ৩২ পারাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "এই কারণেই আমি বানি ইসরাঈলদের প্রতি বিধান দিলাম, যে ব্যক্তি জীবননাশের বা দেশ ধ্বংসকারীতার অপরাধ ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করে, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করিল এবং কেহ কাউকে বাঁচাইলে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করিল; অধিকন্তু তাহাদের নিকট আমার রসুলগণতো উজ্জ্বল প্রমাণসহ আগমন করিয়াছিল; অনন্তর নবীগণের পরেও ওদের অনেকে দেশে সীমা অতিক্রম করিয়া ফিরিতেছে।" এই বিধানে এখনতো জীবননাশ এবং দেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধেই বরং চরম ব্যবস্থা নেওয়ার সঠিক সময় এসেছে।

দেশের প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, ধর্মের নামে সন্ত্রাস কঠোর হাতে দমন করা হবে। সাম্প্রতিক বোমা হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে তিনি জনগণের সাহয়তা চেয়েছেন। তাছাড়া ইসলামি শাসন ও আইন প্রতিষ্ঠায় বোমা হামলা চালানোর মতো ভ্রান্ত ধারণা থেকে অবোধ ও বেকার যুবকদের সঠিক পথে আনতে সমজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের সহযোগিতা চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাছাড়া জঙ্গীবাদী বোমাবাজদের বিরুদ্ধে প্রনীত কর্মসূচি সফল করতে পুলিশ-র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শুধু জোট সরকার এবং জঙ্গীবাদী বোমাবাজদের সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখছে। বোমা হামলা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ ও জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। বিরোধীদলের নেত্রী বলেছেন, সরকারের আশ্রয়ে থাকা জঙ্গী বাহিনী দিয়ে দেশে বোমা হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার আগামী নির্বাচনটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। আবার পরক্ষণেই বলছেন, সন্ত্রাসীদের চিরতরে বিদায় করতে হবে, কিন্তু কীভাবে তা বলছেন না। এসব রাজনৈতিক কাদা

www.pathagar.com

ছোড়াছুড়ি বাদ দিয়ে এখন সময় এসেছে দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসী, বোমাবাজ ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার। নতুবা তারা কাউকেই ছাড়বেনা। সাথে সাথে সত্যিকার অর্থেই এদেশকে একটি অস্থির ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে ছেড়ে দেবে। তাই সকল দায়িত্বশীল ও অধিকার সচেতন রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের এখন জরুরী কর্তব্য হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন কিংবা বিভ্রান্ত একটি অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সবাইকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নয়, ইসলামের নামে সংগঠিত একটি সন্ত্রাসবাদী অপশক্তিকে রোধ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুবা শুধু বিচারকরাই নয়, সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এবং জনজীবনের প্রতিটি প্রভাবশালী ব্যক্তিকেই একদিন হয়তো বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে চলতে হতে পারে।

www.pathagar.com

টুইসডে গ্রুপ কী দেশের বাইরে বসবে ?

নয়া দিগন্ত, ১০ অক্টোবর, ২০০৫

সকল অবস্থায় বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা এবং নিজেদের নিপরপেক্ষতা বজায় রাখা কূটনীতিকদের একটি নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব। সে হিসেবে বিশ্বের যে কোনো দেশেই তারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুন না কেন, কারও (কোনো রাষ্ট্রের) অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে বিশেষ একটা দেখা যায় না। বৃহত্তরভাবে এটাকেই হয়তো বলে কূটনৈতিক শিষ্ঠাচার। এর কিছুটা ব্যত্যয় দেখা গিয়েছিল পঞ্চাশ দশকে শীতল যুদ্ধ বা 'কোল্ড ওয়ারের' সময়। তাছাড়া মস্কোর নিয়ন্ত্রণাধীন তৎকালীন সোভিয়েত পদ্ধতি চালু থাকার সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, গুপ্তচরবৃত্তি চালানো কিংবা প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নাজুক করে তোলার প্রয়াসে লিপ্ত হতো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সে ধরণের তৎপরতা ওই সময়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত পদ্ধতির অবসানের পর শীতল যুদ্ধের যুগ শেষ হয়েছে বলে বিশ্বব্যাপী একটা জিগির ওঠেছিল। তখন থেকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং বিশেষ করে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করার একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি অপর রাষ্ট্রের কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। তখন থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছদ্মাবরণে অর্থনৈতিক পেশীশক্তি ব্যবহার করা শুরু করে ওয়াশিংটন ভিত্তিক বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার থেকে শুরু করে গণতন্ত্রায়ণ, স্থানীয় সরকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানা রকম ব্যবস্থাপত্র দিতে শুরু করে। বিভিন্ন সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়েও নানান প্রশ্ন তুলে। তারা সবকিছু পুনর্বিন্যাস করতে চায় তাদের ভাবধারায়। তাই অতি অল্প সময়ের মাঝে তাদের সে প্রক্রিয়া বা কৌশলও আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে শুরু করে। তবে এ অবস্থা মোকাবেলায় অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অসংগঠিত উন্নয়নকামী দেশগুলোর সামনে তেমন কোনো বিকল্প ছিলনা। আজও তেমন নেই বললে ভুল হবেনা।

শুধু বিশ্বব্যাংক কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলই নয়, একই কারণে আমাদের ইউরোপীয় উন্নয়ন সহযোগীরাও আজকাল আমাদেরকে অনেক জ্ঞান খয়রাত করা শুরু করেছে। আমাদের প্রয়োজনে সাহায্য দিলেতো তাদের প্রয়োজনে উপদেশ দেবেই,

www.pathagar.com

এটাইতো স্বাভাবিক। আমাদের রাজনৈতিক অনৈক্য, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার সূত্র ধরে ঢাকাস্থ পশ্চিমা কূটনীতিকরা গত প্রায় দেড় দশক ধরে এ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করা কিংবা এক নীরব-দূতিয়ালি শুরু করেছিল, যা সময়ের ব্যবধানে এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশে আল-কায়েদার কল্পিত অবস্থান কিংবা সম্ভাব্য মৌলবাদের ঘাটি আবিষ্কারের কাজে তাদের অনেকেই তৎপর হয়ে উঠেছে। এর জন্য আমাদের দেশীয় রাজনীতিকরা কোনোভাবেই দায়ী নয় এ কথা অবশ্যই বলা যাবে না। অতীতে নির্বাচনের আগে কিংবা পরে কোনো আন্ত-দলীয় কোন্দল বা জটিলতা দেখা দিলে বিদেশী কূটনীতিকদের মাধ্যমে ঘুটি চালাচালি করা কিংবা তাদেরকে মুরুব্বী ধরার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে নতুন নয়। সে কারণেই আমাদের সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হয়ে ওঠেছে বলে অনেকের বিশ্বাস। দেশে একটি নির্বাচিত সরকার এবং শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা সত্ত্বেও আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে কী কিনা তা গণমাধ্যমের অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিংবা বিদেশী কূটনীতিকদের অনেকের কাছে। এ দীনতা আমরা ঢাকবো কীভাবে?

বাংলাদেশের ভবিষ্যত সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা ১৪টি দেশ ও দাতা সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় গঠিত হয়েছিল "টুইসডে গ্রুপ"। তাদের উদ্দেশ আগামী নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার লক্ষ্যে ঢাকায় একটি সম্মেলন আয়োজন করা। সাধারণ নির্বাচন এদেশের নেহাত একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে জাতিসংঘের বিগত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রাক্কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান কূটনীতিকদের সে ধরনের ঢাকা সম্মেলনের প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, গত দেড় দশকে অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পতনের পর এদেশে তিনটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সেগুলো কোনো বহিঃশক্তি পরিচালনা করেনি। করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। অন্তর্বর্তীকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। সেখানে কোনো বিদেশী কূটনীতিকদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি। তাছাড়া কূটনীতিকরা কথা বলবেন তাদের এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের প্রশ্ন নিয়ে। পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে। তারা কেন বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকায় লিপ্ত হবেন? সে কারণেই টুইসডে গ্রুপের তৎপরতাকে সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করেছে। হয়তো বা তাই টুইসডে গ্রুপের দুই রাষ্ট্রদূত, কানাডার হাইকমিশনার ডেভিড স্প্রাউল এবং নরওয়ের রাষ্ট্রদূত আইড লাইসি নরডহ্যাম সম্প্রতি পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা রিয়াজ রহমানের সাথে প্রস্তাবিত সম্মেলনটি আয়োজনের ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা চাইলে তিনিও একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এ সম্মেলনটির প্রয়োজন নেই বিধায় তার সরকারের অনাগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

টুইসডে গ্রুপের প্রস্তাবিত সম্মেলনের পক্ষে যুক্তি ওঠেছে তারপরও। এ ব্যাপারে বিস্তর লেখা-জোখা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলোতে। কেউ কেউ যুক্তি দেখাচ্ছেন, আগামী নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও কারচুপিমুক্ত করতে এ প্রস্তাবিত সম্মেলন থেকে ইতিবাচক এবং গঠনশীল কিছু যদি বেরিয়ে আসে তাতে আপত্তি কোথায়? কিসের এতো ভয় আমাদের ? ঢাকাস্থ কূটনীতিকরাতো আর নির্বাচনের ফলাফল বদলাতে পারবে না, একটি পরিচ্ছন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সাহায্য করতে চান। তাদের সহযোগিতা হয়তো নির্বাচনকে আরও ত্রুটিমুক্ত করতে অবদান রাখতে পারে। এতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো অনেক ব্যাপারেই পরস্পরকে দোষারোপ করতে পারবে না। তাছাড়া কোনো অঘটন ঘটলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী কূটনীতিকরাই সঠিক তথ্যভিত্তিক জবাবগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে পারবেন। কিন্তু এখানে একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হলো, এ প্রস্তাবিত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের ৩১-দফা সংস্কার প্রস্তাব অবশই ওঠে আসতে পারে। তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে সুপারিশ আসতে পারে তাদের দাবীগুলো বিবেচনার জন্য। বিরোধী জোটের ৩১-দফা দাবীর কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা গ্রহণযোগ্য নয়, সেটা যাচাই-বাছাই বা বিবেচনা করবে ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট। সেখানে যদি সংবিধান সংশোধন করার মতো কোনো বিষয় থেকে থাকে তাহলে সরকার তা কীভাবে নেবে? সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ নিতে সরকার আগ্রহী নয়। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন অজুহাতে বার বার সংসদ বর্জন করে চলেছে। তারা বলেছে, সংসদে নয়, রাজপথে আন্দোলন করেই সমস্ত দাবী আদায় করে নেবে। বর্তমান জোট সরকার আন্দোলনের মুখে বাধ্য হবে তাদের দাবী মেনে নিতে। এই যদি তাদের মনোভাব হয় তাহলে টুইসডে গ্রুপের প্রস্তাবিত সম্মেলন কী ফল বয়ে আনবে ? তাছাড়া এ ব্যাপারে বিদেশী কূটনীতিকদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হলে তা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হবে। এটি কী একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে আমাদের অনুকূলে যাবে? এটিই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজারে গুজব ওঠেছে যে, সরকারের অনুমতি না পেলে 'টুইসডে গ্রুপের' প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশের বাইরেও তো অনুষ্ঠিত হতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত ন'টি দেশ, ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘের স্থানীয় প্রতিনিধিরা যখন টুইসডে গ্রুপে রয়েছেন তখন এ সম্মেলন তো তাদের যে কোনো দেশেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। এতে বাধা কোথায় ? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শেকসপিয়ারের নাটকের মতো প্রিন্সকে বাদ দিয়ে তো আর 'হ্যামলেট' প্লে মঞ্চস্থ করা যাবেনা। যে দেশের নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, কারচুপিমুক্ত এবং নিরপেক্ষ করতে এতো আয়োজন, সে দেশের রাজনৈতিক খেলোয়াড়রাই যদি সম্মেলনের মাঠে হাজির না থাকেন, তা হলে এর ফলাফল কী

www.pathagar.com

দাঁড়াবে? কীভাবে ঘটবে মত বিনিময়। তারপর কোনো না কোনো মহল থেকে যদি বলা হয়, 'বিচার মানি তবে তাল গাছটা আমার।' তাহলে টুইসডে গ্রুপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কী দশা হবে ? আওয়ামী লীগ নেত্রী বার বার বলছেন বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে তিনি কোনো নির্বাচনে যাবেন না। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটি একটি সাংবিধানিক পদ। ক্ষমতাসীন সরকারই তাকে নিয়োগ দিতে পারে, যেমন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু সাঈদকে নিযুক্ত করেছিলো আওয়ামী লীগ সরকার। তার অধীনে কী নির্বাচন করে বিএনপি জয়লাভ করেনি? এ সমস্ত ব্যাপারে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মাঝে কতগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবেনা।

ফিরে আসি আবার টুইসডে গ্রুপের প্রস্তাবিত সম্মেলনের বিষয়ে। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বরাত দিয়ে দু'একটি পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে যে, ম্যাডাম কূটনীতিকদের চটাতে চাননা অর্থাৎ তাদের বিরাগভাজন হতে পছন্দ করেন না। অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে দলীয় নীতি নির্ধারকরা বিদেশী কূটনীতিকদের জড়াতে চাননা। সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নাকি বলা হয়েছে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকদের বুঝিয়ে বলার জন্য। কানাডার হাই কমিশনার ডেভিড স্পার্ল সেদিন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য। সেখানে নাকি কূটনীতিকদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের ব্যাপারে স্পার্লকে কিছু কথা বলা হয়েছে। হাই কমিশনার স্পার্ল একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ও দক্ষ কূটনীতিক। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত পণ্য নিয়ে কানাডার বাজারে প্রবেশ করেছে। তিনি বাংলাদেশের একজন শুভাকাঙ্খী ও প্রকৃত বন্ধু। তিনি মনে প্রাণে চান বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করুক এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করুক। সমৃদ্ধি আসুক এই ছোট্ট দেশটির ১৪ কোটি মানুষের জীবনে। এটা বোধ হয় আমরা নিজেরাই চাইনা। সে কারণেই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা, বিশেষ করে উন্নয়ন, উৎপাদন ও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিদেশী বন্ধুরা এগিয়ে এসেছিলেন। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ কী না, তা হয়তো বিশেষভাবে বিবেচনায় না এনেই এ পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন তারা।

এ অবস্থায় বিভিন্ন সূত্রে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, আমাদের সাধারণ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাইরে জাপান অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনো একটি দেশে প্রস্তাবিত সম্মেলনটি আয়োজন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান এখন দেশের বাইরে রয়েছেন। তিনি ফিরে এলে হয়তো এ বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হতে পারে। প্রস্তাবিত সম্মেলনের উদ্দেশ, কর্মপন্থা ও কৌশলপত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে পারে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, জাতীয় স্বার্থ, সংবিধানের মৌলিকত্ব, গণতন্ত্রের ভবিষ্যত, সরকারের ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে কারও কোনো সময়োচিত পদক্ষেপ কিংবা অবদান যদি প্রকৃত অর্থে আমাদের ন্যূনতম কোনো কাজে আসে, তা হলে তাকে হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে তেমন কোনো লাভ হবেনা। একবিংশ শতাব্দির এ সূচনালগ্নে বিশ্বের প্রতিটি জাতি যখন প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করছে তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অর্জন এবং বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে, তখন আমরা কেন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল, বিভেদ ও কারও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জাতিগতভাবে পিছিয়ে থাকবো অনির্দিষ্টকাল। সে কারণেই প্রশ্ন ওঠেছে যে, বিগত সংসদ নির্বাচনের আগেও নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করতে বিদেশী কূটনীতিকরা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তখন তৎকালীন আওয়ামী লীগ তাদের ক্রিয়াশীল ভূমিকায় তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি ক্রমশ ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। সে কারণেই আগামী নির্বাচনের প্রশ্নে দেশবাসীর মাঝে নানা সংশয় দেখা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে না হোক বাইরে থেকেও যদি আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা উদ্ভূত পরিস্থিতি কিংবা সঙ্কট নিরসনে ন্যূনতম কোনো সাহায্য করতে পারেন তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ভবিষ্যতে জাতির কাছে আমাদেরকে জবাব দিতে হতে পারে। এ এক উভয় সঙ্কট পরিস্থিতি। সুতরাং জাতির কল্যাণে গৃহীত কোনো পদক্ষেপের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করে দেখতে অসুবিধা কোথায় ?

www.pathagar.com

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির মুন্সিয়ানা

নয়া দিগন্ত, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

এক বৈঠকে কোনো সমস্যার নিষ্পত্তি করতে না পারলেও যারা সমাধানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারেন, আশার আলো দেখাতে পারেন, তারাই বোধ হয় সার্থক রাজনীতিক। ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি তেমনই একজন রাজনীতিক। দু'দেশের অভিন্ন নদীর ভবিষ্যত ও সীমান্ত নদী ভাঙ্গনসহ পানি বন্টনজনিত সমস্যা নিয়ে সদ্য সমাপ্ত যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) ৩৬তম বৈঠকে কোনো চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। তবে এবারের বৈঠকে বন্যার সতর্কীকরণ সময় বাড়ানোসহ পাঁচটি বিষয় নিয়ে একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা মোটেও গুরুত্বহীন নয়। আন্তঃনদী সংযোগের ক্ষেত্রে হিমালয় অববাহিকার বিশেষ করে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংগে অন্যান্য নদীর সংযোগের সম্ভাবনাটি বাদ দিলে টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তার পানি ভাগাভাগি ও সীমান্ত নদী ভাঙ্গনরোধে কোনো তাৎক্ষণিক জবাব কিংবা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবুও এ আলোচনাকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, এ বৈঠক থেকে উভয় দেশের হয়েছে অনেক অর্জন। যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠক স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করে দাসমুন্সি আরও বলেছেন, আমাদের সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ বৈঠক মাইলফলক হয়ে থাকবে। তার পাশাপাশি বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ অবশ্য অতটা সন্তুষ্টি প্রকাশ না করে বলেছেন, আগামী জেআরসি বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়!

জেআরসি'র এ সদ্য সমাপ্ত বৈঠক নিয়ে বাংলাদেশের গণ মাধ্যমে যথেষ্ট আশা-নিরাশার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রথমত অভিযোগ ওঠেছে যে, আলোচনায় বাংলাদেশকে ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে কার্যত তেমন কোনো কথাই বলতে দেয়নি। এ দুটি প্রসঙ্গই নাকি বাংলাদেশকে বিবিধ বিষয়ের অধীনে উত্থাপন করতে হয়েছে। আলোচনার মূল সূচিতে (এজেন্ডায়) ভারত এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে দেয়নি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভিত্তিক আন্তঃনদী সংযোগ, টিপাইমুখ ও অন্যান্য বিষয়ে বাঙালীমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি সকল কথাই অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে বলেছেন বৈঠকশেষে। ইতিমধ্যে দৈনিক ইনকিলাব লিখেছে, 'জেআরসি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফলশূন্য। আন্তঃনদী সংযোগ, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তার পানি ভাগাভাগি ও সীমান্ত নদী ভাঙ্গন রোধে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।' দৈনিক আমার দেশ বলেছে, 'ব্যর্থ নয়, আবার সফলও নয়-এমন এক ফলাফলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের দু'দিন ব্যাপী বৈঠক শেষ হয়েছে। জেআরসি বৈঠকে তিস্তা নিয়ে মতৈক্য হয়নি তবে দিল্লি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি পর্যালোচনায় রাজি হয়েছে।' দৈনিক নয়া

www.pathagar.com

দিগন্ত লিখেছে, 'তিস্তাসহ সাতটি নদীর পানি বন্টনকে অনিশ্চয়তার মুখে রেখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক শেষ হয়েছে। তিস্তার পানি বন্টনের বিষয়টি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে দু'দেশের সচিব পর্যায়ের প্রস্তাবের ওপর।' দৈনিক আমাদের সময় অভিযোগ করেছে, 'বহু প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার ফুলঝুরি ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলভাবেই শেষ হলো বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি)-এর মন্ত্রী পর্যায়ের ঢাকা বৈঠক।'

দীর্ঘ আট বছর পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ভারতের সাথে যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) ৩৬তম বৈঠক শুরু হয়। গঙ্গা চুক্তির কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে নয় বছর পর। টিপাইমুখে ড্যাম নির্মাণের ব্যাপারে ভারত অনড় ছিল। ভারতের মনিপুর রাজ্যের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বরাক ও অন্য একটি নদীর সংযোগস্থলে নির্মাণতব্য এ বাঁধ বাংলাদেশের সিলেট জেলার অন্যতম প্রধান নদী কুশিয়ারা ও সুরমার প্রবাহকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুরমা ও কুশিয়ারা এ দেশের পানি প্রবাহের অন্যতম প্রধান সূত্র মেঘনাকে প্রমত্তারূপ দিয়েছে। এদেশের কৃষি, শিল্প, মৎস্য, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। সে কারণে টিপাইমুখে ড্যাম নির্মাণ বন্ধ করতে বাংলাদেশ তৎপর হয়ে ওঠেছিল। কিন্তু মুন্সি বলেছেন, টিপাইমুখে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে কোনো ব্যারেজ নির্মাণ করে পানি সরিয়ে নেয়া হবেনা। সে যুক্তিতেই ভারতীয় মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা অনড় ছিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু অভিন্ন নদী নয়, যে কোনো নদীর ওপর ড্যাম কিংবা ব্যারেজ নির্মাণ করলে সময়ের ব্যবধানে বাধাগ্রস্ত নদীর প্রবাহ তার চলার পথ পরিবর্তন করে। ফারাক্কা বাঁধের কারণেই হয়েতো তাই গঙ্গা তার ধারা পরিবর্তন করে সরে গিয়ে মিলিত হয়েছে পাগলা নদীর সাথে। এর ফলে ফারাক্কা একদিন সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। অপর দিকে ড্যাম নির্মাণ করলে নদীর প্রবাহ যে বাধাগ্রস্ত হবেনা তা নয়। তাছাড়া ড্যামের কারণে বর্ষাকালে পলিবিধৌত এ অঞ্চলে নদী ভাঙ্গনের পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং একটি অভিন্ন নদীতে বাধার সৃষ্টি করে প্রতিবেশি দেশের সর্বনাশ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। সেচের জন্য নদী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার ওপর ড্যাম কিংবা ব্যারেজ নির্মাণ করে অভিন্ন নদীর প্রবাহে বিঘ্ন ঘটানোর একতরফা অধিকার কারও থাকা উচিৎ নয়। এ ব্যাপারে এখনও সুস্পষ্ট কোনো আন্তর্জাতিক আইন না থাকলেও তা প্রণয়ন করার সময় এসেছে এখন।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক নয়, দু'দেশের পানি সংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান জেআরসি'র মাধ্যমেই করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন প্রিয়রঞ্জন বাবু। নেপালে জলাধার নির্মাণে বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাবের জবাবে তিনি একথা জানিয়েছেন। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাতটি সদস্য দেশ মূলত তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি গঠন করলেও নিজেদের অন্যান্য সমস্যা সমাধান কিংবা স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে এটিকে ব্যবহার করা যাবেনা, এমন নয়। ভারত যদি বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানী করার জন্য ত্রিদেশীয় বা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করতে পারে তা হলে বাংলাদেশ কিংবা অন্যান্যরা কেন

www.pathagar.com

পরিবেশ সংরক্ষণ, অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ ও শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বহুপাক্ষিক সহযোগিতা কিংবা ব্যবস্থায় যেতে পারবে না? ভারতীয় এ কূটনৈতিক শর্ত কী প্রতিবেশিদেরকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দূরে সরিয়ে রাখার অপপ্রয়াস বলে প্রতিভাত হয় না?

বাংলাদেশী প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে অভিযোগ ওঠেছে যে, তিস্তাসহ সাতটি নদীর পানি বন্টনকে অনিশ্চয়তার মুখে রেখে প্রিয়রঞ্জন বাবু বাংলাদেশ-ভারত যৌথনদী কমিশনের বৈঠক শেষ করেছেন। তিস্তার পানি বণ্টনের ব্যাপারে তিনি সচিব পর্যায়ে একটি সুপারিশপত্র তৈরী করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ এ নদীগুলোর সারা বছরের প্রবাহ সম্পর্কে তার মন্ত্রণালয়ে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। ভারতীয় পানিমন্ত্রীর বাংলাদেশে আগমণের অনেক আগেই শোনা গিয়েছিল যে, দু'দেশের মধ্যে বিরাজিত পানি বন্টন ও নদী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রিয়রঞ্জন বাবু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছ থেকে ম্যান্ডেট নিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে ম্যান্ডেট বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলোর কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারেনি। তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি এবং মহানন্দা, আত্রাই ও মুহূরীসহ যে সব নদীর ভাঙ্গনরোধ কার্যক্রম বিএসএফ'এর বাধার মুখে বন্ধ হয়ে রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনায় কোনো সন্তোষজনক ফলাফল আসেনি। বরং ভারত বাংলাদেশকে তিস্তা প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ বন্ধ করার জন্য উল্টো চাপ দিয়েছে। তিস্তা নদীর উজানে প্রায় ৬৪ কিলোমিটার ভেতরে, গজালডোবায়, ভারত বাঁধ নির্মাণ করে তিস্তার অবাধ প্রবাহ বন্ধ করেছে। ভারত পানি আটকে দেয়ার ফলে তিস্তা সেচ প্রকল্প প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, তিস্তা সেচ প্রক্রিয়া চালু রাখতে কমপক্ষে ১০ হাজার কিউসেক পানির প্রয়োজন। সামনে আসছে শুষ্ক বা খরা মৌসুম। সে সময়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে তিস্তা সেচ প্রকল্পের পর্যাপ্ত পানি। কিন্তু এ বিষয়টি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি তুলে দিয়েছেন অনাগত ভবিষ্যতের হাতে। সে কারণেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না 'ম্যান্ডেট' প্রাপ্ত ভারতীয় পানিমন্ত্রী বাংলাদেশকে বাঙালী হয়ে কী দিয়ে গেলেন?

এ বৈঠকে বাংলাদেশকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বেসিনে ৬৬ ঘন্টা আগে বন্যা সতর্কীকরণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত দিতে সম্মত হয়েছে ভারত। এ তথ্য-উপাত্ত গৌহাটি থেকে আগে ৪২ ঘন্টা আগে সরবরাহ করা হতো। ন'বছর পর গঙ্গা চুক্তির কার্যক্রম নিয়ে চুক্তি পর্যালোচনা করতে রাজি হয়েছে ভারতীয় প্রতিনিধিদল। তাছাড়া বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে সংগে নিয়ে ভারতীয় মন্ত্রী শিগগিরই অভিন্ন নদী সমূহের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সন্ধান করবেন বলে তার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অভিন্ন নদীর যৌথ ব্যবস্থাপনা কিংবা পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি প্রিয়রঞ্জন বাবু। তবে অভিন্ন নদীর পানি বন্টনসহ সীমান্ত নদী ভাঙ্গন সমস্যা নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক বছরে দুবার করার ব্যাপারে ভারত নিজ থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে শেষ পর্যন্ত চুক্তি করার ব্যাপারেও আশ্বাস পাওয়া গেছে। দাসমুন্সি বলেছেন, তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি হবেই। সে কারণেই হয়তো তিনি বলেছেন, 'যৌথ

www.pathagar.com

নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠক স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ বৈঠক মাইলফলক হয়ে থাকবে।' সে কারণে জেআরসি'র ৩৬তম বৈঠককে আমাদের দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বার্থের প্রেক্ষাপটে একটি শুভসূচনা বলে আশাবাদীরা মনে করছেন।

ভারতীয় পানিমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি জেআরসি বৈঠকে তার অবদানের জন্য নয়, আবেগপ্রবণ কথামালার জন্য বাংলাদেশীদের মন নরম করে ফেলেছেন। এ ক্ষেত্রে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের ছেলে প্রিয়রঞ্জন অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে বাংলাদেশীদের দুর্বলতম জায়গাটিতে হাত দিয়েছেন। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি যখন আর্তির ওপারে থাকি তখন ওপারের মানুষের কান্না যেমন শুনি, এপারের গোবিন্দপুরের কান্নাও আমি একই সংগে শুনতে পাই। আমার হৃদয়, আমার মন, আমার সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি বন্যা ও নদী ভাঙ্গন সমস্যার দ্রুত সমাধান করার ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়কে (বাংলাদেশী) প্রস্তাব দিয়েছি। তিনি রাজি হয়েছেন। আমরা দু'জনে এক সংগে দু'পারের কান্না শুনতে যাব। দু'পারের দুঃখ দেখতে যাব। শুধুমাত্র আমলাদের ওপর নির্ভর করে নয়, আমাদের যুক্ত মানসিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাস্তবে যা করা উচিত তা করার জন্য আমরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবো। আমরা এমন কোনো কাজ করবো না যা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' তিনি আরও বলেছেন, দুই হাজার বছরেও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নিয়ে) বাস্তবায়ন করা হবে না। বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থেই আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবেনা।'

ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন নদীগুলোর ব্যবস্থাপনা, তাদের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং পানি বণ্টন এ অঞ্চলের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের জীবন নদী কেন্দ্রিক। নদীকে কেন্দ্র করেই চলে আমাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও অবস্থার উন্নয়নে তাই জেআরসি'র ভূমিকা এবং অবদানের কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ ভারতের বিমাতাসুলভ আচরণ দেখেছে দীর্ঘদিন। তাই প্রিয়রঞ্জন বাবুর ব্যক্ত সমবেদনা এবং আশ্বাস বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন বাবুর সদিচ্ছা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা এ অঞ্চলের মানুষকে একটি সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক মরুকরণ প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের অবহেলায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে যেতে পারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ইতোমধ্যে পানি প্রবাহের অভাবে বাংলাদেশের ২০টি নদী হারিয়ে গেছে আমাদের ভূ-প্রকৃতি থেকে। ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও পানির অভাবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র ও ভূপ্রকৃতিতে ক্রমশ পড়ছে এক বিরূপ প্রভাব। এ অবস্থায় জেআরসি'র বৈঠক ও ভারতের পানিমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন বাবুর বাংলাদেশে আগমণ হয়তো আমাদের অঞ্চলে একটি নয়া দিগন্তের সূচনা করতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন, সব সমস্যা সমধানের ক্ষেত্রে এ বৈঠকটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। আমরা সে আশায়ই সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

ভারতের দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি ও ত্রিদেশীয় চুক্তি

নয়া দিগন্ত, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ধ্যান-ধারণায় বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো অনতিক্রমনীয় সমস্যা থাকার কথা নয়। উভয়ের স্বার্থেই আমাদের মধ্যে বিরাজিত সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছেনা। এ দুটি প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কোন্নয়নের প্রশ্ন দেখা দিলেই বার বার ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের সমস্যা ফুটে ওঠে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ভারত শেষ পর্যন্ত দু'একটি কথা বলতে বাধ্য হলেও বাস্তবে দেখা যায় তার কাজের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত তার নিজের সমস্যা এবং স্বার্থ দেখতেই সদা ব্যস্ত থাকে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি, ভাটির দেশ হিসেবে অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখা এবং সীমান্ত উত্তেজনা নিরসন সহ বহু সমস্যা রয়েছে যা সমাধানের ব্যাপারে ভারত তেমনটা আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রলম্বিত এক কূটনৈতিক কৌশলে ভারত সবকিছু ঝুলিয়ে রাখে। এবং বড় দেশ হিসেবে সবসময় বিভিন্ন কৌশলে নিজের স্বার্থটা ঠিক সময়ে আদায় করে নেয়। দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমনই একটা অবস্থা বিরাজ করছে বলে অনেকে মনে করে।

বিপুল সম্ভাবনাময় ভারতের শিল্পায়ন ও উৎপাদনের জন্য চাই পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানী শক্তি। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ভবিষ্যতে একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে দেখতে চাইলেও আপাতত তাকে জ্বালানী শক্তির ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করতে পারছেনা। সুতরাং এ ব্যাপারে ভারতকে তাকাতে হচ্ছে তার নিকট প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ইরানের দিকে। সে হিসেবে সঙ্গত কারণেই ভারতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ তার দুয়ার খুলতে হচ্ছে। অন্তর্মূখী ভারত ইতোমধ্যে অনেকটাই বহির্মুখী হয়েছে। ভারতকে পাকিস্তান এবং গণচীনের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিরাজিত অধিকাংশ সমস্যার কোনো সমাধান না হলেও ভারতের জন্য বাংলাদেশ একটি বিরাট এবং অত্যন্ত লাভজনক বাজার। তাছাড়া ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের ভবিষ্যত সাফল্যে বাংলাদেশ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে মিয়ানমার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে এ প্রস্তাবিত পাইপলাইন নিতে হলে ভারতকে ৯০০ কি. মি. এর স্থলে আরও ৫০০ কি. মি. অতিরিক্ত লাইন বসাতে হবে, যা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। এর পরিবর্তে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভারতকে তিনটি শর্ত দিয়েছিল। সে শর্তগুলো হলো, ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষে ভারতে শুল্ক বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা, নেপাল ও ভূটানের সাথে ট্রানজিট সুবিধা পাওয়া এবং ভূটান ও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করা। গত ৫ মে দু'দিনের এক সফরে বাংলাদেশে আসেন ভারতের জ্বালানী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী মণিশংকর আয়ার। ঢাকায় এ বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপলাইনের সাথে বাংলাদেশের শর্তগুলো জড়াতে রাজি হননি। ফলে গ্যাসলাইনের বিষয়টি সহ শর্তগুলো বিবেচনা করে দেখার জন্য দুটো পৃথক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এতে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর সম্ভাবনাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি, নেপাল ও ভূটানের সাথে ট্রানজিট সুবিধা এবং সেখান থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রলম্বিত কূট-কৌশলে জড়িয়ে পড়েছে।

অতীতে সদস্য দেশসমূহ, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তিধর ভারত ও পাকিস্তানের দীর্ঘ বিরোধের ফলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক কোনো অর্থবহ এবং জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সপ্তকন্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাশ্মির সমস্যার কারণে নিরাপত্তাজনিত সঙ্কট মোকাবেলা করেছে। অপরদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে দেখা দিয়েছিল এক জটিল পরিস্থিতি। এসবকে কেন্দ্র করে মুক্তবাজার, শিল্পায়ন ও অন্যান্য পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে সার্কের সদস্য দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে তেমনটা এগুতে পারেনি। এ অবস্থায় দু'বছর আগে ভারতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ঐক্যজোট সরকার ক্ষমতায় এলে উপমহাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভারতে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তারপরও দুটি দুঃখজনক কারণে দু'বার পিছিয়ে যায় ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সার্ক সম্মেলনের তারিখ। সুতরাং আঞ্চলিকভাবে অগ্রগতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কোনো কর্মকান্ড সূচিত হয়নি। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদস্য দেশগুলো নিজেদের ভেতর সহযোগিতার মাধ্যমে ইতোমধ্যে তাদের অনেক সমস্যারই অবসান ঘটিয়েছে। শুল্ক বহির্ভূত বাধা, সীমান্ত সমস্যা, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা এবং অভিন্ন নদীর সমস্যা সহ কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাদের নেই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংস্থা 'আসিয়ান' অসামান্য অর্থনৈতিক সাফল্য ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। এ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সময়োপযোগী এবং যথোপযুক্ত উন্নতি সাধিত হলো না অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক অশান্তি, অস্থিরতা ও অসহযোগিতার কারণে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় গত ৩৩ বছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের তেমন কোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। ভারতের সাথে বাণিজ্য, সীমান্ত, পরিবেশ সংরক্ষণ, নদী ব্যবস্থাপনা কিংবা পানি বন্টন সমস্যার-

www.pathagar.com

কোনো প্রশ্ন তুললেই তারা দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলে কিন্তু সে সমস্ত কোনো সমস্যাই সময়োচিতভাবে সমাধানের দ্বারপ্রান্তে তেমনটা পৌঁছেনা। এবারও হয়েছে একই অবস্থা। ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বার বার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কথা বললেও ভারত-মিয়ানমার-বাংলাদেশ গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের চুক্তি হবে ত্রিপক্ষীয়ভাবে। তাছাড়া ইরান থেকে ভারত পাকিস্তান হয়ে পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে যে গ্যাস আনার পরিকল্পনা করছে তাও ত্রিপক্ষীয়ভাবে হবে। ইরানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি থাকলেও ভারত তা মানছে না। অথচ গঙ্গার পানির প্রবাহ বৃদ্ধি, নেপালের সাথে যোগাযোগ স্থাপন কিংবা বিদ্যুৎ আমদানীর বিষয়গুলো হতে হবে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে। সেখানে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের বিষয়গুলো ভারত পাশ কাটিয়ে যায়। এতে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

পাকিস্তান, ভারত ও ইরানের মধ্যে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের চুক্তি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে। এই চুক্তির চূড়ান্ত কাঠামো তৈরী হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারত দীর্ঘদিন ধরে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি সম্পদ আমদানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারত ও পাকিস্তান আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস পাইপলাইনে নিয়ে আসার বিষয়টিও নাকি পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছে। তাছাড়া ইরানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের কর্মকর্তারা আইনগত, অর্থনৈতিক, কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি নিয়ে বিশদ আলাপ-আলোচনা করছেন বলে বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলো খবর দিয়েছে। অপরদিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো, ভারত ও চীন ১৯৬২ সালের সীমান্ত যুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো এখন সরাসরি বাণিজ্য ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অধীনে ঐতিহাসিক 'সিল্করোড'-এর একটি অংশ পুনরায় চালু করার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে হাজার হাজার শ্রমিক এখন সিকিম ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী নাথু লার পাশে রাস্তা মেরামত ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মানের কাজ করছে। পরিকল্পনা মতো সবকিছু অগ্রসর হলে আগামী ২ অক্টোবর থেকে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

এ পরিস্থিতিতে আগামী নভেম্বরে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও মনমোহন সিং-য়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানীগুলোর অনুসন্ধানের কাজ এবং বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন বসানোর বিষয়টিও চূড়ান্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব ঠিকঠাক মতো এগুলে আগামী বছর জানুয়ারীতে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় এই চুক্তি স্বাক্ষর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের সবকিছুই মোটামুটি এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

অথচ বাংলাদেশের কোনো সমস্যারই ন্যায় সঙ্গত সমাধান হচ্ছেনা বলে অভিযোগ ওঠেছে। এ অবস্থায়ও বাংলাদেশের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে এখন নাকি দখিনা হাওয়া বইছে। কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় দু'বছর পর্যন্ত কোনো ভারতীয় মন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে না এলেও গত দু'মাসের মধ্যে তিনজন মন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং এ সফরের সূচনা করার পর আসেন তাদের জ্বালানী মন্ত্রী মণিশংকর আয়ার। চলতি সপ্তাহে আসছেন ভারতের পানিমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। দাশমুন্সির সফরকালে তিস্তাসহ ৭টি অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশ প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলে জানা গেছে। একদিকে ভারতীয় মন্ত্রীরা আসছেন, অপরদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আখাউড়া সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ বাংলাদেশের ৪ জন নিরীহ নাগরিককে সীমানার অনেক ভেতর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। গত ৫ বছরে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবং সে দেশের ঘাতকদের হাতে ৪২০ জন বাংলাদেশী নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। তাছাড়া মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে আরও ২ হাজার বাংলাদেশী। বিচার বহির্ভূত এসব হত্যাকান্ড ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ব্যাপারে বিএসএফ ও বিডিআরের মহাপরিচালক পর্যায়ে বহু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও এর কোনো প্রতিকার হয়নি। প্রশ্ন ওঠেছে সীমান্তে অস্থিরতা জিইয়ে রেখে কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় তারা ?

গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার বিষয়টি বাদ দিলেও বাংলাদেশের সাথে ৫৩টি অভিন্ন নদীতে সংযোগ খাল খনন ও বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি সরিয়ে নেওয়ার মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে ভারত। অথচ এ ব্যাপারে কোনো তীব্র প্রতিবাদ ওঠলে তারা বলে এটি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। চূড়ান্তভাবে কিছু করার আগে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করা হবে। অথচ তাদের কোনো কিছুই এখন আর কল্পনার পর্যায়ে নেই। অভিন্ন নদীর ওপর কাজ করার ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। অপরদিকে সিলেটের উজানে বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ করছে ভারত। এতে ভবিষ্যতে মেঘনার প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া বাণিজ্য ক্ষেত্রেও এভাবে বাংলাদেশকে দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনার কথা বলে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। তারপরও তারা নতুন করে ট্রানজিট, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও কলকাতা-নারায়নগঞ্জ নৌপথ চালুর কথা বলে। অপরদিকে ভারতে নাকি অবৈধভাবে বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি নাগরিক রয়েছে। প্রায়শই তাদের ফেরত পাঠানোর হুমকি দেয় ভারতীয় নেতারা। এরপরও বাংলাদেশ আশা করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হোক। যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হোক এবং ভারতের সাথে বন্ধুত্ব অত্যন্ত সুদৃঢ় হোক। এ সম্পূর্ণ বিষয়টি এখন ভারতের হাতে। মনমোহন সিং-এর মতো একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তার শাসনামলেও যদি উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে তো আর কোনো আশার আলো থাকেনা। এ বিশ্বায়ন, মানবাধিকার, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগেও প্রবঞ্চনা এবং

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদের কোনো স্থান থাকতে পারেনা। বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং নির্ভরশীলতা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিকভাবে তার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া অসম্ভব হয়ে পড়বে এ অঞ্চলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মূলোচ্ছেদ করা। এ অবস্থায় তোমার জন্য দ্বিপাক্ষিক হিসাব-নিকাশ এবং আমার স্বার্থে বহুপাক্ষিক চুক্তি ও কার্যক্রম, এ অঞ্চলের মানুষকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করে। ভারতের সুচিন্তিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত পররাষ্ট্র নীতির ওপর প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহের সাথে তাদের সৎ ও শক্তিশালী সম্পর্ক নির্ভর করে। সত্যিকার অর্থে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর প্রতিবেশী দেশসমূহের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ হিসেবে ভারতকে যদি একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে হয় তা হলে এ অঞ্চলের সমস্ত দেশ ও জনগণের প্রতিও তার রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। যে ভারত পাকিস্তান ও গণচীনের সাথে যোগাযোগ, বাণিজ্য ও সম্পর্ক জোরদার করছে তড়িৎগতিতে, সে কেন বাংলাদেশকে কোনঠাসা করে রাখবে, বঞ্চিত করবে তার ন্যায্য পাওনা থেকে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজিত সকল সমস্যা সমাধানে বড় দেশ হিসেবে অকৃপণভাবে ভারত এগিয়ে আসবে, এটাই তো সবাই আশা করে।

www.pathagar.com

চেনা রাজনীতির অচেনা খেলোয়াড়

নয়া দিগন্ত, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

প্রধানমন্ত্রী তখনও গণচীনের রাজধানী বেইজিং ত্যাগ করেননি। ১৭ আগস্টে দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে গণফোরাম নেতা ও ১৪ দলের অন্যতম শরিক ড. কামাল হোসেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, অবিলম্বে সংসদ ডেকে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের অনেকেই বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর উচিত বিষয়টি নিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে কথা বলা। তখন মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এবার বুঝি বিরোধী দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংসদে যাবে। ১৭ আগস্টে সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার মতো এতো বড় একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলমত নির্বিশেষে জনগণের নির্বাচিত সকল প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ হবেন। কিন্তু নাহ্, শেষ পর্যন্ত তা ঘটলো না। আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ৬ সেপ্টেম্বর বললেন, 'সংসদে যাবো, বোমা খাবোনা এ গ্যারান্টি কে দেবে ?' এতো বড় একটি ঘটনার পর যথারীতি এবারও সংসদে যোগ না দেওয়ার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করলেন দেশের প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী। তাছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪৫টি মহিলা আসনে তাদের প্রাপ্য আনুপাতিক হিস্যা নেবার ব্যাপারেও বিভিন্ন অজুহাত তুলে পিছিয়ে গেল আওয়ামী লীগ। এতে স্বাভাবিক কারণে তখন থেকেই দেশবাসীর মনে একটি ধারণা জন্মেছিল যে আওয়ামী লীগ বোধ হয় আর এ সংসদে যাবেনা। এবং সাম্প্রতিক গুজব অনুযায়ী আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করবেন।

এ সমস্ত সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক (সন্ত্রাসী) ঘটনাবলীতে বাংলাদেশের হাটবাজার এখন আলোচনা মুখর। তর্ক-বিতর্কে সরগরম প্রত্যেকটি জনপদ। দেশব্যাপী ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বোমাবাজি এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বারবারই শুধু এ দেশের গণতন্ত্র এবং বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলে। সংসদে না গিয়েও যারা দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত, এ ভাবনাটা বোধ হয় তাদের কোন অংশেই কম নয়। এ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক মানসিকতা যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি অথচ নির্বাচিত হয়েও সংসদে নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবোনা, বিভিন্ন ওজর-আপত্তিতে সংসদ ত্যাগ করবো, এমনতো হতে পারেনা। জাতির বিভিন্ন সঙ্কটে জাতীয় ফোরামে দাঁড়িয়ে নিজেদের কোনো ভূমিকা না রাখা কী সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ? যারা বলে রাজপথে আন্দোলন

www.pathagar.com

করে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটাবে তারা কী সংসদে নিজেদের কথা বলার অধিকারটুকু আদায় করে নিতে পারেনা? তাছাড়া বিরোধী দলে গেলেই সংসদ বর্জন যদি দাবী আদায় কিংবা আবার ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশলে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে সময়ে অসময়ে সংসদীয় নির্বাচন দাবী করার অর্থ কি দাঁড়ায় ? যতবারই নির্বাচন হোক, কাউকে না কাউকে তো বিরোধী দলে যেতেই হবে। কেয়ামত পর্যন্ত বার বার কেউ ক্ষমতায় যাবেনা। সুতরাং সরকার থাকলে বিরোধী দলও থাকবে।

এখানে কথা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান এবং আচার-আচরণ নিয়ে। আমাদের এ ব্যাপক জনসংখ্যা অধ্যুষিত নতুন স্বাধীনতা পাওয়া দারিদ্র দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিকরা একদিন সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ একানব্বই-এর নির্বাচনের পর পরই সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার দাবী তুলে। তখন সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই, যে কোনোভাবে হোক স্বৈরাচারকে ঠেকাতে হবে। বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। গণতন্ত্রের ভীত অত্যন্ত মজবুত করতে হবে, এবং সংসদই হবে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খানিকটা সময়ের ব্যবধানে রাজনীতিকদের সে সমস্ত কথা এবং কাজের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে লাগলো। তখন থেকে যারাই বিরোধী দলে গেছে তারাই বিভিন্ন অভিযোগে সংসদ ত্যাগ করে রাজপথের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে কেউই রাজপথের আন্দোলনে নব্বই পরবর্তী কোনো নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি। নির্বাচন দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে বিএনপি-কেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে দিতে হয়েছে। মাঝখানে দেশের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে প্রচুর। এখনও আবার সংসদকে পাশ কাটিয়ে দাবী আদায়ের একই কৌশল নিয়েছে বিরোধী দলগুলো। ক্ষমতাসীন সরকারের শাসনকাল আরও এক বছর বাকী থাকলেও আগের তুলনায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে এতদিন বাংলাদেশকে বলা হতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উদার গণতান্ত্রিক দেশ। এখন তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে ১৭ আগস্টের ঘটনা। এটি সরকারের জন্য যেমন একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয় তেমনি বিরোধী দল, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জন্য আরও বেশি দুশ্চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ, যে আওয়ামী লীগ দাবী করে তারাই এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল প্রবক্তা, তাদের সামনেই আজ বিস্ফোরণের শিকার হচ্ছে গঠনশীল গণতন্ত্রের ধারা। উগ্র মৌলবাদ কিংবা সন্ত্রাস তাদেরকেও ছেড়ে দেবে না। সে জন্যই সরকার এবং সম্মিলিত বিরোধী দল আজ ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে উগ্র মৌলবাদ ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে হবে। সংসদকে কার্যকর রেখে গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ যদি মনে করে এটি বিএনপি'র সমস্যা এবং তারা ক্ষমতায় এলে বিদেশী কোনো গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে উগ্র মৌলবাদ ও সন্ত্রাসকে রোধ করবে, তা হলে নির্ঘাত ধরেই নিতে হবে যে এ দেশের পরিণাম আফগানিস্তান থেকে আর বেশী দূরে নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কোনো কোনো মহলে গুজব রয়েছে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় জামায়াতে ইসলামী দলের উত্থানকে ঠেকানোর জন্যই তাদের প্রতিপক্ষ উগ্র মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী শক্তিকে দিয়ে একটি বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনী ১৭ আগস্টে দেশব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। গুজবটি এই রকম ঃ ২০১৬ সালের দিকে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। এটি যেভাবেই হোক রুখতে হবে। সে কারণেই নাকি অতি সহজে জামায়াতের প্রতি চরম বৈরী, জামায়াতুল মুজাহেদীন এবং অপরদিকে দু'একটি বামপন্থী সংগঠনকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে ঘটানো হয়েছে এ বিস্ফোরণ। এতে, বিশেষ করে উগ্র মৌলবাদীরা নাকি তাদের শক্তি জাহির করার একটি সুযোগ পেয়েছে। এ দেশব্যাপী বিস্ফোরণের ঘটনা এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে ডান হাত জানেনা বাঁ হাতের খবর আর বাঁ হাত জানেনা ডান হাতের অবস্থান। এর ফলে এ ঘটনার জন্য দায়ী উগ্র মৌলবাদী সংগঠন, বামপন্থীদের অংশগ্রহণ কিংবা বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনীর তদারকি, কিছুই এক সুতোয় গাঁথা যাচ্ছেনা। আর বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনী এত শক্তিশালীও নয় যে তাদের কাছে এখন যে তদন্ত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যাবে। গত প্রায় তিন সপ্তাহের কর্মকান্ডে পুলিশ ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের সাথে মাঠ পর্যায়ে জড়িত অবোধ কিছু কর্মী ছাড়া পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত 'মাস্টামাইন্ডদের' কোনো সন্ধান পায়নি। শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই অথবা জনশ্রুত কোনো ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মামলার তদন্তে জঙ্গিদের ব্যাপারে যে তথ্য মিলেছে তাতে দেখা যায় সারা দেশে এ পর্যন্ত ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের পর ৯৭ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৪০ জনকে ঢাকায় যৌথ বিশেষজ্ঞ সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ২৫ জনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। এদের মধ্যে পাঁচটি জেলার ১৪ জন বোমা হামলার সঙ্গে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে বোমা হামলার, কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির প্রধান, পুলিশের অতিরিক্ত আইজি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) প্রধান, ফররুখ আহমেদ বলেছেন, বোমা হামলার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তার ভিত্তিতে সারা দেশে বোমা হামলার পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। তবে বোমা হামলার ঘটনায় সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন না থাকায় নাকি তদন্ত দ্রুত এগুতে পারছে না। তাছাড়া মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন হওয়ার কারণে জঙ্গিদের সঙ্গে চরমপন্থী সংগঠন জনযুদ্ধের নাকি একটি সন্ধি হয়েছে। সরকার জঙ্গি ও চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে যাওয়ায় পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের দুটি নিষিদ্ধ সংগঠন নাকি আরও সংঘবদ্ধ হচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে শীর্ষ জঙ্গি নেতাদের ব্যাপারে গোয়েন্দারা এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। তদন্তকারীদের মতে একটি বিশাল ও সুশৃঙ্খল শক্তির সুচিন্তিত গোপন পরিকল্পনা ছাড়া কোনোভাবেই এতো বড় একটি ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা ভারতে বসেও এদেশে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করাচ্ছে বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

জঙ্গি ইস্যুতে আওয়ামী লীগ রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে বলে ৭ আগস্টে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক গুরুতর অভিযোগ এনেছে। তারা বলেছে, দেশজুড়ে বোমা হামলা ঘটনাকে ইস্যু করে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে চারদলীয় জোট সরকারের পতন আন্দোলন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতেই তাদের এ রহস্যজনক নীরবতা। নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদনে তারা আরও বলেছে, আওয়ামী লীগ চায় আগামী নির্বাচনের আগে বিএনপির ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ইসলামী জঙ্গি শক্তি রাজনৈতিকভাবে নির্মূল হোক। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, আওয়ামী লীগ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেনা। রাজপথের কঠোর আন্দোলনেই চারদলীয় জোট সরকারের পতন ঘটবে। এ ব্যাপারে বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, রাজপথে গাড়ী ভাঙ্গার জন্য পুলিশের তাড়া না খেয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংসদে এসে কথা বলুন, অন্তত দু'এক কোটি লোক তা শুনতে পাবে। উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতি নয়, সংসদীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে জনাব ভূঁইয়ার এ উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজপথে ভাংচুর এবং জ্বালাও-পোড়াও করে সরকার পতনের দিন শেষ হয়ে গেছে। এ রাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত পর্যন্ত কোথাও আর নেই। বার বার রাজপথে আন্দোলন করে সরকার পতনের ব্যর্থ কৌশলের চেয়ে গণতান্ত্রিকভাবে ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করে সরকার হঠানোর কৌশলই সংসদীয় রাজনীতির মূল মন্ত্র। এ ব্যাপারে নিজের পক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জনমত গঠন করাই হচ্ছে বিরোধী দলের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র। ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও কিংবা হরতাল নয়।

জ্বালানী তেলের ধারাবাহিক মূল্য বৃদ্ধিতে বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল সকল দেশই এখন বিপর্যস্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত কিংবা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এবং এমনকি গণচীনেও কয়েক দফায় জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ ১৮ আগস্ট হরতাল ডেকেছে। এতে জনগণের দুর্ভোগ লাঘব হবেনা বরং একদিনের জন্য (হরতালের দিনে) হলেও তা আরও বাড়বে। এ হরতালে ১৪ দলের অন্যতম শরিক দল গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেন সমর্থন দেননি। তিনি এ হরতালকে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কর্মসূচি বলে বিবেচনা করেননি। তবে তার মতো একজন বিশিষ্ট সংবিধান প্রণেতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীর একটি সাম্প্রতিক উক্তিতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সম্প্রতি দেশের দুটি প্রভাবশালী পত্রিকায় তার উদ্বৃতি দিয়ে একটি খবর ছাপা হয়েছে যাতে তিনি বলেছেন, অক্টোবরের মধ্যে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তছনছ হয়ে যাবে। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কোন তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন তিনি তা বোঝা গেলনা। একটি নির্বাচিত সরকার, সংসদে যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাকে কীভাবে তছনছ করা যায় ? ড. কামাল হোসেনের মতো

www.pathagar.com

সুবিজ্ঞ একজন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব এমন কথা বললে সংবিধান বহিঃর্ভূত শক্তি কিংবা অসাংবিধানিক কার্যকলাপেরই আভাস পাওয়া যায়, যা কোনমতেই প্রণিধানযোগ্য হতে পারেনা।

এ অবস্থায় নেহাত বোমা খাওয়ার ভয়ে বর্তমান সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার আওয়ামী লীগ দলীয় সিদ্ধান্ত জনগণের হাসির উদ্রেক করেছে। কারণ বোমা খাওয়ার জন্য সংসদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, ঘরে বসেও এখন বোমা খাওয়া যায়। কারণ পটকা থেকে শুরু করে সময় নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক, সবকিছুকেই আমরা এখন বোমা বলে মনে করি। চোরাচালানের বদৌলতে এদেশে এখন তেমন অনেক কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং বোমার ভয়ে সংসদ ছেড়ে দিলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে কারা ? কারা এদেশ থেকে জঙ্গিবাদ, উগ্র মৌলবাদ, সন্ত্রাস এবং রাজনীতির নামে প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ করবে ? কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগে সংসদে না যাওয়া আর বোমার ভয়ে সংসদে না যাওয়া কী সমার্থক ? এসব অজুহাত কী সংসদকে অকার্যকর করেনা এবং সংসদীয় ধারার রাজনীতিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে সাহায্য করছে না। তাহলে চরমপন্থী এবং জঙ্গিগোষ্ঠির সাথে সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের আর প্রভেদ থাকে কোথায় ? সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন, উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে যে অবাধ গণতন্ত্রের ধারা এবং স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তা তো কোনো একটি নির্দিষ্ট দল দিয়ে সম্ভব নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রে সবারই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একমাত্র দেশই স্থায়ী। এ ক্ষেত্রে কোনো সরকারই শেষ সরকার নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশে ক্ষমতায় যাওয়াই সবার লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সরকারই স্থায়ী নয়। সমৃদ্ধশালী করাই পর্যায়ক্রমে সকল সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু কোনো সরকারই বিরোধী দলের গঠনশীল ভূমিকা ছাড়া সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। সে বিবেচনায় মার্কিন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের মতে যারা সাময়িক নিরাপত্তা কিংবা স্বার্থের আশায় দায়িত্ব বিকিয়ে দেয়, তারা মুক্তি বা নিরাপত্তা কোনটাই পায়না।

www.pathagar.com

বর্তমান সঙ্কট উত্তরণের শুভ কামনায়

নয়া দিগন্ত, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

যে কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রে রাজনৈতিক দল হচ্ছে তার চালিকা শক্তি। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলোও রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকলেও তাতে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকে, যেমন গণচীন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো দেশে একটি দল নয়, একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ধরনের শাসনের তুলনায় সংসদীয় পদ্ধতিতে বরং রাজনৈতিক সংগঠনের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। এর পেছনে রাজনৈতিকভাবে বহু মত ও পথের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। এটিই সম্ভবত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য অর্থাৎ কোনো দলের কিছু পছন্দ না হলে অন্যেরা প্রকাশ্যে তার বিরোধীতা করতে পারে। অপছন্দনীয় বিষয়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র কিংবা চক্রান্ত করার কিছুই থাকেনা। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে সংসদ চলাকালে বিভিন্ন দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে জরুরীভাবে আলোচনা কিংবা বিতর্ক হতে পারে। কোনো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় অতি সহজে।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর গত প্রায় ৩৪ বছরে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে যারা এ দেশের রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৯-এ পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেনে। স্বাধীনতার পর এককভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ। গত প্রায় ৩৪ বছরে তারা মোট ক্ষমতায় ছিল সাড়ে আট বছরের কিছুটা অধিক কাল। এ সময় একদলীয় শাসনব্যবস্থা সহ অন্যান্য কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের মাঝে বিতর্কিত হয়ে ওঠে। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রায় তিন বছর পর আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গত বৃহস্পতিবার, ১ সেপ্টেম্বর ২৭ বছর অতিক্রম করে ২৮ বছরে পা দিলো বিএনপি। গত আড়াই দশকে বিএনপি বর্তমান মেয়াদসহ পাঁচবার জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর মধ্যে বর্তমান মেয়াদসহ বিএনপি দু'বার জনগণের ভোটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সমাসীন

www.pathagar.com

হয়। জন্মের পরপরই অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে বিএনপি প্রথম জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বয়সকালের অর্ধেক সময় বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সমস্ত বিভিন্ন কারণেই বিএনপি'র ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ লেখার প্রয়াশ।

এ কথা ঠিক যে বহুদল ভিত্তিক রাজনীতি নির্বাসিত করে দেশকে গণতন্ত্রশূণ্যতায় ঠেলে দিয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরাচার চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল ১৯৭৫-এর সূচনালগ্নে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ তখন প্রায় দেউলে এবং দুর্ভিক্ষের করুণচিত্র তখনো মুছে যায়নি সাধারণ মানুষের চোখ থেকে। এ অবস্থায় এদেশের গণতন্ত্রমনা এবং মুক্তিকামী মানুষ মেনে নেয়নি তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা। অতিদ্রুত এক করুণ পরিনতির মধ্য দিয়ে অবসান ঘটলো সে ব্যবস্থার। তার কিছুটা সময় পরে স্বাধীনতার মহান ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি শহিদ জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা করলেন। দেশে নতুন করে শুরু হলো গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও উৎপাদনের রাজনীতি। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন পরিবর্তন, আধুনিকায়ন, উৎপাদন ও উন্নয়নের দ্বার একে একে উম্মোচিত হচ্ছিল ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ৩০ মে তাকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কতিপয় বিপথগামী কুচক্রী হত্যা করে। এরপর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার নিরঙ্কুশ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংবিধান বহির্ভূতভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন শুরু করেন।

বিএনপির সে চরম দুর্দিনে এবং দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক শুন্যতায় এগিয়ে আসেন শহীদ জিয়ার উত্তসূরী বেগম খালেদা জিয়া। তারই বলিষ্ট নেতত্ব এবং আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটে বিএনপি ১৯৯১ সালে আবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দেশে নতুন করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি পুনরায় শুরু হয়। 'তলাবিহীন ঝুড়ির' অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিশ্বে নতুন করে পরিচিতি লাভ করে। প্রধনমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯১ সাল থেকে দারিদ্র বিমোচন, কৃষির অগ্রগতি, ব্যাপক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিভিন্ন খাতে সংস্কার সাধনসহ নারী শিক্ষার প্রসারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। তাছাড়া বড় পুকুরিয়ার কয়লা খনি ও দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্ড থেকে জ্বালানী সম্পদ উত্তোলন শুরু হয়। যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ থেকে

www.pathagar.com

শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়। তারপরও হিসাবের গরমিলে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হারায় বিএনপি। তবে সে পরাজয়কে অত্যন্ত সহজভাবে মেনে নেয় এ দলটি। বিরোধীদল হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যায় বিএনপি। তারই পথ ধরে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট জনগণের ভোটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। সে সরকারের চার বছর পূর্ণ হতে আর এক মাসও বাকি নেই।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি নেতৃস্থানীয় সরকারি সংস্থা তার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রিপোর্টে বাংলাদেশের চলতি অগ্রগতি ও আধুনিক অগ্রযাত্রার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপিকে। যুক্তরাষ্ট্রের সে সরকারী সংস্থাটির গবেষণা রিপোর্টে ১৯৭২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত '২৫ বছরে বাংলাদেশের অবস্থান' শীর্ষক মূল্যায়নে এই তথ্য দেয়া হয়েছে। এটি তাদের এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কার্যক্রম, গণতন্ত্র, কৃষি-শিল্প-শিক্ষায় সাফল্য-অর্জন-ব্যর্থতা ও সামগ্রিক সমাজচিত্রের ওপর গবেষণারই একটি অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের ৮০ শতাংশের কৃতিত্ব বিএনপি একাই দাবী করতে পারে। বিএনপি'র সাফল্যগুলোর মধ্যে উন্নয়নের রাজনীতি ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনসহ নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরও বলা হয়, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৪ মার্কিন ডলার, যা ১৯৯০ সালে ১৭০ ও ১৯৯৫ সালে ৩১০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৪৬০ মার্কিন ডলার। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমাণ ছয় দশমিক আট শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় বলে রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়। বিএনপির নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণতন্ত্রে প্রবেশ করে উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, বিএনপি দেশের গণতন্ত্রায়নের সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার।

বর্তমান জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে একটি উদার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশের স্বীকৃতি পেলেও দেশী-বিদেশী শক্তির গোপন ষড়যন্ত্রে সম্প্রতি দেশে বেশ কিছু সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটে গেছে যা দেশের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাশকতামূলক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করে তার উন্নয়নের ধারা ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করা। চরম সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে এর স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তাকে পদদলিত করা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্রকারীদের কথা না হয় আপাতত বাদ দেওয়া গেল কিন্তু এ অবস্থায় দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের ভূমিকা কী? তারাও কী দেশী-বিদেশী চক্রের হাত থেকে দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে? নাকি সন্ত্রাস ও মৌলবাদ ঠেকানোর নামে তারা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আরও সাহায্য করছে? রাষ্ট্র ক্ষমতায় বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মেয়াদ আর এক বছর বাকি আছে। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের নামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সংবিধান পরিপন্থি যে সমস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছেন সেগুলো কী রাজপথে আদায় হতে পারে? এ কথা আজ সর্বত্রই আলোচিত হচ্ছে। তাদের প্রদত্ত ৩১-দফা সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হতে পারে একমাত্র জাতীয় সংসদে। আওয়ামী লীগ এ দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী একটি প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। সুতরাং সে দল সংসদ বাদ দিয়ে রাজপথে সংগ্রাম করে যদি ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে বলতে হবে এ দেশে সংসদীয় রাজনীতির ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। তাছাড়া এ দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও সুদূর এবং সুসংহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ অবস্থায় ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগইবা কথিত সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও নাশকতামূলক অপতৎপরতা ঠেকাবে কী করে? সুতরাং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গণতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক বলে দেশবাসী মনে করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে বিএনপির ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে, এ দলটির ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ বাংলাদেশের গণমাধ্যম বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। একবিংশ শতাব্দির প্রেক্ষাপটে এ জনপ্রিয় দলটি ভবিষ্যতে কীভাবে টিকে থাকবে তা নিয়েও বিভিন্ন সংবাদ বিশ্লেষক, কলামিস্ট ও প্রতিবেদকরা নানান প্রশ্ন তুলেছেন। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যথাসময়ে জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠান, সংসদ নির্বাচনে কালো টাকার মালিক ও ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে অধিকহারে দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেওয়া এবং তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দলটি সুসংগঠিত করার সুপারিশ করেছেন অনেকে। সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সৎ, কর্মঠ ও মেধাবী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার তাগিদও দিয়েছেন কেউ কেউ। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এগুলো সবই যুক্তিনির্ভর উপদেশ। এর পাশাপাশি দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক সন্ত্রাস, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, মৌলবাদী অপতৎপরতাসহ অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ করার আহবান জানিয়েছেন বিএনপি'র শুভাকাঙ্খীরা। র‍্যাব গঠনের পর থেকে অতিদ্রুত সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, অপহরণ, গুপ্ত হত্যাসহ অনেক সামাজিক অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ আন্দোলন এবং এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সম্প্রতি দেশব্যাপী সংগঠিত নাশকতামূলক বিস্ফোরণ, মৌলবাদী ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতার আলোকে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা। তারা বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে

www.pathagar.com

আগামী এক বছরের মধ্যেই এ অসীম দায়িত্বটি অতি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে হবে। নতুবা দেশের স্থিতিশীলতা, জাতীয় স্বার্থ এবং এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও বিপন্ন হতে পারে। ইতোমধ্যে দেশ শাসনে ও সমৃদ্ধি অর্জনে জোট সরকার যে সাফল্য অর্জন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, অতিদ্রুত তা বিলীন হতে পারে।

বর্তমান শাসন ক্ষমতায় এটিই বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শেষ বছর। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু সুসম্পন্ন করার পাশাপাশি দলকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে যুগের চাহিদা অনুযায়ী। এটিই হচ্ছে বিএনপি'র ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী এ দলের সর্বস্তরের সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের কামনা। দলে অবস্থান নেয়া কায়েমী স্বার্থবাদী, দুর্নীতিবাজ, অসৎ এবং গণবিরোধী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান চালানোরও তাগিদ অনুভব করেছেন অনেকে। এ সমস্ত সার্বিক বিবেচনায় আগামী একটি বছর এ দলের জন্য হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ অবস্থায় সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে জনগণের মাঝে। তাদেরকে অংশীদার করতে হবে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে। এ প্রক্রিয়ায় বিএনপি যাতে গড়ে ওঠে সর্বস্তরের মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও প্রতিনিধিত্বশীল দল হিসিবে। বিএনপির প্রতিটি নেতা-কর্মী যেন গড়ে ওঠে সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসেবে। দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে। দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তিতে বলীয়ান করতে হবে তাদের। এবারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এটিই বিএনপির প্রতি দেশবাসীর একমাত্র শুভ কামনা।

www.pathagar.com

ইসলাম যখন অপতৎপরতার শিকার

নয়া দিগন্ত, ২৭ আগস্ট, ২০০৫

একথা ভাবতে অবাক লাগে যে, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্বের কোন্দলে লিপ্ত কিছু ইসলামী প্রতিষ্ঠান এখন দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় বিদেশী অপশক্তির চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলেরও এমনই আশঙ্কা। যারা বাংলাদেশ এবং ইসলাম উভয়ের অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি ঠেকাতে তৎপর তাদেরকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুরুব্বি ধরেছে তথাকথিত দু'একটি জঙ্গী সংগঠন। বর্তমান চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের নেতারা মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামে সন্ত্রাস, উগ্রপন্থী কিংবা জঙ্গী কার্যক্রমের কোনো স্থান নেই। ইসলাম একটি শান্তি-শৃঙ্খলার ধর্ম। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই যথাযথ শিক্ষা, গভীর উপলব্ধি ও জীবনাচরণ। দেশের কিছু কিছু ইসলামী সংগঠন সে বক্তব্যের কারণেই বর্তমানে জামায়াতসহ ইসলামী শিবিরে মতানৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টি করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর অভিযোগ হচ্ছে, জোট সরকারের সাথে সম্পৃক্ত জামায়াত কিংবা ইসলামী ঐক্যজোট সত্যিকার অর্থে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। জোটের ইসলামপন্থীরা যা করছে তা ইসলাম সম্মত নয় বরং ইসলামের পরিপন্থী কাজ। এ সমস্ত কথা যারা বলে কিংবা এ ধরনের ধারণা পোষণ করে তারাই এখন বাংলাদেশে ধর্মীয় সন্ত্রাস বা জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তাদের প্রতিপক্ষ। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামীর মতো তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দেওয়ার গভীর পরিকল্পনা নিয়ে দেশী-বিদেশী অনেক শক্তিই এখন মাঠে নেমেছে বলে জামায়াত নেতাদের বদ্ধমূল ধারণা। তারা বলেছেন, ইসলামী বিপ্লবের নামে কতগুলো ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ এখন দেশে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তারা না বুঝে দেশের স্বার্থ, না বুঝে ইসলাম। বিদেশী শক্তির খপ্পরে পড়ে এরা দেশের ধ্বংস ডেকে আনছে বলে মন্তব্য করেছেন জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্য জোটের নেতারা।

গত বছরের মাঝামাঝি রাজশাহীতে জামা'আতুল মুজাহিদীনের বেশ কিছু অবিস্ফোরিত বোমাসহ অস্ত্র ধরা পড়ে। তাছাড়া দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে হুমকি দিয়ে তারা একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এরই সূত্র ধরে সরকার জামা'আতুল মুজাহিদীনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এ সংগঠনের নেতা ড. আসাদুল্লাহ গালিবকে গ্রেফতার করে। তখন থেকে এ সংগঠনের শীর্ষ নেতারা আত্মগোপন করে এবং এমনকি এর বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা শায়খ আবদুর রহমান এবং

www.pathagar.com

আজিজুর রহমান ওরফে সিদ্দিকুর রহমান ওরফে 'বাংলা ভাই' সহ অনেকে ভারতে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠেছে। গত ১৭ আগস্ট সংগঠিত দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ এ সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিশোধমূলক ঘটনা এবং তাদের অস্তিত্ব জাহির করার একটি কৌশল বলে এখন অনেকে মনে করছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো ১৭ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মীই আগে থেকে কিছুই জানতো না। এ বোমা হামলায় যারা ধরা পড়েছে তাদের কাছ থেকে এমন কথাই বেরিয়ে এসেছে। গ্রেফতারকৃতরা তাদের কোনো পরিচিত নেতার কাছ থেকে বোমা পায়নি। পেয়েছে অপরিচিতি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে। বোমা বহনকারীদের কেউ এসেছে মোটর সাইকেলে আবার কেউবা মোটর গাড়ীতে করে। সবাই স্থানীয় মানুষের কাছে অচেনা, অজানা। সম্পূর্ণ ঘটনাটিই ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। ধারণা করা হচ্ছে এর পরিকল্পনা চলেছে দীর্ঘদিন যাবত।

১৭ আগস্টে ব্যবহৃত সমস্ত বোমাই এসেছিল ভারত থেকে। সাতক্ষীরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে সে সমস্ত বোমা আনা হয়েছে বলে গ্রেফতারকৃত দু'ব্যক্তি তথ্য দিয়েছে। এখন বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সে বোমাগুলো কী ভারতে পলাতক মুজাহিদীন নেতারা পাঠিয়েছে, না সেটা অন্য আর কারো অপকর্ম। প্রশ্ন ওঠেছে যে, ৬৩টি জেলায় একযোগে এতবড় একটি বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো সাংগঠনিক শক্তি কী মুজাহিদীনের রয়েছে, না সেটি কোনো বিদেশী শক্তি দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। সে কারণেই বার বার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর নাম আলোচনায় আসছে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া এ রকমও অভিযোগ ওঠেছে যে, 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এরই সৃষ্টি। জামায়াতে ইসলামী সহ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তারা জামা'আতুল মুজাহিদীনকে সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে। ঢাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যে জানা গেছে যে, মুজাহিদীন-এর মূল তাত্ত্বিক ড. আসাদুল্লাহ গালিব এর তিনটি পাসপোর্ট ছিল। সে পাসপোর্ট ব্যবহার করা ছাড়াও তিনি অনেকবার গোপনে ভারতে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংগঠনের সূত্র মতে ড. গালিবের গোপন নেটওয়ার্ক রয়েছে ভারতে। সেখান থেকেই তিনি অর্থ ও অস্ত্র উভয়ই সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া গত কয়েক মাস যাবত এ সংগঠনের নেতারা এবং এমনকি এর বিদ্রোহী গ্রুপের নেতারাও সীমান্তের ওপারে আশ্রয় নিয়েছে।

ভারত সরকার, বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্প্রতি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যে, বাংলাদেশে সশস্ত্র সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদী কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন করতে হবে। নতুবা ভারতে তার কুপ্রভাব পড়তে পারে। ভারত বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান দেখতে চায়না। দেখতে চায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কী কারণে বাংলাদেশে এ অপকর্ম সংগঠিত হচ্ছে এবং বার বার অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে ? কারা বাংলাদেশে বোমাসহ অস্ত্র যোগান দিচ্ছে। আর উল্লিখিত সংগঠনের

www.pathagar.com

জঙ্গীবাদী নেতা কিংবা অন্যান্য অপরাধীরাই বা কীভাবে মাসের পর মাস ভারতে আশ্রয় পাচ্ছে। এ ব্যাপারেই ভারত সরকারের কী কিছুই করণীয় নেই ? না তারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, সব কিছুর মূলে রয়েছে অদৃশ্য ও মহাপরাক্রমশালী 'র'। অপরদিকে 'পাকিস্তান ডেইলী টাইমস' পত্রিকায় সম্প্রতি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার কঠোর দমনাভিযান না চালানো পর্যন্ত প্রধান প্রধান দাতাকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু করার জন্য ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ সে দেশের (ভারত) সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তানের আরও একটি পত্রিকা, 'পাক ট্রিবিউন' রিপোর্ট করেছে যে, ভারত এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও নেপালে বিদ্রোহী ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। পাক ট্রিবিউনে আর বলা হয়েছে, পাকিস্তান নেপালে মাওবাদী গেরিলাদের সমর্থন দিচ্ছে বলে রটানো হচ্ছে কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের এই অভিযোগ সত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে, পাকিস্তান নয়, ভারতই বাংলাদেশ ও নেপালে নাশকতামূলক ও বিদ্রোহী তৎপরতা চালাচ্ছে। পত্রিকাটি জানায়, এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের নীল নকশা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকেই ভারত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ভারত গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যমে নেপাল, শ্রীলংকা, ভূটান এবং অপর প্রতিবেশী দেশগুলোর সরকার সমূহকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় বলে অভিযোগ করেছে ট্রিবিউন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক আর আই চৌধুরী ১৭ আগস্ট সারা দেশে বোমা হামলার ঘটনায় বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তার পাশাপাশি গত বছর ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের গণ জমায়েতে সংগঠিত গ্রেনেড হামলার ব্যাপারেও ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠেছে। সে গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিশনই এমন ইঙ্গিত দিয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ এখন বলছে জঙ্গিদের দমনে ব্যর্থ হলে তারা সহ বিরোধী দলগুলো একযোগে আগামী জাতীয় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেবে। এ এক বিস্ময়কর বেড়াজাল। কোথা থেকে কী হচ্ছে তা বোঝা সত্যিই একটি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ অবস্থায় গত মঙ্গলবার লন্ডন হয়ে ভারত যাবার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে আটক করা হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক ও নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মুজাহিদীনের কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদকে। ১৭ আগস্টের বোমাবাজি ও তার অর্থায়নের ব্যাপারে তিনি জড়িত বলে অভিযোগ ওঠেছে। তিনি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠনের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা বলেও পরিচয় পাওয়া যায়। মওলানা ফরিদ সম্প্রতি তার একটি এনজিওর জন্য কুয়েত থেকে মোটা অংকের টাকা এনেছেন বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। সে টাকা তিনি কোথায় কিভাবে ব্যয় করছেন তা বিস্তারিতভাবে এখনও জানা যায়নি তবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া মওলানা ফরিদ আওয়ামী ওলামা লীগের

www.pathagar.com

উপদেষ্টা কিনা অথবা আগে সংগঠিত আর কোনো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না তাও এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে পূর্বেকার কমিউনিষ্ট পার্টির মতো ইসলামী দলগুলোতে একটি বিষয়ে অত্যন্ত মিল রয়েছে, তা হলো, কোনো নেতৃস্থানীয় মওলানা অপর মওলানা-মাশায়েখকে স্বভাবতই সহ্য করতে পারেননা। ফলে তাদের কাছে সহজেই অন্যের ব্যাপারে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, তা যত বিভ্রান্তিমূলকই হোক না কেন। সে কারণেই হয়তো মওলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ বলেছেন, বোমাবাজির সাথে জামায়াত নেতা নিজামীই জড়িত। তাকে রিমান্ডে নিলে সব খবর বেরিয়ে আসবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নিয়োজিত মওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে তার এতো ক্ষোভ বা উস্মা কেন ? একে অপরের প্রতি একই ধরণের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ড. গালিব এবং এমনকি শায়খ আবদুর রহমানও। সম্ভবত এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশী কোনো গোয়েন্দা বাহিনী এখন নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে সারা বাংলাদেশকে। এ ধরণের বহু অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের।

দেশব্যাপী বোমাবাজির সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ১৯৯৬ থেকেই এ ধরণের বিস্ফোরণের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয়ে আসছে। মাজার থেকে শুরু করে মসজিদ, গীর্জা, সিনেমা হল এবং জনসভায় পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ। আর সরকার ও বিরোধী দলগুলো এ ব্যাপারে শুধু একে অপরকে দোষারূপই করে যাচ্ছে। কোনো সরকারের আমলে সংগঠিত ঘটনারই আজ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে বহু কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলো কোনো কাজে আসে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের অতি দুর্বল গোয়েন্দা ব্যবস্থা ও তার অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন কর্মকর্তাবৃন্দ। অতীতে কোনো সরকারই দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন কোনো গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা গড়ে তুলেনি যা দলীয় রাজনীতি ও অন্যান্য স্বার্থের উর্ধ্বে। সবার উপরে দেশের নিরাপত্তা ও স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিআইএ, মোসাদ, 'র' কিংবা আইএসআই-এর মতো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলার আবশ্যকতাও কেউ বোধ করেছে বলে মনে হয়না। তাদের অনেকেই খবর রাখেনা যে বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল এখনও টিকে আছে তাদের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কারণে। ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশে যারা ক্ষমতার রাজনীতি করেন তাদের কেউ কেউ এতদিন 'র' কিংবা এমনকি সিআইএ-কে মনে করেছেন তাদের পরম আত্মীয় কিংবা বশংবদ।

বিশ্বব্যাপী এখন ক্রমশ দেখা যাচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য আধিপত্যবাদীদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (মোসাদ সহ) নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে দিচ্ছেনা। ধারাবাহিকভাবে বোমাবাজিসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে অস্থির ও অস্থিতিশীল করে রাখতে চাচ্ছে যাতে সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিদেশী বিনিয়োগ ও কোনো সমৃদ্ধি

www.pathagar.com

না ঘটে। এ দেশগুলো যাতে চিরদিনই দুর্বল, দরিদ্র, নতজানু ও তাদের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকে, সেটিই তাদের কাম্য। তবে আশার কথা যে, শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স ও পুলিশের বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগকে এখন যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্রতী হয়েছেন। সেজন্য অবশ্যই চাই প্রচুর অর্থ, প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং সর্বোপরি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা, দক্ষতা ও দেশপ্রেম। নতুবা এ অর্থ একদিকে যেমন বিফলে যাবে, অপরদিকে দেশী-বিদেশীদের চক্রান্ত ও বেচা-কেনার পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে।

গুজবে শোনা যায়, ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহল, এনজিও এবং বিশেষ করে গণমাধ্যমে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অসামান্য প্রভাব রয়েছে। অতি সহজে এদের মাঝে অনেককেই কেনা যায়। অনেকে আবার নিজের ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থে বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করতে দ্বিধাবোধ করেনা বলেও অভিযোগ ওঠেছে। তারা মনে করে তাদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। এ বিষয়ে সরকারকে সর্বাধিক ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবেনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা নিজেদেরকে অত্যন্ত বিচক্ষণ মনে করে কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেলে বুঝতে পারে তারা কত দুর্বল এবং অসহায়। তাছাড়া কত অরক্ষিত ও অনিরাপদ তাদের হাতে দেশের জনগণের জান-মাল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সার্বিক অবস্থা। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখেই এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে সামনে এগুতে হবে। নতুবা অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশের মতো এ দেশটিও বিভিন্ন সংঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। মালয়েশিয়ার কথা ভেবে স্বস্তি পাবার কিছু নেই। কারণ মালয়েশিয়ার পাশে কারা রয়েছে সেটিও দেখতে হবে। আজকের বিশ্বে কোনো খ্রীষ্টান প্রধান দেশে কোনো অস্থিরতা নেই। ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল এবং হিন্দু প্রধান দেশ ভারত পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাথে যোগ দিয়েছে তাদের বহুমাত্রিক স্বার্থের কারণে। কিন্তু যত সমস্যা হচ্ছে এখন মুসলিম প্রধান দেশসমূহে।

ফিলিস্তিন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, মিশর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ ছাড়াও আফ্রিকার এমন কোনো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নেই যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীরা পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা জিঁইয়ে রাখছেনা। এর অন্যতম প্রধান কারণ তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সাথে ইসলামিক নীতি-আদর্শের কিছু অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। এরপরও মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের ও স্বার্থের প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জাতীয় উন্নয়ন কিংবা সমৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু তার জন্য চাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেদের আভ্যন্তরীন আইন-শৃঙ্খলা, জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে যারা

www.pathagar.com

সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতার রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে একটি গভীর সমঝোতার প্রয়োজন। শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ইজরাইল এবং ভারতেও রয়েছে। তবে তারা জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে এক ও অভিন্ন। এ বিষয়টি আমাদেরকে বুঝে দেখতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সংগঠনগুলোকেও এ বিষয়টি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। নতুবা তারা আগুন থেকে আগুনের পাত্রে পড়ে দগ্ধ হয়ে যাবে। তাদের দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত ফসল নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোই ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। কারণ দেশপ্রেম মুসলমানের ঈমানের অঙ্গ। দেশকে ধ্বংস করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। তাছাড়া 'ইসলামী বিপ্লব' একটি মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়। এটি বন্দুক, কামান ও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সংগঠিত হতে পারেনা। তার জন্য চাই ইসলামী শিক্ষা, মূল্যবোধ, ঈমান ও আমল। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ, যারা মুসলমান, তাদেরকে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। নতুবা ইসলাম অপতৎপরতার শিকার হবে বাংলাদেশে আফগানিস্তান ও শেষ পর্যন্ত ইরাকের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। সেদিকে ঠেলে দেয়ার জন্যও অনেকে এখন আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

www.pathagar.com

বিস্ফোরণ নাটকের অন্তরালে প্রকৃত নায়ক কারা ?

নয়া দিগন্ত, ২০ আগস্ট, ২০০৫

দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে আর যাই হোক ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম কারও ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। এটা শিক্ষা ও গভীর উপলব্ধির বিষয়, জীবনাচরণের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। গত বুধবার দেশব্যাপী যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তাতে ক্ষমতার রাজনীতি যারা করে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, এতে হতাহত হয়েছে দেশের অতি সাধারণ মানুষ। সে সন্ত্রাসী ঘটনার পর দেশব্যাপী নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রতিষ্ঠান জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ-এর যে লিফলেট ছড়ানো হয়েছে সেটা নিয়েও এখন অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এটা কী সত্যিই তাদের কাজ, না তাদের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে ? সন্দেহ অমূলক নয় কারণ জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ, এতবড় প্রতিষ্ঠান নয় যে দেশব্যাপী এ ঘটনা ঘটানোর মতো তার বিশাল নেটওয়াক রয়েছে। অপরদিকে এমন ধারণাও রয়েছে যে, কোনো বিদেশী শক্তি কাউকে দিয়ে এ অপকর্মটি সংগঠিত করেছে। আবার এমনও বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে ধর্মীয় সন্ত্রাস ও মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কিত অভিযোগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো একটি বড় দল এটি ঘটিয়েছে। তাছাড়া প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্য কি না জানিনা, আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত ফেনীর "গডফাদার" জয়নাল হাজারীকে নিয়েও সাজানো হয়েছে বোমা হামলার ওপর এক সরস কাহিনী। দেশব্যাপী এ সমস্ত ঘটনাবলী, অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ এবং তার বিভিন্ন দিকা নিয়ে এখন চলছে বহুমুখি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

গত বুধবার সকাল সোয়া ন'টায় এক রাষ্ট্রীয় সফরে চীনের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি বাংলাদেশের আকাশসীমা পার হওয়ার কিছুটা আগে বা পরে ঘটেছে এ বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান চীন সফর আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার এ সফরের সময় চীনের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের তিরিশ বছর পূর্তি উৎসব আয়োজন করা হয়েছে বেইজিং-এ। চীন আমাদের একটি অত্যন্ত পরীক্ষিত বন্ধু দেশ। আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতি নির্ভরযোগ্য এক সহযোগী দেশ। বুড়িগঙ্গার ওপর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং সামরিক ও অসামরিক বহু ক্ষেত্রেই চীন আমাদের সাথে রয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সফরের সময়ও চীনের সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা। বাংলাদেশের গ্যাস, বিদ্যুৎসহ জ্বালানি খাত, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা, বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সঙ্গে চীনের কুনমিং শহরের সংযোগ বৃদ্ধি সহ পর্যটন, কৃষি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনার কথাও আগে থেকেই বলা হয়েছিল। তাছাড়া চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়েও আলাপ আলোচনার কথা আছে। আমাদের বস্ত্র ও তৈরী পোষাক খাতে চীনের সহযোগিতা ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কথা এ সফরের সময়। সুতরাং এতবড় একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে ম্লান করে দেয়ারও একটি বিষয় জড়িত রয়েছে দেশব্যাপী সে বোমবাজির সাথে।

বাংলাদেশ ও চীনের বর্তমান বন্ধুত্বের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠার কথা অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কার্যক্রম। সেটি বাধাগ্রস্ত করার জন্যই কী ষড়যন্ত্রকারীরা ঠিক এ সময়টি বেছে নিয়েছে ? তাছাড়া সামনে সার্ক সম্মেলন। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যাতে এ দেশে আর কোনো সাফল্যজনক অধ্যায়ের সূচনা করতে না পারে সে জন্যই কী এ নাশকতামূলক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ? এ সমস্ত প্রশ্নই এখন দেশের সকল রাজনীতি সচেতন মানুষের মুখে মুখে। শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষ গত বুধবারের ঘটনায় দেশের ভবিষ্যত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ারই কথা। কারণ এ ধরণের ব্যাপক সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে তাদের ভবিষ্যত আয়-উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মাঝে ধাপে ধাপে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশাল জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত করে তোলা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে যখন একটি জাতি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায় কারা, সেটি বুঝতে হবে। কোনো কিছু না বুঝেই সব কিছু তথাকথিত মৌলবাদীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া নয়া সাম্রাজ্যবাদী এবং আধিপত্যবাদীদের কাজ। তারাই আজকের বিশ্বকে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে খন্ড বিখন্ড করছে। তাই ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বিস্ফোরণ একটি উগ্র মৌলবাদী ঘটনা, এটি শুনলে তো তাদের খুশী হবারই কথা। তাহলে একটি উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে তাদের অনেক সুবিধা হয়। এবং এর পথ ধরে ধর্ম নিরপেক্ষতার স্লোগান দিয়ে কারো কারো রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার পথটিও মোটামুটি প্রশস্ত হয়ে যায়।

গত বুধবার সকালে দেশব্যাপী ঘটে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে ক্ষমতাসীন বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন জোটের জামায়াতে ইসলামী দল ও ইসলামী ঐক্য জোট। তারা ঢাকার মুক্তাঙ্গণ ও পল্টনের মোড়ে আলাদা আলাদাভাবে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তীব্র প্রতিবাদের ঝড়

www.pathagar.com

ওঠেছে দেশব্যাপী। এ ঘটনায় যেমন মর্মাহত হয়েছে দেশবাসী তেমনি আবার তাদেরকে প্রতিবাদেও মুখর হতে দেখা গেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান এবং বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনাও তীব্র সমালোচনা করেছেন এ ঘটনার। তিনি এক্ষেত্রে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও নানান প্রশ্ন তুলেছেন। গত বৃহস্পতিবারের সমস্ত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ঘটনা ঘটার পর থেকেই বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলো এ সন্ত্রাসী ঘটনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যখন একটি সহনশীল পর্যায়ে উপনীত, বিদেশ থেকে আসা শুরু হয়েছে আশাব্যঞ্জক বিনিয়োগের প্রস্তাব এবং দেশে উন্নয়নমূলক কাজে সঞ্চারিত হচ্ছিল একটি উল্লেখযোগ্য গতি তখন কারা এমন ঘটনা ঘটাতে পারে সেটি নিয়ে দেশব্যাপী নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তারই আলোকে ১৪-দলীয় বিরোধী জোটের ৩১-দফা সংস্কার প্রস্তাব এবং আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও বর্তমানে নানা রকম কথাবার্তা উঠতে শুরু করেছে। তবে বুধবারের সে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে ওঠছে যে, এ ধরণের জাতীয় স্বার্থ ও গণবিরোধী কার্যকলাপের কাছে মাথা নত করা যাবে না, এর প্রতিরোধ করতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বক্তব্য ও বিবৃতির মধ্য দিয়েই এখন তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ, র‍্যাব, ডিজিএফআই ও এনএসআই'এর ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন তীর্যক প্রশ্ন তুলেছেন। সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশ্লেষকরা দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে পুনর্গঠন, তাদের জনবল বৃদ্ধি ও যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নাশকতামূলক ঘটনাকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে প্রতিহত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তদন্ত, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে নাগরিক ও বিশেষভাবে রাজনীতিকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এ ঘটনায় বিশ্বের বড় বড় দেশ নিন্দা জানিয়েছে। সুতরাং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও শক্ত হাতে সন্ত্রাস দমনে বাধা কোথায় ? এ মুহূর্তে প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতির। সর্বত্র সার্বক্ষণিকভাবে সচেতন ও সজাগ থাকার। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন, সবার উর্ধ্বে দেশের স্বার্থ। সেখানে রাজনৈতিক আলোচনা ও সমঝোতার প্রয়োজন, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নয়। এ মুহূর্তেই যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মূল উৎসগুলো বের করে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, তা যত অপ্রিয়ই হোক। এ দেশের মানুষ বাংলাদেশকে একুশ শতকে পৌঁছে একটি আয়ারল্যান্ড কিংবা ইরাকে পরিণত করতে দেবে না। তারা চায় সমস্ত মূল্যবোধকে অক্ষত রেখেই একটি অগ্রসরমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

একজন সামরিক (সাবেক) বিশ্লেষক ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এ ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সেদিন বলেছেন, এ ঘটনায়

www.pathagar.com

আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। বাংলাদেশে এতদিন ছোটখাট যত ঘটনাই ঘটেছে তাতে আন্তর্জাতিকভাবে ততটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরী করেনি। উপুর্য্যপরি কোনো প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস কিংবা সর্বগ্রাসী বন্যাও কোনো দেশের এত বড় ক্ষতি সাধন করতে পারেনা, যা একযোগে বুধবারের বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে। সেটা বাদ দিলে এর একটি উল্লেখযোগ্য দিকও রয়েছে। সে ঘটনায় তেমনভাবে জনমানব কিংবা সম্পদ বিনষ্ট হয়নি তবে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মাঝে এমন এক প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে গণবিরোধী শক্তিকে আর সহজভাবে নেয়া যাবেনা। যে কোনো প্রকার অপশক্তি, তা সশস্ত্র সন্ত্রাসী, উগ্র মৌলবাদী, তথাকথিত মাওবাদী, যা-ই হোক না কেন, তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। যে কোনো মূল্যে বিধান করতে হবে দেশবাসীর জান ও মালের নিরাপত্তা, নিশ্চিত করতে হবে উন্নয়ন, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও অগ্রগতির ধারা। এ অবস্থায় দেশের মানুষ আর রাজনীতিকদের পরস্পর দোষারোপ শুনতে চায়না। চায় প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কোনোমতেই দেশের সর্বনাশ করা যাবেনা। দেশ এবং জাতির স্বার্থ সবার উর্ধ্বে। ১৭ আগস্টের ঘটনা সকল অপকর্ম, অপশক্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের মূলোচ্ছেদ করার যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা কোনমতেই হাতছাড়া করা যাবেনা বলে দেশব্যাপী দাবী ওঠেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হবে দেশকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া, ষড়যন্ত্রের কাছে পরাস্ত হওয়া, ধর্মান্ধতা, উগ্রমৌলবাদ এবং অপরদিকে ছদ্মবেশী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। দেশের অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে ঢাকাস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের নাক গলাতে দেয়া ঠিক নয়। কারণ তারা দেশের প্রকৃত অবস্থা না বুঝেই অনেক সময় কথা বলে।

গত বুধবারের ঘটনায় এ দেশের অধিকার সচেতন মানুষ তাদের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়নি, এ কথা যারা বলে তারা এখনো কাকের মতো ঘরের চালে চোখ বুজে রুটি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এ দেশের ৬৪টি জেলার ৬৩টিতে একযোগে এমন নাশকতামূলক ঘটনা ঘটলো অথচ এ দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ কিছুই জানলো না, এটা তো হতে পারেনা। এমন ব্যর্থতা বরদাশত করা যায়না। সরকারের কাছে এ ব্যাপারে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছে সর্বস্তরের মানুষ। সকল প্রকার সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে সৌদি আরবের মতো দেশও আজ যেখানে খড়গহস্ত সেখানে আমাদের অবস্থান আমাদেরকেই নির্ণয় করতে হবে। যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। এটি আমাদের কাছে এখন এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

আধিপত্য নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চাই

নয়া দিগন্ত, ১৩ আগস্ট, ২০০৫

স্বাধীনতার গত প্রায় ৩৪ বছরে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমে ওঠেছে নানা সমস্যা। সীমান্ত সংঘর্ষ ও সমস্যা ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ ঘাটতি, পানি বন্টন সংক্রান্ত জটিলতা ও অভিন্ন নদীতে ভারতের সংযোগ খাল খনন ও বাঁধনির্মাণের পরিকল্পনা, চোরাচালান ও অবৈধ কার্যকলাপ দমন এবং অপরাধীদের বিনিময় চুক্তি থেকে শুরু করে অনেক কিছুই দেখা দিয়েছে যা আমাদের উভয় দেশের স্বার্থেই অবিলম্বে সমাধান হওয়া উচিত। সে আলোকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে নটবর সিং এবং পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম সরণ-এর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাদের এ সফরে হয়তো আমাদের অনিষ্পন্ন ইস্যুর কিছুই সমাধান হয়নি তবে ইস্যুভিত্তিক প্রায় সকল আলোচনারই পথ উন্মুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষে এতদিন ভারতের সাথে এক টেবিলে বসাই সম্ভব হয়নি। অথচ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের ফলে এখন একে একে পর্যায়ক্রমে ঢাকায় আসছেন ভারতের পানি সম্পদমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী কমলনাথ এবং জ্বালানীমন্ত্রী মনি শঙ্কর আইয়ার। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া নটবর সিং-এর সফরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সমস্যার ক্ষেত্রে আলোচনার যে অঘোষিত অচলাবস্থা অপসারিত হলো তা এখন সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে অর্থাৎ দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সমঝোতার পথ উন্মুক্ত করেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বাংলাদেশের বর্তমান জোট সরকারের জন্য এটি একটি অসাধারণ কূটনৈতিক সাফল্য বলে অনেকে মনে করেন।

গত এপ্রিলের শেষের দিকে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়া সংহতি সম্মেলনের বাইরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উত্তেজনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংয়ের সাথে জরুরী ভিত্তিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান সাক্ষাৎ করেন। তিনি দু'দেশের মাঝে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানান অচলাবস্থার কথা তুলে ধরে সেগুলোর আশু সমাধান কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিংকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় বসে সীমান্তে উত্তেজনা সহ দু'দেশের মাঝে তিক্ততার বিষয়গুলো সমাধান করার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী তখনই আশা প্রকাশ করেছেন যে, দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যকার আলোচনার ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ড.

www.pathagar.com

সিং দুই দেশের মধ্যকার উষ্ণ সম্পর্ক বহাল রাখার ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া মোরশেদ খানও ভারতের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে জানিয়েছেন।

গত তিন মাসে দু'দেশের পররাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং-এর এ সাম্প্রতিক সফর ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। দু'দেশের মাঝে বাণিজ্যের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হলেও ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্য বাংলাদেশের রপ্তানীকারকরা যে ১শ' ৩৩টি পণ্যের একটি তালিকা দিয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলেননি নটবর সিং। তাদের সে তালিকা থেকে কতগুলো পণ্য ভারত গ্রহণ করতে পারে তারও কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। দু'দেশের মাঝে বিরাজমান বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশ শুল্ক বহির্ভূত যে সমস্ত বাধাগুলোর কথা উল্লেখ করেছে তা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সফরের সময় আলোচিত হতে পারে বলে নটবর সিং উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে, দু'দেশের মাঝে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি এখন আলোচনার প্রয়োজন নেই। বহুপক্ষীয় কিংবা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির চেয়ে এ মুহূর্তে বিরাজমান দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায়ই বাণিজ্য বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। বাংলাদেশের পণ্যের জন্য এ মুহূর্তে ভারত তার সকল সীমান্ত খুলে দিলেও আমাদের যে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের তালিকা বর্তমানে রয়েছে তাতে ভারতে তিনশ' থেকে চারশ' মিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানি সম্ভব নয়। অপরদিকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সরকারীভাবেই দেখানো হচ্ছে দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৫০ কোটি ডলার)। এ বিশাল ঘাটতি অন্যভাবে মিটাতে হবে। তার জন্য চিন্তা-চেতনা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রয়োজন।

ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার দেশে মিয়ানমার থেকে গ্যাস নেবার ব্যাপারে ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা চেয়েছেন। আমাদের অর্থ মন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে এ ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনের সাথে একমত পোষন করেছেন। তবে তার বিনিময়ে ভারতের ভেতর দিয়ে নেপালের সাথে করিডোর এবং ভারত, নেপাল ও ভূটানের বিদ্যুৎ গ্রিড লাইনে সংযোগ চেয়েছেন। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত দুটি শর্ত পূরণ করা ভারতের পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। কিন্তু নটবর সিং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছুই বলেননি। বাংলাদেশীদের ভারতে অনুপ্রবেশের একটি অভিযোগ অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতা এল কে আদভানি সম্প্রতি যথেষ্ট হৈ চৈ করেছেন তাদের লোকসভায়। ভারতে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ নাকি তাদের

www.pathagar.com

নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও এ অভিযোগ তুলেছেন। তাছাড়া প্রায় দুই কোটি বাংলাদেশী অবৈধভাবে ভারতে অবস্থান করছে বলে আদভানি যে অভিযোগ তুলেছেন তা অত্যন্ত গুরুতর। বাংলাদেশ এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও ভারত বার বার তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এ কথা ঠিক যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে বেশ কিছু বাঙালী হিন্দু ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে চলে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যেও নাকি কেউ কেউ রয়ে গেছে ভারতে। ভারতের কতিপয় নেতৃবৃন্দ এখন সে সমস্ত মানুষের সাথে আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জেলা কাছারের অধিবাসী কিংবা অন্যান্যদেরকেও এক করে ফেলছেন। এটি তাদের এক নতুন রাজনৈতিক জিগির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধান তাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।

নদ-নদীকে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, মৎস্য চাষ, ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাণ সঞ্চালনকারী শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের সাথে ভারতের রয়েছে ৫৩টি অভিন্ন নদী যার উৎপত্তি ভারতের বাইরে। এ অবস্থায় ভারত যে নদী-সংযোগ মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ ক্রমশ একদিন মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সেচের পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য ভারত তার অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে যা-ই করুক তাতে বাংলাদেশের আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু অভিন্ন নদ-নদী যা 'আন্তর্জাতিক' বলে আখ্যায়িত, তাতে সংযোগ খাল খনন কিংবা তাদের ওপর যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটানোর অধিকার তাদের নেই। অথচ অভিন্ন নদ-নদীতে সংযোগ খাল কিংবা বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারত সবসময় একই কথা বলে যাচ্ছে যে, "এগুলো এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। সেখানে কিছু করতে হলে বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ করা হবে।" অভিন্ন নদ-নদীর ক্ষেত্রে এ যুক্তি কার্যকর হতে পারেনা। কারণ এ গুলো শুধু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান অভ্যন্তরীণ নদ-নদী নয়। এসব নদ-নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতোমধ্যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারত উজানে প্রায় দুই শতাধিক ড্যাম নির্মাণ করে বাংলাদেশে সারা বছর প্রবাহমান নদ ব্রহ্মপুত্রের পানি সরিয়ে নেওয়ার একটি মহা পরিকল্পনা করেছে। অপরদিকে বরাক সহ অন্যান্য বাঁধ নির্মাণের কাজও নীরবে-নিভৃতে এগিয়ে চলছে। অথচ তারা বলছে সবই পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে আলোচনা না করে কিছুই করা হবেনা। সে কারণেই এখন সারা দেশব্যাপী দাবী উঠেছে যে অভিন্ন নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ কিংবা সংযোগ খাল খনন করা যাবে না। তেমন ধরণের সমস্ত পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পন্ন করে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে অগণিত পলাতক অপরাধী। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত তাদের ফিরিয়ে

www.pathagar.com

দিচ্ছেনা। উপরন্তু, বার বার পাল্টা অভিযোগ করছে যে, বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তৎপর। তাছাড়া বাংলাদেশে রয়েছে আল-কায়েদা, তালেবান ও মৌলবাদীদের ঘাঁটি। এগুলো ভারতে "কাউন্টার অফেনসিভ"। একই ভিত্তিহীন কথা বার বার বলে যাওয়া। এর অবসান হওয়া জরুরী। অপরাধী বিনিময় চুক্তির সাথে সাথে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য মৌলবাদের ঘাঁটি কিংবা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যক। নটবর সিং বলেছেন, 'ভারতের স্বার্থেই বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক হতে হবে।' ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভালো করেই জানেন, বাংলাদেশ কোনো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। এখানে বাবরি মসজিদের মতো কেউ মন্দির ভাঙেনি কিংবা গুজরাটের মতো কখনো দাঙ্গা ঘটেনি। এখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান যথেষ্ট শান্তি সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে যে অপপ্রচার চালায় না তা নয়। এ দেশের গণমাধ্যমের একটি অংশও এ কাজে লিপ্ত রয়েছে। তারা কাদের স্বার্থ হাসিল করছে জানিনা। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই ধর্মপ্রাণ, সাম্প্রদায়িক নয়। সে হিসেবে ভারতকেই বরং 'হিন্দুত্বের ভূত' কাঁধ থেকে নামিয়ে অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বাধীন জাতীয় প্রগতিশীল জোটকে সাম্প্রদায়িক আরএসএস ও তার গণসংগঠন বিজেপিকে সামলাতে হবে। নির্বাচনে ভোট পাবার জন্য সব অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করা চলবেনা। তাছাড়া বিনা উস্কানীতে সীমান্তে বাংলাদেশী নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করা যাবেনা। গত তিন বছরে সীমান্তে ৪১৮ জন নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ। তার কোনো বিচার হয়নি। সুতরাং স্থায়ীভাবে ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার অনিষ্পন্ন সীমারেখা নির্ণয়, অনির্ধারিত স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণসহ সকল সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে হবে। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ও তার জনগণকে সমতার ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। নতুবা বড় দেশের স্লোগান দিয়ে কোনো কিছুই ফলপ্রসূ হবেনা। কারণ গণচীন সবদিক দিয়ে ভারতের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বড় ভাই সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি বা দাদাগিরির কোনো স্থান নেই।

সাম্প্রতিক আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ বলেছেন, 'আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন করেছি এবং আমাদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাব।' বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ও অধিকার সচেতন মানুষ তা বিশ্বাস করে। সে মনোভাব থেকেই দেশের জনগণ এখন তাকিয়ে আছে ভারতের মন্ত্রীদের আসন্ন সফরের দিকে। তাছাড়া সম্ভবত এ বছরের শেষ-নাগাদ দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হবে। এর মাঝে রয়েছে দু'বার পিছিয়ে যাওয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের ঢাকা শীর্ষ সম্মেলন। সুতরাং বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে জমাট বরফ এতদিনে গলতে শুরু করেছে তা যেন সকল অবস্থায় বন্ধুত্বের, ভ্রাতৃত্বের ও সত্যিকার সৎ প্রতিবেশিসুলভ সহযোগিতার ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয় সেটাই এ দেশের মানুষের কামনার বিষয়। তারা আধিপত্য নয় বন্ধুত্ব চায়।

www.pathagar.com

আগামী নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত

নয়া দিগন্ত, ৩০ জুলাই, ২০০৫

গত ২৩ জুন ছিল আওয়ামী লীগের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৪৯ সালের এ দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে আত্মপ্রকাশ করেছিল এ যুগান্তকারী এবং সংগ্রামী দলটি। সে উপলক্ষে শুরুতেই এ দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ দেশের বহু ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের পথিকৃৎ মওলানা আবদুল হামিদ খানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তার সাথে সাথে স্মরণ করছি এ মহান নেতার অন্যান্য সংগ্রামী সহকর্মী ও অনুসারীদের, যাদের অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষার রক্তাক্ত ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

জন্মলগ্নে আওয়ামী লীগের প্রথম মেনিফেস্টো রচনা করেছিলেন মরহুম শামসুল হক। পরে ১৯৬৪ সনের মার্চ, ১৯৬৬ সনের মার্চ এবং ১৯৬৭ সনের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন সমূহে গৃহীত সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে দলের "নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা" প্রকাশিত হয়, যা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। সে ঘোষিত নীতিতে বলা হয়েছে, "আওয়ামী লীগ একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করে যে জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিই তাহাদের নিজ কার্যকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট সর্বতোভাবে দায়ী হইবে। সরকার হইবে 'পার্লামেন্টারী' ধরণের, যাহাতে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন সভা হইবে সার্বভৌম।"

সংসদীয় পদ্ধতির রাজনীতিতে বিশ্বাসী একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজকের আওয়ামী লীগের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানকে সংশোধন করে '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারীতে বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ এ দেশে একটি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা এ দেশের সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেনি। তাই তারা সে পদ্ধতিকে কোনো বাহিনী দিয়েই ধরে রাখতে পারেনি। তাছাড়া রাজনীতিতে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে তাদেরকে। পরবর্তীতে পরিবর্তিত অবস্থায় অর্থাৎ এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান ঘটলে, ১৯৯১তে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে অপেক্ষাকৃত তরুণ দল, বিএনপি। তখন বিরোধী দলে থেকে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও জনগণের অধিকারকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত

www.pathagar.com

করার লক্ষে সম্পূর্ণভাবে সংসদীয় পদ্ধতি পুনরায় চালু করার জন্য দাবী উত্থাপন করতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তখন জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করার বৃহত্তর লক্ষেই সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী এনে বাংলাদেশে আবার সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করেন।

তখন থেকেই আওয়ামী লীগ আবার তার জন্মলগ্নে ঘোষিত নীতিতে ফিরে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হলেও আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেই কথায় কথায় সংসদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং অধিবেশন বর্জন করাকে এ দলের আন্দোলন কিংবা দাবী আদায়ের একটি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। এ বিষয়টি এখন সংসদীয় রাজনীতির বিকাশ, ধারাবাহিকতা এবং এমনকি কার্যকারিতার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে জয়-পরাজয় মেনে নেওয়াটাই গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত এবং বিধান। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলও সরকারের একটি অংশ। কারণ তার গঠনশীল ভূমিকার ওপর এ পদ্ধতির সার্থকতা এবং জনগণের স্বার্থ অনেকখানি নির্ভর করে। এ অবস্থায় এ দেশের একটি সর্বপ্রাচীন সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। এটিই এ দেশের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কারণ আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা এক সময় গর্ব করেই বলতেন যে তুলনামূলকভাবে সংসদীয় রাজনীতিটা তারাই ভালো বোঝেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পূর্ব থেকেই তাদের আচরণে এ ক্ষেত্রে জনমনে বেশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট জামাত না আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীর 'ব্রেইনচাইল্ড', সে বিতর্কে আমি যাবনা। তবে এতটুকুই বলবো যে, ১৯৯৫-৯৬তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও আওয়ামী লীগ সংসদের বাইরে থেকেই করেছে। এবারও অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট "তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার"-এর যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে তাও তারা সংসদের বাইরে থেকেই আদায় করতে চায় বলে জনগণের বিশ্বাস।

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন যে, ১৯৯৬ সালে তারা যেমনি সংসদের বাইরে থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবারও তেমনি "তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার"-এর ৩০-দফা দাবী রাজপথে আন্দোলন করেই অর্জন করবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবী যা-ই হোক, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত যে সমস্ত দাবী তারা দিয়েছেন, তা কোনোমতেই সংসদে বসে সংবিধানে সংশোধনী আনা ছাড়া সম্ভব নয়। দাবী তাদের অথচ তারা সংসদে গিয়ে এ ব্যাপারে তার যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক করবে না, এটা তো হতে পারে না। বিচার পেতে হলে তো আদালতে যেতেই হবে। ঘরে বসে বিচার পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফোরাম রয়েছে। গায়ের জোর খাটিয়ে সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুরের মাধ্যমে দেশের সম্পদ ধ্বংস করা অপরাধমূলক কাজ। এগুলো গণতন্ত্রের হাতিয়ার নয়। তাছাড়া আজকাল এতে

www.pathagar.com

কোনো দাবীও আদায় হয়না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাষা ও কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। এ বিষয়টি যদি ড. কামাল হোসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ও সংবিধান প্রণেতা এবং তার রাজনৈতিক মিত্ররা না বুঝেন, তা হলে এ জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু সম্প্রতি বলেছেন, ক্ষমতায় থাকতে সংস্কার না করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। তাই এখন তাদেরকে খেসারত দিতে হচ্ছে। অভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে আওয়ামী লীগ নাকি সে ভুলই এখন শোধরানোর চেষ্টা করছে। এর জবাবে সমালোচনা করে একটি পত্রিকা লিখেছে যে, আওয়ামী লীগের সব উপলব্ধিই ঘটে বিরোধী দলে গেলে। কারণ ক্ষমতায় গেলে তারা বিভিন্ন কর্মকান্ডে এতই লিপ্ত হয়ে পড়ে যে তাদের চোখে আর কিছু ধরা পড়ে না, মাথা কাজ করেনা। এখানে আরও একটি মর্মন্তুদ বিষয় হচ্ছে যে, ৫৬ বছরের প্রবীণ রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যদি বলেন, অকার্যকর সংসদে ৩০-দফা সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় তারা রাজি নন, আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজপথে দাবি আদায় করবেন তাহলে সংসদ কী কারণে অকার্যকর হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা বলেছেন, সরকার যদি সংস্কার প্রস্তাব মেনে না নেয় তাহলে তাদেরকে মানতে বাধ্য করা হবে। তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে একটি রাজনৈতিক সংঘাত অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। এতে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি, সম্পদ বিনষ্ট, উৎপাদন বিঘ্নিত এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভূলুণ্ঠিত হবে। জনগণ এবং দেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন, তাতে জনগণের কিছুই আসে যায় না। এগুলো সবই রাজনীতিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নিছক স্বার্থপরতা ছাড়া জনগণের কাছে আর কিছুই মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোটের ৩০-দফা নিয়ে সরকারী দলের কয়েকজন নেতা বলেছেন, জনগণের একাংশের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো দল বা গোষ্ঠি তাদের কোনো দাবীকে নীতিগতভাবে জনগণের দাবি বলে চালিয়ে দিতে পারেনা। সেটি প্রমাণ করতে হলে গণভোটের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া তারা আরও অভিযোগ করে বলেছেন যে, কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ও ইস্যু না থাকায় এখন জনগণকে বিভ্রান্ত করতেই মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবী করেছে বিরোধী দল। ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক ইস্যুর সমাধান এখন চায় না দেশের মানুষ। কারণ মানুষ এখন অনেক বৈষয়িক এবং বৈশ্বিক হয়ে পড়েছে। তাই জনগণ কারও দলীয় দাবী আদায়ের জন্য বসে নেই। বিরোধী দলের কোনো দাবি বা সংস্কার প্রস্তাব থাকলে তারা সংসদে এসেই তা উত্থাপন করতে হবে। রাজনৈতিক ইস্যুর সমাধান ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিতে হবেনা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আওয়ামী লীগ একটি সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী দল। সংসদে আসতে তাদের ভয় কিসের ? নিজেরা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ না করে যারা সংসদকে অচল বা অকার্যকর আখ্যায়িত করে, সংসদীয় রাজনীতির জন্য তারা কতটা উপযোগী সেটি নিয়েই এখন প্রশ্ন

www.pathagar.com

উঠেছে। কথা উঠেছে, তবে কি আগামী নির্বাচনে নিজেদের ভরাডুবি টের পেয়েই আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা এখন নির্বাচন বর্জন করার ছুতো খুঁজছে?

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের জটিল বিষয়গুলো বাদ দিলে নির্বাচন কমিশন সংস্কার নিয়ে কারও কোনো আপত্তি নেই। সরকারী দলের নেতারা নিজেরাই বলেন যে, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও কারচুপিমুক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে এবং সব ফাকফোকর বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত, অর্থ ও আইনের দিকে থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সকলেরই কাম্য। এ অবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সংলাপ প্রত্যাখ্যান করে নতুন আরেক সমালোচনার মুখে পড়েছে আওয়ামী লীগ। ভোটার তালিকা নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সংলাপে একটি বড় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কিছুই হারানোর ছিলনা। এতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক কাজের শুভ সূচনা হতে পারতো বড় দলগুলোর সাথে। খবরে জানা গেছে যে, এ পর্যন্ত ১১১টি রাজনৈতিক দলের সন্ধান পেয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির মতো বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন যে পরামর্শ পাবে অন্যদের কাছে তো তা আশা করা যাবে না। সে কারণে যারাই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদীয় নির্বাচনে বিশ্বাস করে এবং তা নিশ্চিত করতে চায়, এক পর্যায়ে তাদেরকে তো নির্বাচন কমিশনেই যেতে হবে। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটি হচ্ছে একটি সংবিধিবদ্ধ সাংবিধানিক পদ। এটি অস্বীকার করা যাবে না। কারণ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদকেও বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তার নিয়োগকে মেনে নিতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের খুঁজে পাওয়া নামসর্বস্ব অন্যান্য দলগুলোর মতো নয়। উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগ একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে গত অর্ধ শতাধিক বছর যাবত অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সুতরাং এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, অবদান ও দায়-দায়িত্ব নামসর্বস্ব কোনো দলের সাথে তুলনা করা অন্যায় হবে। আওয়ামী লীগের নেতাদের ভাষায় এটি এখন একটি জনগণের প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কারণ এদেশে পঞ্চাশোর্ধ এমন খুব কম ব্যক্তিই আছে যে আওয়ামী লীগ কিংবা তার কোনো না কোনো অঙ্গ সংগঠনের সাথে একদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলনা। ১৯৫৪ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট ২২৮টি আসন দখল করে। তারমধ্যে নব গঠিত আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছিল ১৪৩টি আসন। ১৯৭০ এ অনুষ্ঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দুটি বাদে

www.pathagar.com

সব কটি আসনই লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানের কিংবা বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আওয়ামী লীগ একটি উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজকের আওয়ামী লীগকে কেন সংসদ বর্জন করে রাজপথে আশ্রয় নিতে হবে আসনের জন্য।

এরই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের আজকের অবস্থানের পর্যালোচনা করতে হবে এবং ব্যর্থতার কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। '৫৪, কিংবা '৭০-এ আওয়ামী লীগ ছিল এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। আজ তারা আর সে অবস্থানে নেই। সে ব্যর্থতার কারণগুলো তাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। অভিযোগ উঠেছে, আজকের আওয়ামী লীগ অন্যান্যের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে, পানি ও নদী সংযোগ নিয়ে, ভারতের সাথে বাণিজ্য অসমতা প্রসঙ্গে এবং বাংলাদেশের প্রবাসীদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলেনা। বিদেশে গিয়ে দেশের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি বিরোধী কথাবার্তা বলে নিজের জন্যই বদনাম কামিয়েছে আওয়ামী লীগ, তাতে অন্যদের এ পর্যন্ত তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

এ অবস্থায়, অনেকের মতে, রাজনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করতে হবে আওয়ামী লীগকে। জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করার এবং সংসদীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব বোধ হয় সর্বপ্রাচীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগেরই সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে জড়িয়ে আছে মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য কীর্তিমান নেতার স্মৃতি ও ভাবমূর্তি। রাজপথে আন্দোলন ও দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, প্রতিহিংসার বিষপাম্প ছড়িয়ে কিংবা নির্বাচন বর্জন ও সংসদকে অকার্যকর করে আওয়ামী লীগ লাভবান হবেনা বরং আরও পিছিয়ে পড়বে অনেক। এক্ষেত্রে একটি সংসদীয় দল হিসেবে নির্বাচন বর্জন করে ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ক্ষীণ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। গত চার বছরে কোনো জাতীয় দুর্যোগ কিংবা সমস্যায় আওয়ামী লীগকে জনগণের পাশে খুব একটা দেখা যায়নি। সংগঠনকে জোরদার করার ব্যাপারে দেশব্যাপী তাদের ছিলনা তেমন কোনো সাংগঠনিক কর্মকান্ড। এ অবস্থায় শুধু সংসদ কিংবা নির্বাচন বর্জনের কৌশল নিয়ে ক্ষমতাসীন জোটকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা পরাস্ত করা যাবেনা। কারণ তাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলা গেলেও অর্জনকে মোটেও ঢেকে দেয়া যাবেনা। প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশংসাবাক্য শুধু মুখের কথা না, বাস্তবেও তার প্রমাণ মেলে। সুতরাং অসাংবিধানিক, অনিয়মতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক পথে আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সম্ভব দেশ গঠন ও তার সমৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন, অংশগ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই। তাছাড়া মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লুই লা আমুর বলেছেন, গণতন্ত্রের কথা শুধু মুখে মুখে নয় কিংবা তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে কেবল নিছক বাদানুবাদ করেই নয় বরং সকল অবস্থায় আমাদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর জাতিতে পরিণত হতে হবে। যে নির্বাচন বর্জন করে বা ভোট দেয়না, তার অভিযোগ করার তো কোনো অধিকার নেই।

www.pathagar.com

সংস্কার প্রস্তাব ও ১৪-দলের অক্টোবর ফ্যাক্টর

নয়া দিগন্ত, ২৩ জুলাই, ২০০৫

পত্র-পত্রিকায় এখনো সেভাবে প্রকাশ না পেলেও দেশব্যাপী কোনো কোনো মহলে জোর গুজব ওঠেছে যে, এ বছরের অক্টোবর নাগাদ আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে পারে। নির্বাচিত সংসদ ও সরকারের মেয়াদকাল পূর্ণ হলো কি হলোনা সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট নেতৃবৃন্দ কোনো কিছু বিবেচনা করবেন বলে মনে হয়না। বরং রাজনৈতিক বিভাজন জিইয়ে রেখে সরকার পতনের আন্দোলনকে জোরদার করার মধ্যেই তারা আগামী নির্বাচনে তাদের সাফল্য নির্ভর করছে বলে মনে করছেন। সুতরাং ১৪-দলের ৩০-দফা বিতর্কিত দাবী দাওয়া নিয়ে দেশ রাজনীতিগতভাবে ক্রমশ এখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

প্রথমত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যাপারে ১৪ দলীয় জোট যে প্রস্তাব দিয়েছে তা নিয়ে দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ হতচকিত হয়ে পড়েছে। কারণ দেশের প্রায় শ'খানেক রাজনৈতিক দল, যাদের অনেকের একজন সদস্যও বর্তমান সংসদে নেই, তাদের দ্বারা আর যাই হোক সর্বসম্মতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন প্রধান উপদেষ্টা বাছাই করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটি হচ্ছে একটি সংবিধিবদ্ধ সাংবিধানিক পদ। এ পদে সরকার যথারীতি সম্প্রতি নিয়োগ দিয়েছে বিচারপতি এম এ আজিজকে। সে পদেও ১৪ দলীয় জোট নতুন করে নিয়োগ চাচ্ছে। এসব নিয়ে দেশের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ ইতোমধ্যেই মতামত দিয়েছেন যে, ১৪ দল উত্থাপিত ৩০-দফা দাবী মানতে গেলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপরই সরাসরি হাত পড়ে। দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কোনো অনির্বাচিত ও অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করা যায়না। ক্ষমতাসীন সরকারের মেয়াদ কাল শেষ হলে কিংবা কোনো কারণে সরকার পদত্যাগ করলে সরকারের ধারাবাহিকতার বিষয়টি যেহেতু সংসদ দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সাথেই জড়িয়ে থাকে সেহেতু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব শুধু তার ওপরই ন্যস্ত থাকা সমীচীন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা তার প্রধান উপদেষ্টা যেহেতু সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয় সেহেতু তাদের জবাবদিহিতা কিংবা দায়বদ্ধতা নিয়ে হাজারো সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। একমাত্র সে কারণেই পৃথিবীর আর কোনো দেশ, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার রয়েছে, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন কোনো অনির্বাচিত সরকারের ব্যবস্থা নেই।

www.pathagar.com

এ রকম একটি অবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন থেকে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন যে, আন্দোলনের মাধ্যমেই সংস্কার প্রস্তাবে উত্থাপিত দাবী আদায় করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সংসদের ভিতরে কিংবা বাইরে কোনো আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করেননি তিনি। তাছাড়া ১৪ দলের অন্যতম শরিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী হিসেবে পরিচিত ও সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে সমানে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ড. কামাল প্রথমেই বলেছেন যে, 'যেখানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অব্যাহতি নেন সেখানে দলীয় সমর্থনের রাষ্ট্রপতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা বিভাগ রাখা যায়না।' এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত, কোনো অনির্বাচিত দলীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এক্ষেত্রে সংসদের ভেতরে কিংবা বাইরে ১৪ দলীয় জোট নেতারা রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা মত বিনিময়ের কথা কিছুটা বললেও শেষ পর্যন্ত তারা তাদের প্রস্তাবিত দাবী দাওয়া পুনর্বিবেচনার কথা কিছু বলছেনা। বরং তারা তাদের প্রস্তাবের সমর্থনে ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই বৃহত্তর ঢাকায় জনসভার আয়োজন করেছে। তাছাড়া, সেপ্টেম্বরে দেশের ৬ বিভাগে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দের ধারণা; বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে এখন থেকে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে নির্বাচনে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবেনা। এ ক্ষেত্রে তারা '৯৬-এর পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায় বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ২০০৫-২০০৬ সালে বিরোধী দলীয় অতীত রণনীতি ও কৌশল কতটা কার্যকর হবে তা তাদের ভেবে দেখতে হবে।

গত ১৫ জুলাই ১৪ দলের ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের রূপরেখা নিয়ে তার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিএনপি মহাসচিব ও জোট সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া। তাছাড়াও কয়েকজন সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ অনেকেই বিভিন্ন যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী জোটের প্রস্তাবিত দাবী দাওয়ার ব্যাপারে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, 'সরকারী দলকে আগে আমাদের প্রস্তাবগুলো নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে, তারপর হবে আলোচনা।' এখানে প্রশ্ন ওঠেছে যে ১৪-দলীয় প্রস্তাবগুলো যদি আগে নীতিগতভাবে মেনেই নিতে হয়, তাহলে আলোচনার আর কী থাকে? এ অবস্থায় জোট সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, 'সকল ব্যাপারেই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যে বিধান রয়েছে তা আগে বিরোধী দলকে মেনে নিতে হবে।' অপরদিকে ড. কামাল হোসেনসহ ১৪ দলীয় কয়েকজন নেতা সংস্কার প্রস্তাবকে বিভাজনের রাজনীতির রোগে আক্রান্ত না করে খোলা মনে আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য এগিয়ে আসতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

এখানে রাজনৈতিক বাক্যবিন্যাস ও ছল-চাতুরীর ঘেরাটোপে মূল ইস্যুটিই হারিয়ে যাচ্ছে। ১৪-দল সাংবিধানিক বিভিন্ন জটিল বিষয়ে পূর্বশর্ত দিয়ে খোলা মনে আলোচনার সকল পথ আগে থেকে বন্ধ করে বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি ও সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রশ্নে সমগ্র দেশটাকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এমন এক অস্থিতিশীলতার দিকে যে, দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসঙ্ঘের "মিলোনিয়াম গোল", দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাসহ বর্তমান সকল পরিকল্পনাই ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সবার আগে এ বিষয়টিই চূড়ান্ত বিবেচনায় রেখে রাজনীতি করা আবশ্যক বলে এদেশের মানুষ মনে করে। কারণ এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অপতৎপরতায় দেশ ও তার জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে চরম হুমকির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে সংসদে নয়, রাজপথেই মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

অনেক সময় বহু জ্ঞানী গুণী মানুষও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। গণতন্ত্রের পুজারীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে স্বৈরাচারীর ভাষা। ড. কামাল হোসেনকে পত্র-পত্রিকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী বলে উল্লেখ করা হয়। সম্প্রতি তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের মতোই একটি হাস্যকর কথা বলে ফেলেছেন। জলিল সাহেব যেমন বলেছিলেন, (গত বছর) ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এ জোট সরকারের পতন ঘটবেই, পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই তাকে ধরে রাখতে পারে; ঠিক তেমনি কামাল হোসেন সাহেবও ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন যে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ চারদলীয় জোটকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। এ সময়ে নাকি দেশে অনেক কিছুই ঘটবে। কামাল হোসেন পীর-ফকির নন। তা হলে তিনি এসব কথা বললেন কী করে? তা হলে তার কাছে কী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারের ধারাবাহিকতার কোনো মূল্য নেই? তিনিও কী ক্ষমতার মোহে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন? সুদূর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে অবস্থানরত শামীম ওসমানও বলেছেন যে, তিনি অক্টোবরে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি নাকি গডফাদার হিসেবে মরতে চাননা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অক্টোবরেই কেন তিনি দেশে ফিরতে চাচ্ছেন। তাহলে অক্টোবরে কী ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশে?

বিশ্বের যে কোনো দেশে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন সরকার ও বিরোধী দলসমূহের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। সংসদকে সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে একে সচল রাখা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করা। এর পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সার্বিক উন্নয়ন ও জাতিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত

www.pathagar.com

করা। কিন্তু কথায় কথায় অনর্থক সংসদ বর্জন করা, হরতাল ডেকে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা এবং অহেতুক জাতীয় জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টির মাঝে যেমন দেশ ও জনগণের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই, তেমনি তা থেকে কোনো রাজনৈতিক দলও দলীয়ভাবে তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেনা। বরং এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে কৃষক–শ্রমিক, ছাত্র-জনতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত মেহনতি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া কথায় কথায় রাজপথ ভিত্তিক সরকার পতনের আন্দোলন করে এখন আর বাস্তবে সরকারের পতন ঘটানো যায় না। এ অবস্থায় জনসমর্থন কিংবা ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া রাজধানী ঢাকায় বসে দিন-তারিখ ঘোষণা করে কী একটি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব? এ সমস্ত ঘটনায় জনগণের প্রতি রাজনৈতিক দলসমূহের শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশেই ঘটতে দেখা যায়। জনগণের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর না করে দিন-তারিখ ঘোষণা করেই যদি সরকার গঠন ও তার পতন ঘটাতে হয় তা হলে নির্বাচন করে আর লাভ কী?

ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার প্রথম পাতায় সম্প্রতি শিরোনাম ছাপা হয়েছে যে, 'সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর অঘটনের আশঙ্কা।' আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন, অক্টোবরে সরকারের চার বছর পূর্তি এবং নভেম্বরে সার্ক সম্মেলনকে সামনে রেখে সরকার নাকি সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই তো সরকারের কাজ। কিন্তু সে সময় সরকারকে ফেলে দেওয়া হবে কিংবা তখন দেশে একটি বিরাট অসাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটে যাবে অথবা সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে নির্দ্বিধায় এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী যারা দিচ্ছেন তাদের এ ধরণের বক্তব্যের ভিত্তি কী? একটি নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিকভাবে ফেলে দেয়া এবং তার মেয়াদকাল পূরণ করতে দেয়া হবেনা বলে যারা প্রচার করছেন তাদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো গোপন খবর রয়েছে। নতুবা তারা নিজেরাই এ ধরণের ষড়যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তা না হলে তারা এগুলো প্রকাশ্যে বলছেন কী করে? আর কোনো দায়িত্বশীল পত্র-পত্রিকাই বা এগুলো প্রচার করছে সাংবাদিকতার কোন নীতিমালার ভিত্তিতে? এ ধরণের উস্কানিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশে কী কোনো আইন নেই? গণতন্ত্রে, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে, জনগণই সরাসরি তার প্রতিনিধি ও সরকার নির্বাচিত করে। এখানে আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ও শক্তি নেই। এ অবস্থায় কোনো ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে জনগণের কাছে তা তুলে ধরার চর্চা রয়েছে। একমাত্র জনগণই সে অবস্থায় শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে পারে। এ অবস্থায় জনগণের ওপর নির্ভর না করে কোনো অনিয়মতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক মন্তব্য কিংবা কর্মকান্ডের সাথে যদি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা বুদ্ধিজীবীরা জড়িয়ে পড়েন তা হলে এ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা, একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া কিংবা সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সুশাসন নিশ্চিত করবে কারা ?

www.pathagar.com

টেংরাটিলা নয়, দেশবাসীর অন্তর জ্বলছে

নয়া দিগন্ত, ৯ জুলাই, ২০০৫

শুধু টেংরাটিলায় নয়, গত ২৪ জুন থেকে আগুন জ্বলছে প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের অন্তরে। দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণের পর প্রায় দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি কানাডিয়ান তেল ও গ্যাস কোম্পানী নাইকো। এতে দেশ হারাচ্ছে ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যার মূল্য এক হাজার কোটি টাকার ওপরে। সে কারণেই বুকের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন উন্নয়নকামী বাংলাদেশীদের। টেংরাটিলার প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিদিন জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে আর নাইকো গ্রীক সম্রাট নিরুর মত বাঁশি বাজাচ্ছে। তারা বলছে অন্তত দু'মাসের আগে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা নাকি সম্ভব নাও হতে পারে।

এ অবস্থায় দেশের উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে, এ কেমন পশ্চিমা বিদেশী কোম্পানী, যাদের এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলার কোনো ক্ষমতাই নেই। এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় নেই কোনো দক্ষতা কিংবা অভিজ্ঞতা। তাই শুধু সুনামগঞ্জের টেংরাটিলার সাধারণ মানুষই নয়, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষে চায় এ ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ। এর আগে মাগুরছড়া গ্যাসফিল্ডে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে আমেরিকান কোম্পানী অক্সিডেন্টাল স্থানীয় জনগণের সহায়-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ দিলেও আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস এবং পরিবেশ দুষনের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি আজও। তাই সংগত কারণেই দেশের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছে যে, এভাবেই কী আমাদের দুস্প্রাপ্য সম্পদ বিদেশী কোম্পানী চরম অবহেলায় বিনষ্ট হয়ে যাবে? এ কোন ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করছে সরকার যে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ? এতে বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে চরম দুঃখ ও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

৭ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেস রিপোর্টে আরও জানা গেছে যে, টেংরাটিলায় আরও দুটি কূপ এবং তিনটি কনটেইনারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে (কনটেইনারে) জ্বলে গেছে সাড়ে ২২ হাজার লিটার ডিজেল। কনটেইনার তিনটিতে বিস্ফোরণের সময় সমস্ত এলাকা থর থর কেঁপে ওঠেছিল। মনে হচ্ছিল প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে। ৬ জুলাই সন্ধ্যায় টেংরাটিলা গ্যাসকূপের ২০ ফুট পূর্বে আরও দুটি গ্যাস কূপেও বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দগ্ধ গ্যাসের আগুনের শিখা নাকি এক থেকে দেড়শ ফুট পর্যন্ত উপরে ধাবিত হয়। এর আগেও কনটেইনারে আরো বিস্ফোরণ ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে গেছে নাইকো কোম্পানীর জেনারেটর ও যানবাহন। টেংরাটিলা গ্যাসকূপের আগুন আশপাশের

www.pathagar.com

এলাকায় ক্রমান্বয়ে ছড়াচ্ছে। এ অঞ্চলের মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে নাইকো'র কোনো কর্মরত ব্যক্তিদের সেখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগুন ছড়িয়ে পড়ায় তারা রিলিফ কূপ খননের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সরে পড়েছে।

এ বিষয়টি নিয়ে সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ তাদের জেলা ও মহানগর শাখাকে নিয়ে যৌথভাবে ৬ জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিল। এতে বক্তারা অভিযোগ করেছেন যে, নাইকো কোম্পানী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ছাতক টেংরাটিলা গ্যাস কূপ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থায় তারা নাইকো, ইউনোকল, শেল, কেয়ার্ন, অক্সিডেন্টাল, সেঞ্চুরী ও মিলেনিয়াম সহ সকল বিদেশী তেল ও গ্যাস উত্তোলন কোম্পানীকে বিতাড়িত করার জন্য দাবী জানান। তাদের সাথে অবিলম্বে সকল চুক্তি বাতিল করে তাদের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা। তাছাড়া, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সসহ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগী দুর্নীতিবাজ সকল কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও আইনানুগভাবে শাস্তি বিধানেরও দাবী জানানো হয়। এ সমস্ত দাবীতে আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিনিময় এবং ১৮ জুলাই সিলেটের কোর্ট পয়েন্টে জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশ ডাকা হয়েছে।

জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত না করার জন্য অনুরোধ করে বলেছেন, তিনি ইতোমধ্যেই নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। কিন্তু কত বিতরণ করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তাছাড়া পর পর দুটি বিস্ফোরণে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার কী হবে ? সে উত্তর এখনও কোথাও পাওয়া যায়নি। দেশবাসী চায় না মাগুরছড়ার পুনরাবৃত্তি ঘটুক টেংরাটিলায়। এ অবস্থায় একটি নতুন রিলিফ কূপ খননের জন্য নাইকোর পক্ষ হয়ে মৌলভীবাজার থেকে ৭ জুলাই সেঞ্চুরী রিসোর্সের একটি দল সরঞ্জামাদি নিয়ে টেংরাটিলায় আসার কথা। এতদিন বাপেক্সকে নিয়ে নাইকো কূপ খননের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যা এ মাসের ২৫ তারিখ শুরু হওয়ার কথা ছিল।

গত দু'সপ্তাহে টেংরাটিলার গ্যাসফিল্ডের আগুন সুনামগঞ্জের সে এলাকার পরিবেশ, ভূ-প্রকৃতি ও জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি করেছে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কোনোমতেই পূরণ হবার নয়। তাছাড়া টেংরাটিলায় গ্যাস পুড়ে পুড়ে বায়ুমণ্ডলে যে কালো ধোঁয়ার কৃত্রিম পর্দা সৃষ্টি করেছে তা এখন ক্রমাগত শুধু বেড়েই চলেছে। বাতাস এতই দূষিত হয়ে পড়েছে যে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতেও মানুষের কষ্ট হচ্ছে। কালো ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন কার্বন মনো অক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ দূষিত গ্যাসে ভরে যাচ্ছে পুরো এলাকা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা রিপোর্ট করেছে যে, টেংরাটিলার বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক 'বায়ুচক্র' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর

www.pathagar.com

কুপ্রভাব শুধু জনজীবনে নয়, উদ্ভিদ ও ভূ-প্রকৃতির উপরও পড়তে বাধ্য। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত টেংরাটিলার সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ হাজার কোটি টাকায়। টেংরাটিলায় বিস্ফোরণ কিংবা আগুন লাগা এবারই নতুন নয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জ্বলেছে টেংরাটিলা। সাবেক জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেনকে কোটি টাকার গাড়ী উপহার দিয়ে প্রথমবারের ধাক্কা প্রায় অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল নাইকো। কিন্তু তাদের ভুল পরিকল্পনার কারণে আবার পুণরাবৃত্তি ঘটলো একই ধরণের বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডের। ছয় মাসের ব্যবধানে এ দুটি অগ্নিকাণ্ডের জন্য তাদের ভ্রান্তি, অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও উদাসীনতাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলে মত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে নাইকোর ক্ষয়-ক্ষতি হবে কতটুকু? তাদের ক্ষয়-ক্ষতি দেখবে ইনসিউরেন্স কোম্পানী। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনগণের অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি দেখবে কে ?

বাপেক্সের হিসাবমতে দ্বিতীয় দফার আগুনে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়েছে। তাদের ধারণামতে টেংরাটিলায় প্রায় ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুত ছিল। গতবারের অগ্নিকাণ্ডে জ্বলেছে ১০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। সে ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা নেয়নি। এ গ্যাসফিল্ডে সঠিক কূপ খনন প্রক্রিয়া নির্ণয় করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া মাগুরছড়ায়ও ঘটেছিল একই ঘটনা। তারপরও সরকারের একটি মহল আমাদের আবিস্কৃত গ্যাসফিল্ডগুলো বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে এতো আগ্রহী কেন ? শুধু কী আমাদের গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কার ও কূপ খনন করার মতো নিজস্ব সম্পদ নেই বলে ? নাকি আমাদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব এক্ষেত্রে আমাদেরকে পিছু টেনে রাখছে ? এগুলো ভেবে দেখার সময় এসেছে এখন। এদেশে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য বিদেশী কোম্পানীকে ডেকে আনা আর সংগত হবে কী না ভেবে দেখতে হবে। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে বহুভাগে বিভক্ত করে পাশ্চাত্যের বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে আমাদের গ্যাসক্ষেত্র গুলোকে। এখন অভিযোগ ওঠেছে যে, এ প্রক্রিয়ার সাথে আগাগোড়া কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ও আমলা জড়িত ছিলেন। তাদের নাম ও পরিচয় ক্রমশ বেরিয়ে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশে মোশাররফ হোসেন একা নয়, আরও বহু মোশাররফ হোসেন আছে পর্দার অন্তরালে। ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রির ব্যাপারে শুধু মোশাররফ হোসেন একাই উৎসাহী ছিলেন না, আরও অনেকেই ছিলেন। তবে দুঃখ হয় তারা যখন নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক বলে পরিচয় দেয়।

এ সমস্ত দর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক বা আমলাদের তুলনায় এ দেশের নিজস্ব বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা অনেক বেশি দেশপ্রেমিক। এ ক্ষেত্রে তাদের আবিস্কার ও অবদান প্রশংসার যথেষ্ট দাবী রাখে। তাছাড়া, এরা দেশের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের ব্যবহার নির্ণয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার উত্তোলনের নিশ্চিত করতেও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করতে পারে। এ অবস্থায় নতুন জ্বালানী উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান কিছু নতুন কার্যক্রমের আভাস দিয়েছেন যা এ দেশের মানুষের মাঝে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছে। এর মাঝে গ্যাস ব্লক ইজারা নিয়ে যেসব বিদেশী তেল কোম্পানী কাজ করছে না, তাদের চুক্তি বাতিল করা এবং দেশের ২৩টি ব্লককে নতুনভাবে বিভাজন করে আরো বেশি ব্লকে ভাগ করার চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত ফলদায়ক হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারনা করছেন।

মূল্যবান গ্যাসের পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে সস্তায় আমাদের আহরিত কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশ অনেক বেশি লাভবান হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ সব ব্যাপারে এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নীতি। এর আভাস জ্বালানী উপদেষ্টা ইতোমধ্যেই দিয়েছেন। এর পাশাপাশি বিদেশী তেল কোম্পানীগুলোর সাথে স্বাক্ষরিত প্রায় সবকটি চুক্তিতেই অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে দেশের একজন নেতৃস্থানীয় ভূতত্ত্ববিদ অভিযোগ করেছেন। যার ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিপূরণ পাইনা বা আদায় করতে পারিনা। এ মুহূর্তে সে সব চুক্তিরও পর্যালোচনা হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে আমরা বার বার ক্ষতিগ্রস্ত না হই। আল্লাহ এ দেশবাসীকে সম্পদ দিয়েছেন তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। সে সম্পদের অপচয় কিংবা তা নিয়ে দুর্নীতি করার জন্য নয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে এ জাতির দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্গতি কোনদিন ঘুচবেনা। আর যারা এ সম্পদ নিয়ে দুর্নীতি করে তাদেরও এ সম্পদ কোনো কাজে আসবেনা।

www.pathagar.com

পলাশী ঃ আমাদের সংবাদপত্র ও রাজনীতি

নয়া দিগন্ত, ২৫ জুন, ২০০৫

বলশেভিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত নেতা ভি আই লেনিন বলেছিলেন, "রাজনৈতিক সংগঠনকে যদি শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এটা নিতান্তই একটা স্থবির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে?" শোষিত-বঞ্চিত জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে গঠিত শ্রেণী সংগঠন এবং তার (দলের) মুখপত্রকে কেন্দ্র করেই লেনিন এ কথাগুলো সেদিন বলেছিলেন। আমাদের গণসংগঠন সমূহের রাজনৈতিক শিক্ষার বেলায়ও কি এ কথাগুলো প্রযোজ্য নয়? তবে আমাদের দেশে তেমন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সংবাদপত্র কোথায়? যা ও বা আছে তার অধিকাংশই আবার রাজনীতি নয়, দলবাজিতে সদা ব্যস্ত। এ দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তেমন কোনো দলীয় মুখপত্রের অস্তিত্ব এখন আর নেই। বিদেশী বিনিয়োগ কিংবা ব্যক্তিমালিকানায় প্রকাশিত বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা বৃহত্তরভাবে দেশের নয় বরং নিজের ছাড়াও বিভিন্ন দল এবং বিদেশের স্বার্থ দেখতেই বেশি ব্যস্ত। এতে সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থ কিংবা শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের দিক নির্দেশ তেমন বিশেষ থাকেনা। নির্দিষ্ট কোনো দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেদের ভাগ-বাটোয়ারা কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য নিশ্চিত করাই যেন তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ সমস্ত কায়েমী স্বার্থ এবং এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য কোনো কোনো জাতীয় দৈনিক নিজ দেশকে একটি ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তাদের পছন্দের দল ক্ষমতায় না গেলে দেশ চিহ্নিত হয় সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের ঘাটি হিসেবে। আর তাদের পছন্দের দল ক্ষমতাসীন থাকলে সীমাহীন লুটপাট, দুর্নীতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, সশস্ত্র সন্ত্রাস এবং সকল মাৎস্যন্যায়কে ঢাকা দেয়ার নিরলস প্রচেষ্টা চলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্লোগানে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের যে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন মহামতি লেনিন তা কী আর ধোপে টেকে?

সেদিন ঢাকায় নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত জ্যাক অঁদ্রে কস্টিলহেস বাংলাদেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি অবাক বিস্ময়ে বলেছেন, এখানকার সংবাদপত্রে বাংলাদেশকে যেভাবে দেখানো হয় তার তুলনায় বাস্তবের বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শান্ত-সমুজ্জ্বল এবং অফুরন্ত সম্ভাবনায় ভরপুর। জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা,

www.pathagar.com

মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা ও অকার্যকারিতার প্রমাণ তিনি পাননি এদেশে। বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা পৃথিবীর সবদেশেই ঘটতে পারে। ভারতের গুজরাটে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার ও অবিচার এদেশের এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার চোখে ধরা পড়েনা। বাংলাদেশে সে ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা ধর্মান্ধতা কেউ কখনও দেখেনি। কিন্তু একটি দেশীয় কুচক্রী মহল তাদের বিদেশী দোসরদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে এখনও দিনের পর দিন ফেঁদে যাচ্ছে সে ধরণের অসংখ্য কল্প-কাহিনী, যার কোন সত্যতা কিংবা বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজে পাওয়া যায়না। সে কারণেই হয়তো সম্প্রতি ফ্রান্সের সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান রাষ্ট্রদূত কস্টিলহেস বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান-পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সিলেট এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অংশবিশেষ - ভ্রমণ করে বলেছেন, 'আমি দেখেছি অপরূপ এক বাংলাদেশ। এ দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে আমি ঘুরেছি স্বাচ্ছন্দ্যে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আমি দেখেছি চিরায়ত সুন্দর, অপরিসীম সাহসী, উদ্যমী ও বলিষ্ঠ এক বাংলাদেশ। পরিশ্রমী এক ঐতিহ্যবাহী জাতি। এখানে দেখেছি সুন্দর সমাজ বন্ধনে আর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে সাধারণ মানুষ জাতীয় অগ্রযাত্রায় সমান কাতারে শরিক হয়েছে।' এখানেই শেষ নয়। ফরাসী রাষ্ট্রদূত আরও বলেছেন যে ফ্রান্সের জনগণ বাংলাদেশীদের অত্যন্ত সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে মনে করে, যা তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রমাণ করেছে। এ জাতি সম্পর্কে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের প্রশংসামূলক সে কথাগুলো এ দেশের এক শ্রেণীর কাগজে স্থান পায়নি। কেন পায়নি তা বুঝতে সচেতন পাঠকের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি ও মন্দির দখল কিংবা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার কাহিনী তাদের পত্র-পত্রিকায়ই বার বার ছাপা হয়। অথচ অনুসন্ধান করে জানা যায় সে খবরগুলো ভিত্তিহীন। এদেশের স্বাধীনতা প্রিয়, দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী মানুষ তাদের উদ্দেশ্য, চক্রান্ত এবং অপতৎপরতা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই সম্যক ধারণা পেয়ে গেছে। তাই তারা কুচক্রীদের এদেশের বন্ধু মনে করেনা, তাদেরকে গ্রহণ করেনা প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে। তারা কারো না কারো উচ্ছিষ্টভোগী সেবাদাস। সুতরাং রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সংবাদপত্রের যে ভূমিকার কথা মহামতি লেনিন উল্লেখ করেছেন তা কি এ ধরণের সংবাদপত্রের বেলায় প্রযোজ্য?

এদেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্রে বাংলাদেশের যে নেতিবাচক ও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয় তাকে প্রকৃত ঘটনার মর্মান্তিক অতিরঞ্জন বলে উল্লেখ করেছেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত রুচিহীন বিভৎস ঘটনার ছবি ছাপানো হয় তাতে সে সমস্ত পত্র-পত্রিকার কাটতি কতটুকু বাড়ে তা জানা নেই, তবে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোথাও সংবাদপত্রে এ ধরনের ছবি ছাপা হতে দেখা যায় না। সেসব দেশে যে বাস দুর্ঘটনা কিংবা গোলাগুলিতে কেউ নিহত হয় না এমন নয় কিন্তু সংবাদ হিসেবে তা পরিবেশনের নিয়মই আলাদা। তাছাড়া কোনো

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হীন চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন কল্পিত বা বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করা কী পত্র-পত্রিকার কাজ? দেশ এবং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য শুধু কোনো কোনো পত্রিকাই নয়, কতিপয় সাংবাদিকও বাংলা ভাই থেকে শুরু করে গোপন বামপন্থী সংগঠন নিয়ে অনেক কল্পকাহিনী বিদেশে পাচার করছে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস সেদিন বলেছেন যে, 'বাংলাদেশে কিছুই গোপন থাকেনা। ধরা পড়ে যায়। নিউ ইয়র্ক টাইমস অথবা টাইম ম্যাগাজিনে যা ছাপা হয় তা বাংলাদেশের সংবাদপত্র থেকে নিয়েই ছাপা হয়। তিনি বলেছেন গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তবে কোনো দেশেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ কাজ নয় বলে নয় তিনি উল্লেখ করেছেন। কারণ এর জন্য দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা যেমন বেশ কিছুটা দায়ী, তেমনি কোনো কোনো দলের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়াটাও কম দায়ী নয়। এ অবস্থায় কোনো দলের মুখপত্র হিসেবে নিজেদের পরিচয় না দিলেও পাঠক সমাজই বলতে শুরু করে কে কার দালালী করছে। তবে এ অপসাংবাদিকতা কিংবা দালালী যে শুধু দেশীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ তা নয়, এর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলও রয়েছে। এই বাংলাদেশে এক ধরণের সংবাদপত্র রয়েছে যারা সরাসরি দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে কাজ করছে, কথা বলছে। তারা নিজ দেশকে একটি ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবেও চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করেনা। এ সাহস তারা পায় কোথায়? কে জোগায় তাদের এ সাহস? এদের পরিচয় জনগণের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। অন্যথায় এটি জাতীয়তাবাদী একটি রাজনৈতিক সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়ে থাকবে। এ ব্যর্থতা বিভিন্ন আঙ্গিকে পলাশী প্রান্তরের ট্র্যাজেডিরই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

যথা নিয়মে প্রায় আড়াইশ' বছর পর আবার ফিরে এসেছে পলাশী ট্র্যাজেডি দিবস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারী ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল পলাশীর করুণ কাহিনী। সেদিন পলাশীর আম্র কাননে স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়েই অস্তমিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা। নবাবের বিরুদ্ধে এতো ষড়যন্ত্র করেও সেদিন ক্ষমতা পায়নি মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, মীরন, মোহাম্মদী বেগ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, উমি চাঁদ এবং অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকের দল। ইংরেজ বণিকদের সংগঠন পরিণত হলো শাসকের ঔপনিবেশিক শক্তিতে এবং শাসন ভার ক্রমশ চলে গেল ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভের হাতে। মীর জাফর, যিনি নবাবের প্রধান সেনাপতি ও নিকট আত্মীয় ছিলেন, তিনি নিজে নবাব হওয়ার জন্য ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে পা দিলেন কিন্তু না পেলেন ক্ষমতা, না রাখতে পারলেন দেশের স্বাধীনতা। একে একে করুণ পরিণতি ঘটলো উল্লিখিত ব্যক্তিদের। মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরন ছিল পিতার পক্ষে পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক। পরে ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজরা মীর কাসেমকে দিয়ে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হত্যা করিয়েছিল মীরনকে। বলা হয়েছিল, বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে মীরনের। এত কিছুর পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদের কাছাকাছি গিয়েও প্রকৃত ক্ষমতা পায়নি মীর জাফরের জামাতা মীর কাসেম। জগৎশেঠদের চক্রান্তে তারও হলো করুণ পরিণতি। ক্ষমতা পাওয়ার লোভে দাসত্বকে বরণ ও স্বাধীনতা

www.pathagar.com

হারানোর গ্লানি ক্রমশ টের পেতে শুরু করলো তারা সবাই, যা তখন শুধু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতেই সীমাবদ্ধ রইলো না, ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতবর্ষে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার উর্বর মাটিতে যে ষড়যন্ত্রের বীজ বপিত হয়েছিল তা অঙ্কুরিত হয়ে দিনে দিনে যে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল সেটার মূল উৎপাটিত করতে এ দেশের মানুষের দু'শ বছর সময় লেগেছিল। এ দেশের মানুষ তাকে সূচনাতেই নিপাত করতে পারিনি। ইতিহাসবিদ ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার তার "দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থে লিখেছেন, 'সেদিন যদি মুর্শিদাবাদবাসী নীরব দর্শকরা খালি হাতেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো তাহলেও হয়তো তাদের পরাজয় হতো না।' কিন্তু রাজতন্ত্রের অভিশাপে শঙ্কিত ও অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ সেদিন ছিল সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত অসচেতন। সুতরাং সেদিনের সে পরাজয় কিংবা স্বাধীনতা হারানো সম্পর্কে তারা তাৎক্ষণিকভাবে তেমনভাবে কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। অথচ পরাধীনতার গ্লানি, অবমাননা, শোষন ও নির্যাতন তাদেরকেই সহ্য করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

আজ বহু মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা, উৎসর্গ ও আত্মদানের মাধ্যমে আমরা আবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছি। আজ নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন, দেশ এবং জাতি গঠনে যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণেও আমাদের অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে। যারা সবকিছুর বিনিময়ে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় এবং ক্ষমতা লাভের জন্য বৈদেশিক শক্তির সাথে ষড়যন্ত্র করে, পলাশীর ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি তাদের জন্য প্রধান সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করা উচিত। দেশের জনগণই কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে, বিদেশী শক্তি নয়। শাসন ক্ষমতার জন্য বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক অপশক্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার এবং সজাগ থাকাই হবে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। সে অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির বজ্রকঠিন ঐক্যই হবে আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে একমাত্র পাথেয়। এদেশ পরিচালনায় এ দেশের মানুষের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। তাদের যাবতীয় স্বার্থ রক্ষাই হবে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতির মূল কথা। এর বাইরে আমরা কারও কোনো হস্তক্ষেপ চাইনা। এটিই এ দেশের আপামর জনসাধারণের মনের কথা। এর পরিচয় আমরা এ দেশের প্রত্যেকটি দুর্যোগপূর্ণ ঘটনায় পেয়েছি। এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক, ছাত্র-জনতা তাদের জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে বার বার ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠেছে। অধিকার আদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তারা যে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেছে, এটি বোধ হয় তারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কোনো দেশীয় অপশক্তির ষড়যন্ত্র, বিদেশী অশুভ শক্তির হস্তক্ষেপ কিংবা কতিপয় সংবাদপত্রের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডা এ দেশে সফল হবে বলে মনে করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত কুচক্রী এবং ষড়যন্ত্রকারীরা পরাস্ত হতে বাধ্য। তবুও পলাশী ট্র্যাজেডির নিরিখে সে সমস্ত চিহ্নিত শত্রুদের আমরা যেন খাটো করে না দেখি। আমাদের জন্য এটিই হোক পলাশীর প্রকৃত শিক্ষা।

www.pathagar.com

কালো টাকা সাদা টাকা বিতর্ক

নয়া দিগন্ত, ১৮ জুন, ২০০৫

ছাত্রাবস্থায় আমার ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন লেখাপড়া কতটুকু শিখেছি জানিনা। তবে শেষ পর্যায়ে পুঁজিবাদের ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তৎকালীন পশ্চিমা অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত একটি মজার কথা শুনেছিলাম। তা হলো ঃ ফারষ্ট মিলিয়ন ইজ অলওয়েজ এ ব্ল্যাক মিলিয়ন। বাংলায় এ বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে তার ভাবার্থ দাঁড়ায়, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি কিংবা পুঁজিপতির আহরিত প্রথম মিলিয়নটিই হচ্ছে কালো মিলিয়ন। কর ফাঁকি দেয়া অঘোষিত অর্থ এবং ঘুষ-দুর্নীতি সহ চোরাচালানী কিংবা যে কোনো অবৈধ পথে অর্জিত অর্থই আমাদের দেশে কালো টাকা বলে পরিচিত। এ অর্থ অঘোষিত অর্থ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য কিংবা এ অর্থ সার্বিক পরিকল্পিত ব্যবস্থায় না থাকায় সুস্থ অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতে অবৈধ পথে ব্যবসা-বানিজ্য বাড়া ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি এবং ম্যাক্রো অর্থনীতির ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া যে কোন পরিমাণ গোপন অথবা অবৈধ অর্থ অলস মুদ্রা হিসেবে দীর্ঘদিন অঘোষিত অবস্থায়ও পড়ে থাকতে পারে যা দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদানই রাখতে পারেনা। এতে উৎপাদনশীল খাত, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, দেশ কিংবা জাতি কোনো দিক থেকেই উপকৃত হয়না বরং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে কারণেই কালো টাকা সাদা করার অর্থাৎ বৈধ করার এতো তাগিদ। কালো টাকা উপার্জন কিংবা তার পাহাড় গড়ার সমস্ত উৎস ভেঙ্গে দেওয়ার প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কালো টাকার সকল উৎসমূল বন্ধ করা কী মোটেও সম্ভব ? মোটেও না। যতদিন সমাজে দুর্নীতি, অবৈধ আয়, কর ফাঁকি দেওয়া এবং চোরাচালানীসহ অন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য থাকবে ততদিন সমাজ থেকে কালো টাকার অস্তিত্ব বিলোপ করা যাবে না। সুতরাং দেশীয় অর্থনীতিতে এ ক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সে আশঙ্কাকে কীভাবে অতি দ্রুত কমিয়ে আনা যায়, লাঘব করা যায়, এটাই হচ্ছে বর্তমান অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের দুশ্চিন্তার মূল কারণ।

এদেশে সাইফুর রহমান সাহেবের প্রদত্ত ১১তম বাজেট এটা। বাজেট নিয়ে অতীতে এতোটা হৈ চৈ হতে কখনও দেখা যায়নি। বাজেটের কারণে মূলত ভোগ্য পণ্যের দাম কতটা বাড়লো কিংবা কমলো সেটাই ছিল সাধারণ মানুষের জানার বিষয়বস্তু। বড় জোর কৃষি খাতে সার কিংবা সেচের জন্য ডিজেলের ব্যাপারে সরকার কী করলো সেটা জানতে চেষ্টা করতো গ্রামে-গঞ্জের কৃষককুল। এখন বাজেট বিবেচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত 'মিলেনিয়াম গোল ২০১৫', দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ অনেক কিছু। সমসাময়িক

www.pathagar.com

কালের বাজেটের ক্যানভাস অনেক বড়। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ক্যাপিটাল মার্কেট এবং মুদ্রাস্ফীতি সহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মতো বিষয়গুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে কালো টাকার ব্যাপারটি জড়িত হয়ে পড়ে। এখন অর্থনীতি থেকে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্রই 'কালো টাকা' নামক ইস্যুটি একটি বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দৌড়াত্ম কিংবা কুপ্রভাব কাটিয়ে উঠার দৃঢ় মনোভাব সবসময়ই ছিল সাইফুর রহমান সাহেবের। কিন্তু এবার তা বাজেট ঘোষনার আগে কয়েকবার বলাতে বিরোধী দল ও তাদের ঘরানার কিছু অর্থনীতিবিদ এটাকে মূলত একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। এটা ছাড়া তাদের অন্য ইস্যুগুলো এখন তলিয়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন এটা একটি নির্বাচনী বাজেট, তাই এর উত্তাপ অনেক বেশি। তবে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ'র চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান চৌধুরী এ ব্যাপারে একটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। তার উক্তি হলো, কালো টাকা একটি লাগামহীন বড় ষাঁড়ের মতো। তাকে সঠিক পথে ধরে আনতে না পারলে সার্বিক অথনৈতিক অর্জন ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য। এটি ফেলে দেওয়ার মত কোনো কথা নয়। বিকাশমান যে কোনো অর্থনীতিতে কালো টাকা একটি অপরিহার্য অংশ বলেও কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মত প্রকাশ করেছেন। তাকে হঠাৎ করে বাদ দেওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি খুবই সত্য। বিভিন্ন রকম কঠোর আইন করে কালো টাকার উৎসগুলো বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তাকে নিয়ে না বুঝেই অনৈতিকতার প্রসঙ্গ টেনে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হৈ চৈ তোলা কোনো বিজ্ঞ মানুষের কাজ নয়।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি নেতৃস্থানীয় পত্রিকা লিখেছে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাংলাদেশে এবারই দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সব সরকারই এ সুযোগ দিয়ে এসেছে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবও দিয়েছেন। কিন্তু বার বার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও মোট কালো টাকার খুব সামান্য অংশই সাদা হয়েছে। কালো টাকার বড় অংশই রয়ে গেছে অঘোষিত কিংবা অপ্রদর্শিত অবস্থায়। দেশে বর্তমানে ৬০ থেকে ৭০ হাজার কোটির মতো কালো টাকা রয়েছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ১শ' ৭০ হাজার কোটি টাকার কম হবেনা। অথচ সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও ২০০২ এর জুলাই থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা সাদা হয়েছে। এ সময়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নিয়েছে মাত্র ১ হাজার ৭৭ জন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থনীতিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে কালো টাকা ও অবৈধ সম্পদ গড়ার যাত্রা শুরু করেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। রাষ্ট্রীয়করণ, অর্থনৈতিক লুটপাট ও বিভিন্ন গোপন ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে ঐ সময় থেকেই দেশে কালো টাকা পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে মন্তব্য করেছেন দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। এই কালো টাকা মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আবার ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার

www.pathagar.com

পাশাপাশি তার সিলিংও বৃদ্ধি করেছিলেন। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, দেশের অর্থনীতিতে কালো টাকার পুঞ্জিভূত প্রসার ও প্রভাবই পরবর্তিতে ব্যক্তিখাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। তখন থেকেই পাশাপাশি একটি অবৈধ খাতের বিকাশ ঘটতে থাকে যেখানে কালো টাকার পরিমান এখন ১৬০ থেকে ১৭০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের প্রারম্ভিককালে কালো টাকার অসম্ভব প্রভাব থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন অর্থনীতিবিদ ও সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মাহবুব উল্লাহ। তার মতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিকাশও দেশে-বিদেশে সম্পদের লুণ্ঠন ও কালো টাকার আহরণ থেকেই গড়ে ওঠেছে। এক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী যুক্তরাজ্য কিংবা ব্রিটেনের সাথে তার পার্থক্য কোথায়?

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলো বা অবৈধ পথে অর্জিত সকল অর্থ এবং সম্পদ হারাম। এক্ষেত্রে যাকাত ভিত্তিক ইসলামিক অর্থনীতির প্রবর্তণ করা ছাড়া হালাল পথে চলার কোনো বিকল্প পথ নেই। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী কায়দায় অর্জিত সুদও হারাম। এক্ষেত্রে কালো টাকা এবং সুদের মাঝে কোনো প্রভেদ নেই। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈধ-অবৈধ বলে সুস্পষ্টভাবে টানা কোনো লাইন নেই। যে কর্মকাণ্ড আজ অবৈধ কালো টাকা দিয়ে শুরু হয় কাল তা দেশের বৈধ নীতিমালার অধীনে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, উপার্জন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে অনেক সুফল বয়ে আনতে পারে। এ অবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়কে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আলোকে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন ড. মাহবুব উল্লাহ। অবৈধ ও অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৈধ ও নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে আত্মস্থ করার চলমান প্রক্রিয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্য, বলেছেন জনৈক অর্থনীতিবিদ। এ প্রক্রিয়ায় দেশে আইনী অবকাঠামো, ট্যাক্স, ট্যারিফ ও সার্বিক অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কালো টাকা ও কালো অর্থনীতিকে তার উৎসমূল থেকে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে বলে অনেকে সুপারিশ করেছেন। আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম শাহ এ এম এস কিবরিয়াও এর পক্ষে ছিলেন। মরহুম কিবরিয়া তার বাজেটে কালো টাকা সাদা করার চলমান প্রক্রিয়াকে সমালোচনা করাতে অত্যন্ত রুষ্ঠ হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকই নাকি কালো টাকার ছত্রছায়ায় লালিত। এখানে কে কবে স্বেচ্ছায় আয়কর বা শুল্ক দিয়েছে? এখানে বাধ্য না হলে কেউ আয়ের প্রকৃত পরিমাণ যেমন উল্লেখ করেনা, তেমনি আয়কর কিংবা ব্যবসা-বানিজ্য থেকে উপার্জিত আয় বা লভ্যাংশের ওপর ন্যায্য শুল্কও প্রদান করেনা। অবৈধ অর্থ কিংবা কালো টাকার পাহাড় জমেছে মূলত স্বৈর শাসক এরশাদের আমলে। তার প্রায় এক দশকের শাসনামলে দেশে চলেছে অর্থনৈতিক ভাগাভাগি ও মাৎস্যন্যায়। এরশাদের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থনের বিনিময়ে মিলিটারি ও সিভিল প্রশাসনে চলেছে হরিলুট। রাজনৈতিক মহলে বেচাকেনা চলেছে শেয়ার বাজারের মতো। এর আজও কোনো তদন্ত হয়নি তাহলে কী নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক শোরগোল সৃষ্টি করছি আমরা ?

www.pathagar.com

বর্তমান অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে ধন্যবাদ যে তিনি সীমাহীন অনিয়মকে অনেকটা নিয়মের মধ্যে এনেছেন। দেশের বিশৃঙ্খল অর্থনীতিকে একটা শৃঙ্খলা উপহার দিয়েছেন। তিনি অনেক কিছুই ক্রমান্বয়ে কর কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করছেন। শুধু শিল্প কারখানার মালিকরাই যে কর ফাঁকি দেয় তা নয়। এ দেশের চিকিৎসক যারা অর্থ উপার্জনের নামে সিরিঞ্জ দিয়ে রোগীদের রক্ত বের করে নেয়, ইঞ্জিনিয়ার যারা মোটা অংকের ঘুষ ছাড়া বিল পাশ করেনা কিংবা আইনজীবী ও শিক্ষক যারা তাদের প্রকৃত আয় কোনো দিনই ঘোষনা করে না, তারা কী অবৈধভাবে রোজগার করছেন না? তারাও কী কালো টাকার মালিক নয়? কাদের অর্থে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও বড় বড় বাজেটের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে? নির্মিত হচ্ছে বিশাল বাজেটের ছায়াছবি? তবে সবাইকে এক করে দেখা যাবেনা। তাদের মাঝেও ব্যতিক্রম রয়েছে এবং সন্ধান পাওয়া যাবে অনেক সৎ মানুষের। তবে দেশের আজকের বেশ কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এই কালো থেকেই। অবৈধ উপায় ছাড়া আইনসঙ্গতভাবে অর্জিত অর্থ যদি কেউ কর ও অন্যান্য আর্থিক লেভী পরিশোধ না করে গোপন রাখে, সেটাও কিন্তু কালো টাকারই পর্যায়ে পড়ে। সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে হঠাৎ করে কালো টাকার ব্যবহার যেমন বন্ধ করা যায়না, তেমনি তাকে অর্থনীতির স্থায়ী অঙ্গ হিসেবেও অবাধ গতিতে চলার সুযোগ দেয়া যাবেনা। ড. মাহবুব উল্লাহর মতে কালো টাকার ইস্যুকে সামনে রেখে সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী যে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তাতে পুঁজিবাজারে ইতোমধ্যে বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিয়োগ এসেছে। অবৈধ কালো টাকার উপস্থিতি এবং তা সাদা করার কার্যক্রমকে অর্থমন্ত্রী যেমন নীতিগতভাবে অব্যাহত রাখতে চাননা তেমনি আবার হঠাৎ করে তিনি তার অবসানও ঘটাতে পারছেন না। এতে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার অহেতুক প্রয়াস নিষ্ফল হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে নব গঠিত স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিশন দিয়ে কতটুকু এগুনো যাবে তা আমাদের জানা নেই। কারণ এ পর্যন্ত দেশে দূর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তারা যা করেছেন, তাতে জাতি মোটামুটি হতাশ হয়ে পড়েছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ব্যাপক অভিযোগ ওঠেছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে এবারের অর্থাৎ ২০০৫-২০০৬ এর বাজেটকে কেন্দ্র করে কালো টাকা নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা এর আগে আর কখনও হতে দেখা যায়নি। এখানে যে বিষয়টি সমূহ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে তা হলো ১ লাখ ২০ হাজার ১ টাকা আয় হলেই ১০ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে। অপরদিকে মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়েই কালো টাকা সাদা করা যাবে। অনেকে বলেছেন এটা এক ধরনের বাজেট বিশৃঙ্খলা। এরচেয়ে সমালোচনার বিষয় আর কিছুই হতে পারেনা। এ অবস্থায় অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন যে কালো টাকা সাদা করতে হলে মোটা হারে কর দিতে হবে। নতুবা শেষ পর্যন্ত কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ অর্থমন্ত্রী আবারও দিয়েছেন তা বাদ দিতে হবে। কিন্তু বাদ দিলে সমাজে অস্থিরতা বাড়বে বলে এনবিআর চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ না দিলে এসব অর্থ খারাপ কাজে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হবে। কালো টাকা একটি লাগামহীন ষাড়ের মতো বেপরোয়া শক্তি, যা সম্পূর্ণ সামষ্টিক অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এই টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হতে পারে, সন্ত্রাসের প্রসার, বেআইনী অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য ক্রয় এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানির মাধ্যমে বৈদেশিক রিজার্ভের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। অপরদিকে এই অর্থ দৃশ্যমান অর্থনীতিতে সঞ্চালনের মাধ্যমে জাতি ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। কালো টাকা সাদা করার বর্তমান উদ্যোগকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। এখানে ফালতু রাজনীতির অবকাশ নেই বলে তিনি সমালোচনা করেন। তবে বড় রকমের সার্জারি ছাড়া বছরওয়ারি এমনি সুযোগ দিতে থাকলে অর্থনীতিতে কালো টাকার পরিমাণ কমবে না বরং বাড়বে, বলেছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান। তিনি বলেছেন একটি নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে তা সমর্থণ করা যায় কিন্তু এভাবে অনির্দিষ্টকাল একটি অন্যায় এবং অপরাধ চলতে দেওয়া যায়না। একই কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। এ ব্যাপারে তিনি যে অত্যন্ত আন্তরিক তা তার বাজেট ঘোষনার আগে দেওয়া সমস্ত বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

www.pathagar.com

সংসদ অকার্যকর হলে তার জন্য দায়ী কে?

নয়া দিগন্ত, ১১ জুন, ২০০৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর একজন দক্ষ সেনানায়ক হিসেবে জেনারেল ডোয়াইট ডি আইসেনহাওয়ারের নাম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে এক রাজনৈতিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আমরা যদি এই অভিমত পোষন করি যে, আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী যে কোন ব্যক্তি বা দল অসৎ কিংবা জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী, তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে আমরা অধিকার অথবা স্বাধীনতার ধ্বংসলগ্নে উপনীত হয়েছি।" বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজিত কিছু কিছু পরিস্থিতি নিয়ে এ কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। রাজনীতিতে শিষ্টাচার এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে আমি বা আমরা ছাড়া এদেশে কোনো সৎ ও যোগ্য মানুষ, দেশপ্রেমিক কিংবা রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাকারী কোনো শক্তি নেই, এ কথা ঠিক নয়। প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রজ্ঞা এবং দক্ষতার অভাবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হীনজনের ভাষায় কথা বলাটাকেও অনেক সময় নিজের অধিকার বলে মনে করি। ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে কাউকে আক্রমণ করাটাকে এদেশীয় রাজনীতিতে অনেকে তাদের পরম্পরা কিংবা অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধা বলে মনে করে। এটি ঠিক নয়। এতে গণতান্ত্রিক এবং বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং দেশে একটি অবমাননাকর ও নিকৃষ্ট সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বর্তমানে দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তা ঘটে যাচ্ছে। এর কোনো ব্যত্যয় কিংবা পরিবর্তন নেই। একটি জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর অথচ এ কথাগুলো সাহস করে অনেকেই বলছেন না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দাবী করেছেন। দাবী করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। এগুলো তিনি বা তার দল করতেই পারেন। এটি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবী জানিয়ে তিনি আবারও ঘোষনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেবে না। সংসদেই যদি যোগ না দেবেন তাহলে তাদের দাবী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশনের সংস্কার সম্পর্কে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে আলোচনা কিংবা বিতর্ক হবে কোথায় এবং কীভাবে ? দেশের

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ এগুলোর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা কীভাবে শুনবে? তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন সংস্কারের যে দাবী করেছে বিরোধীদল সেগুলো কী, তা আজও জানতে পারেনি দেশের মানুষ। বার বার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও গত ছ'মাসে তাদের কাছ থেকে তারা যে ধরণের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচন কমিশন চান তার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা আসেনি। ১৯৯৫তেও এভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী জানিয়ে আর সংসদে যায়নি আওয়ামী লীগ। এখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের দাবীতে সংসদ বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এতে তাদের মূল সমস্যার সমাধান কতটুকু হবে ? বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক এর জবাব নিশ্চয়ই রাজনীতিকদের কাছ থেকেই আসতে হবে। তবে একজন লেখক-সাংবাদিক হিসেবে আমার মনে হয় সংসদীয় পদ্ধতিতে এটি বোধ হয় দাবী আদায়ের সঠিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। কথায় কথায় সংসদ বর্জন করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের আর থাকে কী? এ প্রক্রিয়ায় যারা সংসদকে পাশ কাটিয়ে চলছেন এক অজ্ঞাত রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে, তারা আবার সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন কোন যুক্তিতে। এ দেশটি শুধু রাজনীতিকদের নয়, এটি আমাদেরও। সুতরাং সে অধিকার নিয়েই এ সঙ্গত প্রশ্নগুলো এখানে তোলা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার, ৯ জুন' জাতীয় সংসদে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। এর আগেই অর্থাৎ গত সোমবার আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকের পর ধানমন্ডিতে তার কার্যালয়ে দল নেত্রী অভিযোগ করেছেন, সরকার যে বাজেট পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা নাকি 'ভাওতাবাজির বাজেট'। তার ভাষায় 'ধোকাবাজির বাজেটের' সাথে তারা নাকি কিছুতেই অংশ নিতে পারেন না। এ অভিযোগ শুনে একজন সাংবাদিক হিসেবে প্রথমে কিছুটা ধন্ধে পড়েছিলাম যে অর্থমন্ত্রীর কালো ব্রিফকেসে বন্দী বাজেট কী শেষ পর্যন্ত তাহলে 'লিক আউট' হয়ে গেল। নতুবা তারা জানলেন কীভাবে যে এ সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটটি একটি 'ধোকাবাজির বাজেট'। পরে শুনলাম বাজেটের আগে জ্বালানী তেলের দাম বাড়ানোর কারণেই তাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। অতীতকালে দেশের বেশিরভাগ রাজনীতিকই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ও বনেদি ঘরের। ছাত্র হিসেবে তাদের কাছে মুখস্ত করে রাখার মতো অনেক মন্তব্য ও বক্তব্য শুনতাম। তাদের ভাষা ছিল উন্নত মানসিকতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখন অতি দ্রুত সে পরিবেশ ও পারিপার্শিকতা বদলে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের অতিঅল্প সংখ্যক রাজনীতিকই রয়েছেন যাদের কাছে আমাদের নবীন প্রজন্ম উচ্চ পর্যায়ের অভিব্যক্তি ও আচরণ শিখতে পারে। তাদেরকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে। এটি জাতিগতভাবে আমাদের জন্য একটি লজ্জার বিষয়।

বাংলাদেশে বিরোধী দলের সংসদ ও নির্বাচন বর্জনের ঘটনা শুরু হয়েছে মূলত সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের সময় থেকে। এরশাদ এদেশের কোনো প্রথাগত রাজনীতিক বা জননেতা ছিলেন না। তার সময় এ দেশে সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার

www.pathagar.com

ছিলনা। তাছাড়া ছিলনা গণতন্ত্রের অবাধ চর্চা ও আচার-আচরণ। জাতীয় সংসদ অর্থে এ দেশে যা-ই বা ছিল, তাতে সবই ছিল গৃহপালিত নেতা-নেত্রী। এমনকি বিরোধী দলকেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল সেভাবে। সে অবস্থা থেকে উত্তরণে অন্যান্যের মধ্যে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের অনুরোধ ছিল প্রবল। তৎকালীন বিএনপির সভানেত্রী এবং সং-াদে ক্ষমতাসীন দলের নেতা হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকে গত প্রায় চারটি সরকার দেশে সংসদীয় পদ্ধতিই জারি বা চালু রেখেছেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর কাছ থেকে ধার করা একটি অপ্রচলিত কনসেপ্ট অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীর ওপর ভর করে ১৯৯৫ সালের সূচনা থেকে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে। তখন থেকেই সংসদ বর্জনকে তারা গণ আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে এগিয়ে নেয়। তাদের সে ধারার আন্দোলন এখনও অব্যাহত রয়েছে। তারই পথ ধরে দেশের সর্ব বৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এখন বলছে সংসদ নাকি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তারা সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন ঘোষনার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার দাবী করেছেন। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং বিএনপি'র মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বাধীন জোটের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোন মাইনরিটি দলের কথায় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া যায় না। আগামীতে তারা ক্ষমতায় এলে আমরা যদি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার দাবী করি তখন তারা কি সংসদ ভেঙ্গে দেবেন? তাছাড়া বাজেট পেশের আগেই বিরোধী দলের নেত্রী কিভাবে বুঝলেন এটা ধোকাবাজির বাজেট? তিনি বলেছেন বাজেটতো একটা লিখিত দলিল। এতে ধোকাবাজির সুযোগ নেই। অহেতুক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে সংসদে এসে যত খুশী কথা বলার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ নেত্রীকে আহবান জানিয়েছেন। বাজেট অধিবেশনে কথা বলতে না দেয়ার অভিযোগ সত্য নয় বলে উল্লেখ করে ভূঁইয়া সাহেব বললেন, কোনো অধিবেশনে কে কতটুকু কথা বলবেন স্পিকার তা আগেই ঠিক করে রাখেন। সে সময় অনুযায়ীই বিরোধী দল কথা বলবে। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সময় দেয়া হবে। এখানে সুযোগ না দেয়ার অভিযোগ অবান্তর বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা অত্যন্ত সঙ্গত হবে বলে মনে করি। গত বছর বাজেট অধিবেশনে সরকার পক্ষের (বিএনপি) সংসদ সদস্যরা (২১৯) কথা বলেছেন মোট ১৫ ঘন্টা ৫৩ মিনিট। অপর দিকে আওয়ামী লীগের সদস্যরা (৬৯) কথা বলেছেন মোট ১২ ঘন্টা ৫৬ মিনিট। সেটি ছিল সংসদের ১২তম অধিবেশন। তাতে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা একদিনেই তার বক্তব্য রেখেছেন ১ ঘন্টা ৫৩ মিনিট। সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের সদস্যরা যতটুকু সময় পেয়েছেন তা কি সরকারী দলের সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি নয়? তাছাড়া শেখ হাসিনা আরও অভিযোগ

www.pathagar.com

করেছেন যে তাদের তিনজন সংসদ সদস্য মারা গেছে অথচ তাদের ওপর শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা এবং সংসদ মূলতবি করলোনা স্পিকার। এ অভিযোগটি সত্য নয়। আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এসএএমএস কিবরিয়া গ্রেনেড হামলায় নিহত হলে বিরোধী দলের নেত্রীসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষন পিছিয়ে দিয়ে বছরের শুরুতে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তার ওপর শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার দাবী জানায়। উত্তরে স্পিকার বলেছিলেন সংবিধান অনুযায়ী বছরের শুরুতে প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষন দেবেন রাষ্ট্রপতি। তারপর শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে কোনো বাধা নেই। দিনের অন্যান্য কর্মসূচি স্থগিত করে সেটি করার প্রতিশ্রুতি দেন স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার। কিন্তু শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী কোনো সদস্যের মৃত্যুতে সংসদ মুলতবী করা যায় না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভাষনের পর স্পিকার মরহুম শাহ কিবরিয়ার ওপর শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেন। কিন্তু তাতে বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত ছিলনা। সে শোক প্রস্তাবের ওপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়া গাজীপুরের আহসানউল্লাহ মাস্টার এবং বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সতীর্থ আব্দুস সামাদ আজাদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির ভাষন সংক্রান্ত কোনো বিষয় না থাকায় সরাসরি তাদের ওপর শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু তাতেও বিরোধী দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংসদে আসেনি। তারা যথারীতি সংসদ অধিবেশন বর্জন করেছিল। বর্তমান অষ্টম সংসদের গত ১৬তম অধিবেশন পর্যন্ত ২৬২ কর্মদিবসের মধ্যে আওয়ামী লীগ সংসদে উপস্থিত থেকেছে মাত্র ৮৩ দিন।

তারপরও গত সোমবার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ এবার সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেবে না। তার মতে সরকার নাকি জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করে ফেলেছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই নাকি সংসদে যোগদান করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব নয়। পরে সংসদ ভবনে বিরোধী দলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কয়েকজন সদস্য সংসদ অধিবেশনে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। তবে এ ব্যাপারে তাদের সভানেত্রীর নেতিবাচক মনোভাবেব কারণে তারা নাকি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আর এগুতে সাহস পায়নি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো; এ অবস্থায় কীভাবে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও গণতন্ত্র সামনে এগিয়ে যাবে? গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে? সরকার গঠণ করতে ব্যর্থ হয়ে বিরোধী গেলেই যদি সংসদ বর্জন করতে হয় তাহলে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যরা তাদের ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করবেন কীভাবে? তাছাড়া সংসদীয় পদ্ধতিতে বিরোধী দলও তো সরকারের একটি অংশ। বিরোধী দলের নেতা ও উপনেতার থাকে যথাক্রমে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা। কিন্তু আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠেছে তা হলো যারা বিরোধী দলে যায় তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য না করে বরং প্রথম দিন থেকেই সরকার পতনের কর্মসূচি ঘোষনা দিতে অস্থির

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং গঠনমূলক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ কোথায়? এটাই যদি হবে তাহলে আমরা সংসদীয় পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলাম কেন? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সরকারই শেষ সরকার নয়। এ ক্ষেত্রে জনগণই নির্বাচিত করে জনগণের প্রতিনিধি ও সরকার। কিন্তু নির্বাচনের পর তাদের মতামতের আর তোয়াক্কা করেনা কেউ। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আসলে জনগণের প্রতি আমাদের দেশে এক শ্রেনীর রাজনীতিকের ন্যূনতম কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। দেশটাকে তারা নিজেরে জমিদারী এবং জনগণকে মনে করে তাদের নেহাত খেদমতগার। তাদের ধারনা ভোট তো জনগণ তাদেরকে দেবেই। ভোট দিতে তারা বাধ্য। না দিলে যেন তাদের সাথে বেইমানী করা হবে। তবে জনগণের (ভোটার) দিকে থেকে এক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন এসেছে।

গত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে এদেশের মানুষ রাজনীতিগতভাবে কতটা সচেতন। তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারনত ভুল করেনা। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোটের সরকার পতনের আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপক জনগণের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। তবু কেন জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করার এ অপপ্রয়াস। উন্নয়ন, উৎপাদন ও সরকারের গতিশীলতা ব্যাহত করলে কারা উপকৃত হচ্ছে? নিশ্চয়ই এদেশ ও জনগণ নয়। এ অবস্থায় বিরোধী দলের উচিৎ হবে অবিলম্বে সংসদে ফিরে আসা। সংবিধানের নিরিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য সংস্কার ও নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা বলা। চক্রান্ত কিংবা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করে ক্ষমতায় যাওয়া যায়না। তারজন্য চাই জনসমর্থন। বাংলাদেশের মানুষ কোনো ডিকটেশন পছন্দ করেনা। তারা অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জানায় বিদেশী রাষ্ট্রের তাবেদারদের প্রতি। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে তারা কখনোই ন্যূনতমভাবে কোনো আপস করবেনা। একথা এদেশের রাজনীতিকরা ভালো করেই জানেন। সুতরাং কারও ওপর ভর করে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় কখনোই অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে না। সুতরাং এখানে জনস্বার্থ ও দেশের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই রাজনীতি করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থেই একে অপরকে মেনে নিতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে রাষ্ট্র পরিচালনায়। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দলমত নির্বিশেষে নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা সংসদীয় পদ্ধতি ও গণতন্ত্র কোনটিই স্থায়িত্ব পাবেনা। স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়বে দারিদ্র্য ও সর্বক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে।

www.pathagar.com

অভিনন্দন ঃ সৎ রাজনীতিকের খোঁজে হাইকোর্ট

নয়া দিগন্ত, ২৮ মে, ২০০৫

রাজনীতি। এই কথাটি শুনলেই এককালে সাধারণ মানুষের মনে জেগে উঠতো আদর্শ, ত্যাগ ও জনসেবার কথা। তখন রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিরা ছিল দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত। জনগণের সার্বিক মুক্তির দিশারী। রাজনীতিকদের চরিত্র ও কর্মকান্ড ছিল আয়নার মতো স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক। তারপর স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এই রাজনীতিকদের একটি বিরাট অংশ হয়ে দাঁড়ালো দেশ এবং জাতির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। সার্বিক দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়ে দেশের রাজনীতি হলো দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মানুষ হলো সন্ত্রাস, জবরদখল, শোষন ও অপশাসনের শিকার। পুলিশ থেকে নিম্ন আদালত পর্যন্ত কোথাও অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়লো। এ অবস্থায় সৎ, শিক্ষিত, সংস্কৃতবান ও মেধাবী মানুষ ক্রমশ রাজনীতিতে আসার সাহস হারিয়ে ফেলছিলো। রাজনীতি পরিণত হয়েছিল একটি লাভজনক ব্যবসায়। পেশীশক্তির অধিকারী, সন্ত্রাসী, মাস্তান ও বিশেষ করে কালো টাকার মালিক সবাই ভীড় জমাতে শুরু করলো রাজনীতিতে। তার ছায়া পড়তে শুরু করলো এ দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোতেও। রাজনীতিকের পরিবর্তে অবৈধ আয় ও কালো টাকার মালিকরা নির্বাচনে অধিক হারে মনোনয়ন পেতে শুরু করলো। পক্ষান্তরে প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা হতো, কত টাকা আছে আপনার যে নির্বাচন করবেন ? টাকাটাই যেন মনোনয়ন প্রাপ্তির মূল মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো। তাই মন্ত্রী ও এমপিদের ছেলেমেয়ে এবং কালো টাকার মালিক ছাড়া প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনেকের পক্ষেই সংসদে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সরকারের আমলে সম্প্রতি একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে যা এ দেশের রাজনীতির প্রেক্ষিত সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।

গত মঙ্গলবার মহামান্য হাইকোর্ট এ ব্যাপারে কিছু সময়োপযোগী ও বিপ্লবাত্মক নির্দেশনা জারি করেছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ এবং প্রশংসা কুড়িয়েছে। দেশের সন্ত্রাসী-মাস্তান, কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি এবং ফৌজদারী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য হাইকোর্ট একটি আট দফা নির্দেশ জারি করেছে। বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তাকে হাইকোর্ট ঘোষিত আট দফা নির্দেশনার আলোকে সকল কাগজপত্র মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে ভুল তথ্য প্রদান কিংবা সত্য গোপন করা হলে দায়ী ব্যক্তির মনোনয়ন

www.pathagar.com

কিংবা সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত একটি রিট মামলা নিষ্পত্তি ক তে গিয়ে হাইকোর্ট গঠিত বেঞ্চের বিচারপতিরা তাদের দেয়া আদেশে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে তাকে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র, কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কিনা তার বিবরণ, অতীতে তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা হয়ে থাকলে তার সর্বশেষ পরিস্থিতি সহ পেশাগত জীবনের পূর্ণ বিবরণ, আয়-ব্যয়ের সর্বশেষ হিসাব এবং কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করে থাকলে তার পূর্ণ বিবরণসহ অর্থ সম্পদের তালিকা পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো কিছু গোপন করা কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবেনা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হলে সে ব্যক্তিকে হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী আট দফার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এফিডেভিটের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে পেশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন তা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাইকোর্টের প্রদত্ত এ নির্দেশনাবলীর ফলে দেশের রাজনীতি এবং নিবেদিতপ্রাণ, সৎ ও সচেতন রাজনীতিকরা অশুভ রাহুর গ্রাস থেকে কিছুটা হলেও বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাছাড়া নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও অনেক বাড়বে বলে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। আইনজীবীদের অনেকে মনে করেন এ নির্দেশনাবলীর কারণে একদিকে যেমন উপযুক্ত, সৎ ও ত্যাগী প্রার্থীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে তেমনি অপরদিকে জনগণও তাদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব পাবেন তাদের কাছে। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনও প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দেয়া সব কাগজপত্র যাচাই করে পরিচ্ছন্ন ও যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে, যা দেশের কাঙ্খিত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। হাইকোর্টের ৮-দফা নির্দেশনাবলী ঘোষিত হওয়ার পর এ বিষয়টা এখন দেশের আইনে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারী আইনজীবী এডভোকেট আবদুল মোমেন চৌধুরী ও তার সহযোগীরা এখন অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছেন যে তারা এ দেশের ভবিষ্যত রাজনীতির একটা খুব বড় উপকার করতে পেরেছেন। তাদের কাছে দেশের সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রকামী, সৎ ও রাজনীতি সচেতন নাগরিকরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। মোমেন চৌধুরীর মতো এ দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মনে করে যে একজন এমপি প্রার্থীর চরিত্র, যোগ্যতা, ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও আয়ের উৎস, ফৌজদারি মামলার আসামি কিংবা ঋণ খেলাপি কিনা এসব তথ্য জানার অধিকার তাদের রয়েছে। যে বিষয়টি এতদিন রাজনীতিকরা নিজেরা করতে পারেননি, তা মাত্র কয়েকজন আইনজীবীর চেষ্টায় হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছে, এটি আমাদের গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে অবশ্যই একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। হাইকোর্টের ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কী না তার দিকে লক্ষ্য রাখার একটি বিরাট দায়িত্ব বর্তাবে এখন গণমাধ্যমের ওপর। বাংলাদেশের প্রত্যেক

www.pathagar.com

জেলা থেকে এখন একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। দেশব্যাপী এখন ৫৩৮টি এবং রাজধানী ঢাকা থেকে ২১৮টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়েও এখন অগণিত পত্র-পত্রিকা বের হয় যাতে দেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অজস্র খবর প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সেভাবে তা করতে পারেনা তবুও তাদের কাছে রাজনীতিকদের সম্পর্কে অনেক খবর থাকে। গণমাধ্যম অবশ্যই জানে দেশের কোন অঞ্চলের রাজনীতিকদের আয়ের উৎস কী ? কারা ঋণ খেলাপী আর কারা সন্ত্রাস-দুর্নীতি, মাস্তানী ও চাঁদাবাজী করে খায়।

বাংলাদেশে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়া সবাই রাজীনিতির সাথে জড়িত হতে চায়। তারা মনে করে এটি অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নাম, যশ, খ্যাতি ও বৈষয়িকভাবে উন্নতি করার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। রাজনীতি এখন অনেকের জন্য বিনা মূলধনে অত্যন্ত লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। তেমন অনেক রাজনীতিক আছেন যাদের জানা মতে কোনো আয়ের উৎস নেই। অথচ তাদের বাড়ী, গাড়ী ও ব্যাংক ব্যালেন্সসহ অনেক বৈষয়িক উন্নতিই সাধিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে আবার এমন অনেকেই আছেন যারা জীবনে সফলভাবে একটি মুদি দোকানও চালায়নি কখনো অথচ এখন তারা ব্যাংক-বীমাসহ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিরাট অংশীদার। এ ব্যাপারে আয়কর বিভাগের কোনো তদন্ত নেই। নেই কোনো জিজ্ঞাসাবাদ। এদেশ যেন দুর্নীতিবাজদের এক অভয়ারণ্য হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই চলে এসেছে। বর্তমান সরকার এ সমস্ত দুর্নীতি ও মাৎসন্যায় রোধকল্পে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছিলেন কিন্তু অভ্যন্ত রীণ কোন্দলের কারণে তা আজও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলোনা। এ ব্যর্থতা সরকারের নয়, কমিশনের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সাফাই গেয়ে কোনো ফায়দা হবেনা। বিড়াল সে সাদা কিংবা কালো যাই হোক, তাকে ইঁদুর ধরতেই হবে। নতুবা শিকারী কুকুর লাগাতে হবে। নতুবা দেশ এগুবেনা। সততা, নীতি, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বলে সমাজে কিছু থাকবে না। রাজনীতির নামে মৌরুসিপাট্টা, ব্যবসায়ের নামে পুকুরচুরি, সমাজ-সেবার নামে দুর্বৃত্তায়ন এবং কৃষ্টির নামে ধনীক শ্রেণীর অপসংস্কৃতি এবং শিল্পায়নের নামে এক শ্রেণীর শিল্পপতির বিদেশে অর্থ ও সম্পদ পাচার চলতেই থাকবে।

বাংলাদেশে আধুনিক কোনো প্রসঙ্গ টেনে আনতে গেলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের নামটি অকপটে সামনে চলে আসে। তিনি অত্যন্ত সংগত কারণেই একটি প্রবাদতুল্য কথা বলেছিলেন যে, আমি ..... তাদের জন্য রাজনীতি কঠিন বা দুঃসাধ্য করে তুলব। ওরা কী ধরনের রাজনীতিক? শহীদ জিয়া সে ধরনের রাজনীতি চাননি এ সম্ভাবনাময় দেশটির জন্য। তিনি রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য খুঁজে বেড়িয়েছিলেন অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের। যার মধ্যে তিনি মেধার স্ফূরণ দেখেছিলেন, তাকেই টেনে এনেছিলেন জাতি গঠনের কাজে। হাতাকাটা কোট পরা তেমন ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিকের সন্ধান বেশি করেননি তিনি। করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মেধাসম্পন্ন মানুষের, যারা দেশ এবং জাতিকে কিছু

www.pathagar.com

দিতে পারতেন। যারা সৎ, নির্লোভ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক এবং কঠোর পরিশ্রমী। একবিংশ শতাব্দির উপযোগী বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তেমন লোকেরই সন্ধান করতে হবে এখন সবচেয়ে বেশি। কোনো মন্ত্রী বা এমপি'র যোগ্য ছেলে বা মেয়ে রাজনীতি করতে আসা দোষের কিছু নয়। কিন্তু দেখতে হবে তারা কী আদৌ রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যতিক্রমধর্মী কেউ, না রাজনীতিকে তারা গ্রামে গঞ্জের পীরালী ব্যবসায়ের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানোর জন্য গ্রহণ করছেন। এ সমস্ত বহুবিধ কারণে আজ রাজনীতিকে কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে মুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনে আসছে নির্বাচন। সে নির্বাচনের নিরিখে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে সংসদ সদস্যদের প্রতি বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে তাদের জন্য শিক্ষনীয় অনেক কিছু রয়েছে। ঐ অবস্থায় এসেছে হাইকোর্টের নির্দেশাবলী যা দেশের বর্তমান রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে একটি গঠনশীল আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের সর্বস্তরে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ভবিষ্যতে নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের হাইকোর্টের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা অনেক সহজ হবে। কথায় বলে রাজনীতি রাজনীতিকদের জন্য। কিন্তু আজকাল দেখা যায় ব্যবসা-বানিজ্য, ঠিকাদারী কিংবা যেনতেনভাবে অর্থ-প্রতিপত্তি করেছেন এমন বহু মানুষকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ভীড় জমাতে। এক সময় বিভিন্ন দলে তাদের কিছুটা কদরও ছিল। তাদের নিজেদের কদর না থাকলেও তাদের অর্থের ছিল। এদেশের নির্বাচন নাকি টাকার খেলা। যে যত টাকা খচর করতে পারবে তারই নাকি নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা বেশি। এ কথাটি কম বেশি সকল রাজনৈতিক দলই বিশ্বাস করা শুরু করেছিল। এবং সেদিন থেকেই এ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কালো টাকা, পেশীশক্তি, সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের। প্রধানমন্ত্রী এনইসি'র বৈঠকে সম্প্রতি বলেছেন, "আমাদের রাজনীতি জনকল্যানের জন্য। বেশীরভাগ মানুষকে গরীব রেখে দেশের উন্নতি হবেনা।" কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের রাজনীতিক বা সংসদ সদস্য দিয়ে কী দেশের দারিদ্র বিমোচন মোটেও সম্ভব? যে সমস্ত সদস্যরা গরীবের জন্য কিংবা ছোটখাট উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত গম বিক্রি করে খায়, রাস্তাঘাট মেরামত, কালভার্ট কিংবা ছোটখাট ব্রীজ নির্মানের টাকা থেকে ঠিকাদারের কাছে কমিশন চায়, তাদেরকে কেন বারবার মনোনয়ন দিতে হবে? নির্বাচন জেতার কী এমন অলৌকিক গুণাবলী রয়েছে তাদের মধ্যে? একটি দল নির্বাচনে বিজয়ী হয় তার নির্বাচনী ইশতেহার, অতীতের অর্জন এবং ভবিষ্যতে সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির জন্য। সাংগঠনিক শক্তি, দলগত অবস্থান এবং নেতৃত্বের বলিষ্ঠতার কারণে। কোনো প্রার্থীর কালো টাকা কিংবা পেশীশক্তির জন্য নয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কিংবা ভোটাররা রাজনীতিগতভাবে আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশী সচেতন। নির্বাচনের সময় কেউ কেউ অন্যের টাকা খরচ করালেও ভোটটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থীদেরকেই দেয় তারা। সে কারণেই বলছি, হাইকোর্টের ঘোষিত ৮ দফা নির্দেশনা যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে। এটি অত্যন্ত কাঙ্খিত এবং স্বাগত জানানোর মতো একটি বিষয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

সুপ্রিম কোর্টে শক্তির লড়াই !

নয়া দিগন্ত, ২১ মে, ২০০৫

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অঙ্গন যেন ক্রমশই দলীয় রাজনীতি বা কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান মঞ্চে পরিণত হচ্ছে। কোনো কোনো দলের প্রধান দপ্তর যেন এখন সুপ্রিমকোর্টের আঙ্গিনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে বিচার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কিংবা স্বাধীনতার প্রশ্ন নয় বরং দলীয় রাজনীতি, স্বার্থ এবং সাংগঠনিক শক্তিমত্তা প্রদর্শনের অসাংবিধানিক আচরণই যেন প্রাধান্য পাচ্ছে। এতে জনমনে দেশের বিচার বিভাগ, সর্বোচ্চ আদালত এবং আইনজীবীদের শিষ্টাচার সম্পর্কে যে চিরাচরিত ভাবমূর্তি, মর্যাদা এবং শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠেছিল তা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। দাড়িপাল্লা সম্বলিত মহান বিচার বিভাগের প্রতীক বহনকারী সুপ্রিম কোর্ট ভবনের ঐশী ছায়াতলে যে দলবাজি ও রাজনৈতিক অপকর্ম শুরু হয়েছে তাতে একদিকে সমস্ত বিচার ব্যবস্থা এবং অপরদিকে আইন পেশার মানুষগুলোর নীতি-নৈতিকতার প্রতি দেশবাসী যেন শ্রদ্ধা-ভক্তি হারিয়ে ফেলছে।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির শিক্ষাগত সনদপত্র নিয়ে বিচারাধীন রীটের রায়ের আগে এ সম্পর্কে কোনো আন্দোলন বা বিচারপতিকে বেঞ্চে বসতে বাধা দেয়ার কার্যক্রমকে সংবিধানের পরিপন্থী বলে রুলিং দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অসাংবিধানিক আচরণ ও আদালত অবমাননার জন্য আন্দোলনকারী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি রুল ইস্যু এবং তাদের সনদ বাতিলের জন্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করতে পারেন। প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্ট বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ও সুপ্রিমকোর্ট বারের সভাপতিসহ একটি বিশেষ দলের সমর্থক আইনজীবীদের আপত্তিকর বক্তব্যকে স্বাধীন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র বলে স্পিকার উল্লেখ করেছেন। জাতীয় সংসদের সদ্য সমাপ্ত ১৬তম অধিবেশনে এ বিষয়ে কয়েকজন সংসদ সদস্যের আনীত পয়েন্ট অফ অর্ডারের বক্তব্যে রুলিং দিতে গিয়ে স্পিকার এ সমস্ত কথা বলেছেন। সদস্যরা অভিযোগ করেছিলেন যে প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি এবং সুপ্রিমকোর্ট বারের সভাপতিসহ একটি বিশেষ দলের সমর্থক আইনজীবীদের বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর যা স্বাধীন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের সামিল। সদস্যরা আরও বলেছেন যে, একটি দলের সমর্থক এই আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এই বক্তব্যের মাধ্যমে সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে অবমাননা করেছেন। স্পিকার তার জবাবে বলেছেন, সুপ্রিমকোর্ট ও বিচারপতিগণ স্বাধীন, এমনকি সংসদও কোন সময় বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করেনা। প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতি তার কাছে জবাবদিহিতায় দায়বদ্ধ এমন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

সুপ্রিমকোর্ট অঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদও বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি বিশেষ দলের সমর্থক আইনজীবীরা বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি নস্যাৎ তথা স্বাধীনতা খর্ব করতে গত এক বছর ধরে সুপ্রিমকোর্ট অঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন। তার ভাষায়, সুপ্রিমকোর্ট অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিচার বিভাগ এবং তার অভিভাবক প্রধান বিচারপতির ভাবমূর্তি রক্ষা করা শুধু আইনজীবী নয়, সকল নাগরিকের কর্তব্য। প্রধান বিচারপতি শুধু সুপ্রিমকোর্টেরই প্রধান বিচারপতি নয়, তিনি সমগ্র দেশের প্রধান বিচারপতি। তাকে উদ্দেশ্য করে যে সব বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে তা সকল মানুষের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে বলে আইনমন্ত্রী তার উপলব্ধি বক্তব্য করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যারা একদিকে গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলেছেন তারাই আরেকদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন। এদের অতীত কার্যক্রম প্রমাণ করে যে এরা বিচার বিভাগের মান মর্যাদায় বিশ্বাস করেনা। এদের পূর্বসুরীরা পবিত্র সংবধিানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ১৯৭৫ সালে দেশে একদলীয় স্বৈরাচারী বাকশাল গঠন করেছিল। তারা বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধস্তন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করেছিল। পরিশেষে আইনমন্ত্রী বলেছেন, তারা যে প্রধান বিচারপতির অপসারণের কথা বলেছেন তা সংবিধান সম্মত কিনা তা জাতি বিচার করবে। তিনি বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে এসব কার্যক্রম থেকে তাদের বিরত থাকার পরামর্শ দেন। দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সেটি হয়নি। বরং হিতে বিপরীত হয়েছে।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। গত মঙ্গলবার সমিতির এক জরুরী সভা ডেকে তারা এ সিদ্ধান্ত নেন। বিচারপতি ফয়সাল মাহমুদ ফয়েজীকে কেন্দ্র করে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির বিরোধী দলীয় আইনজীবীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তারা এখন সুপ্রিমকোর্টে সকল বিচারপতির আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এ সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে মঙ্গলবার পাল্টা সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদ। জাতীয়তাবাদী পরিষদের মহাসচিব অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেছেন, স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার ও আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সদস্যপদ বাতিলের এখতিয়ার তাদের নেই। তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অকার্যকর। আইনজীবী সমিতির কোনো সদস্যের পদ খারিজ করতে হলে তা এজেণ্ডা দিয়ে সভা ডাকতে হয়। এ অবস্থায় দেশের বর্ষীয়ান আইনজীবী ড. কামাল হোসেন দৃশ্যত রাজনৈতিক কারণেই যোগ দিয়েছেন বিরোধী শিবিরের সাথে। তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কাঙ্খিতভাবেই তিনি স্পিকার জামিরউদ্দিন সরকারের রুলিংকে সমালোচনা করেছেন। বলেছেন,

www.pathagar.com

স্পিকারের এ রুলিং অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করবে। আইনজীবীদের আন্দোলনের বিষয়ে সংসদে নাকি রুলিং হতে পারেনা। সংসদের বাইরের কোনো বিষয় নিয়ে সংসদের ভিতরে রুলিং দেয়া যায়না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট ও তার প্রধান বিচারপতির বিষয়টির সাথে যে সংবিধানের সম্পৃক্ততা রয়েছে সে প্রশ্নটি তিনি সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। বিরোধীদলীয় আইনজীবী যারা বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন, তারা শেষ পর্যন্ত এটিকে (সমিতিকে) দ্বিখন্ডিত করার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। তারা তাদের সরকার পতন আন্দোলনের অংশ হিসেবে বর্তমানে উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগকে অকার্যকর করে তুলতে চান বলেও জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি থেকে তাদের সদস্যপদ বাতিলের বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছেন আইনমন্ত্রী। তিনি এধরনের পদক্ষেপকে আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, স্পিকার কিংবা মন্ত্রী হওয়ার পর আইনজীবী সমিতির সদস্য থাকা যায় না। এ অবস্থায় সহযোগী সদস্যদের বিরুদ্ধে এ ধরনের উদ্যোগ হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে সম্পূর্ণ পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। সে সমস্ত নির্বাচনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক থেকে শুরু করে আব্দুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, মির্জা গোলাম হাফিজ, ড. আলিম আল রাজি, বিচারপতি টি এইচ খান, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ, শামসুল হক চৌধুরী এবং ড. কামাল হোসেন পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন। তারা কোনো দল কিংবা রাজনৈতিক দলাদলিকে সমিতির নির্বাচনে টেনে আনেননি। ফলে তখন দলীয় রাজনীতি সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পরিকল্পিতভাবে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক সারা দেশ থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীদের সুপ্রিমকোর্ট বারের সদস্যপদ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। বার কাউন্সিলে দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী আইনজীবীগণ নেতৃত্বে থাকায় তাদের দলীয় আইনজীবীদের হাইকোর্টে এনরোলমেন্টের সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপকভাবে তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করে। এ সময় প্রবীন আওয়ামী আইনজীবীগণ জুনিয়র আইনজীবীদেরকে তাদের চেম্বারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। এতে করে নবীন আইনজীবীরা প্রবীনদের অনুসারী হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সিনিয়র জাতীয়তাবাদী আইনজীবীগণ ব্যাপকভাবে জুনিয়রদের টেনে নেননি বা নিতে পারেননি। ফলে ছাত্র জীবনে ছাত্রদল ও শিবির করা অনেক নবীন আইনজীবীও আওয়ামী আইনজীবীদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এবং জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদের দ্বন্দ্বই মূলত সরকার সমর্থক আইনজীবীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। এ দ্বন্দ্বের কারণেই বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবীদের কাছে বার বার পরাজয় ঘটেছে

www.pathagar.com

তাদের। এটর্নী জেনারেলের অফিসে আওয়ামী লীগ সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের অনুসারী আইন কর্মকর্তাদের উপস্থিতি, আওয়ামী মন্ত্রী ও সিনিয়র নেতাদের ঘনিষ্টজনদের ব্যাপকভাবে আইন বিভাগে কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগদান এবং ত্যাগী জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের মূল্যায়নে ব্যর্থতাও সমিতির নির্বাচনে জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। তাছাড়া পরবর্তীতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও নানা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সাধারণ আইনজীবীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের অতি প্রবীন এবং তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রবীনদের মাঝে আওয়ামী আইনজীবীদের ঠেকানোর মতো তেমন কোনো সমঝোতা কিংবা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেই, যার ফলে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতিতে অনাকাঙ্খিত হলেও রাজনৈতিক কোনো ভারসাম্য নেই দুটি প্রধান গ্রুপের মধ্যে। তাই বিরোধী দলীয় আইনজীবীরা শুধু সুপ্রিমকোর্টে নয় সারা দেশব্যাপীই রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত প্রভাব ঘাটাতে শুরু করেছেন। তাদের আধিপত্য এখন এতই বেড়ে গেছে যে মাঝে মাঝে বুঝতে ভুল হয় তাদের আসল পেশা কোনটি। রাজনীতি না আইন ব্যবসা ? এ অবস্থায় তারা ফেডারেল ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের মতো ভাঙ্গনের মুখে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিকে।

বিচারপতি ফয়সাল মাহমুদ ফয়েজীর শিক্ষাগত সনদপত্র নিয়ে বিচারাধীন রীটের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি সংসদের স্পিকার এবং আইনমন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে সুচিন্তিতভাবে বিবেচনায় না নিয়ে বরং একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে যেন গ্রহণ করেছেন সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ। দেশের সর্বোচ্চ আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দের এ ধরনের আচরণ ও মানসিকতা দেশবাসীকে অত্যন্ত হতাশ ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সুপ্রিমকোর্টে বিরাজমান বর্তমান এই সঙ্কট বা পরিস্থিতির নিরসন না ঘটলে দেশের আইন-আদালত এবং আইন পেশায় নিয়োজিত একটি আলোকিত সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে বলে সমাজ সচেতন মানুষ বিশ্বাস করে। আইন ব্যবস্থা কিংবা আদালতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটানো যায় না। বরং উচ্চ আদালতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে কিংবা আদালত বর্জন করে দেশের নিরীহ জনগণকে দ্রুত বিচার পাবার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটানো হয়। এটি একটি গণবিরোধী কাজ। শুধু আইনজীবীরা নয়, কোনো দায়িত্বশীল মানুষই তা করতে পারেনা। সুতরাং দেশের স্বার্থ, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী শিক্ষিত, সচেতন, পেশাজীবী ও আলোকিত মানুষের কাজ হলো দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সাহায্য করা, তাতে বিঘ্ন ঘটানো নয়। দেশ ও তার জনগণের অধিকার ও স্বার্থের দিকে নজর রাখা, কোনো গোষ্ঠি বা দলের নয়। এটি ভুলে গেলে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ বরং প্রধান বিচারপতি এবং সরকারকে বাধ্য করবেন আইনানুগ (কঠোর) ব্যবস্থা নিতে যা কারো জন্যই সুখকর হবেনা।

www.pathagar.com

পানি সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐক্য

নয়া দিগন্ত, ১৪ মে, ২০০৫

বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটিকে বঙ্গোপসাগর কিংবা ভারত মহাসাগরের অপর প্রান্তে স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। সংস্থাপন করা সম্ভব নয় উত্তর আমেরিকা কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো নিরাপদ অথবা শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে। যত সমস্যাই থাক্ বাংলাদেশকে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের পাশেই সহাবস্থান করতে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ্বের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের অবস্থানগত বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ও তার সার্বিক অবস্থার প্রতি ভারতের শাসকগোষ্ঠির মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলাতে পারলে সবকিছু বদলানো সম্ভব হবে বলে অনেকে মনে করেন। দু'দেশের মধ্যে পানি বন্টন, পর্বতপ্রমাণ বানিজ্য ঘাটতি, সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া নির্মাণ, পুশ ইন এবং ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারসহ সর্বশেষ "নদী স্থানান্তর প্রকল্প" পর্যন্ত সবকিছুই বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরী আচরনের বহিঃপ্রকাশ বলে আমাদের জনগণের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্ম নিয়েছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কোনো অমর্যাদাকর ও অস্তিত্ব বিপন্নকারী ব্যবস্থা বাংলাদেশ তার নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছে আশা করেনা। কিন্তু নেহাত দুঃখজনক হলেও তা ক্রমাগত ঘটে যাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশীরা ক্রমশ ভারত বিদ্বেষী হয়ে ওঠছে এ কথা সত্যি না হলেও, তারা যে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির প্রতি ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে এবং তাদের রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চরমভাবে হতাশ হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের কল্পিত উত্থান দেখিয়ে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি ও তাদের বাংলাদেশী তাবেদাররা এ ক্ষেত্রে বিরাজিত প্রকৃত ঘটনাকে লুকাতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ বিভিন্ন মহলে ইতোমধ্যে অভিযোগ ওঠেছে যে, ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাংলাদেশের সঙ্গে নয়, এ দেশের একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গড়ে ওঠেছে। এটিকে অনেকে ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলেই চিহ্নিত করে থাকে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরাজিত সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়তো একদিন দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতেই হয়ে যাবে। বর্তমান পর্বত প্রমাণ বানিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা নিয়েও হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। তবে যে বিষয়টি নিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও দেশের আপামর জনসাধারণ সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা হলো দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদীর পানি বন্টন এবং অভিন্ন নদীতে সংযোগ খাল খননের মাধ্যমে ভারতের পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পায়তারা। উল্লিখিত অভিন্ন নদীগুলোর মধ্যে একমাত্র গঙ্গার পানি বন্টনের ব্যাপারে

www.pathagar.com

ভারতের সাথে চুক্তি রয়েছে। তাও আবার ভারতের সাথে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাক্ষরিত গ্যারান্টি ক্লজ বিহীন সে চুক্তিতে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এখনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি তিস্তা সহ বিভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে। যার ফলে কিছুদিন আগেও পানির অভাবে তিস্তা প্রকল্প এমনিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ভারত তার দেশের অভ্যন্তরে অভিন্ন নদীসমূহের ওপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবাহের বিঘ্ন ঘটিয়ে পানি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। এ ঘটনা শুধু এখানেই শেষ নয়, ভারত এ সমস্ত অভিন্ন নদীতে সংযোগ খাল খননের মাধ্যমে পানি সরিয়ে নেওয়ার জন্য হাতে নিয়েছে এক মেগা প্রকল্প। ভাটি অঞ্চলের বাংলাদেশের চাপের মুখে ভারত এখন এ প্রকল্পের নাম পাল্টে করেছে "নদী স্থানান্তর প্রকল্প"। আন্তর্জাতিক আইনে কোনো অভিন্ন বা আন্তর্জাতিক নদীকে নিজের খেয়াল-খুশি কিংবা ইচ্ছামতো সরিয়ে নেয়া যায় এমন তুঘলকি কথা সভ্য জগৎ শুনেছে কী না জানিনা। তাছাড়া অভিন্ন নদীর ওপর যত্রতত্র একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করারও কোনো বিধান নেই। এ অবস্থায় উপমহাদেশের বড় দেশ হিসেবে ভারত যে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাচ্ছে তা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এখানে চীন, ভূটান ও নেপালের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ সারা বছর এ অভিন্ন নদীগুলোর অবাধ প্রবাহের ওপর নির্ভর করে ভাটি অঞ্চলের দেশ বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, নৌ-যোগাযোগ, পরিবেশ, ভূ-প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রের অস্তিত্ব। এক কথায় এ নদীগুলোর প্রবাহের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বাংলাদেশের অস্তিত্ব।

ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৩টি অভিন্ন নদীর বেশ কয়েকটির ওপর বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে এর মধ্যেই বাংলাদেশের ২০টি ছোট ও মাঝারি নদী বিলীন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের সে সমস্ত অঞ্চলে এখন মাছ এবং বিভিন্ন ধরনের পাখ-পাখালি ও জীব-বৈচিত্র ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শীত মওসুমে রবি শস্যের জন্য পাওয়া যাচ্ছেনা প্রয়োজনীয় সেচের পানি। বড় বড় নদীতে ক্রমশ চর সৃষ্টির ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নাব্যতা। এসব মিলিয়ে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে চির সবুজ বাংলাদেশের নয়নাভিরাম দৃশ্যপট। মিঠা পানির অভাবে লবণাক্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সুন্দরবন। এ মুহূর্তে যথাবিহিত ব্যবস্থা না নিলে বিশ্ব সংস্থার ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের একটি ঐতিহ্যশালী প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনও বিরানভূমিতে পরিণত হবে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে যে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলে তাতে উজার হয়ে যাবে এ অঞ্চলের চির চেনা জনপদ। এ রকম একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। 'গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের পানি সম্পদের কৌশলগত তাৎপর্য' শীর্ষক ঢাকায় আয়োজিত এক

www.pathagar.com

গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পানি বন্টন সংক্রান্ত অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে অবিলম্বে মন্ত্রী পর্যায়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের সভা অনুষ্ঠান আবশ্যক। নদী কমিশনের এ বৈঠক বছরে যেখানে চারবার হওয়ার কথা, সেখানে বিগত চার বছরে মাত্র একবার তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, পানি বাংলাদেশের জন্য জীবন মরণ সমস্যা, যা এ দেশের জনগণের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম তথ্য ও উপাত্ত পেলে বিশেষ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণে কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে এ ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র দুর্ভাগা দেশ যারা উজানের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রয়োজনে কোনো সাহায্য পায় না।

অভিন্ন নদীর পানি বন্টন ও প্রস্তাবিত নদী স্থানান্তর কার্যক্রম বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে। তাই গোল টেবিল বৈঠকের অন্যান্য আলোচকরা বলেছেন, রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা ছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠকে পানি বন্টন সম্পর্কিত সমস্যা সমূহ নিস্পত্তি সম্ভব নয়। অথচ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা এলাকায় বসবাসকারী মানুষের বেঁচে থাকা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা রক্ষায় পানির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ এলাকার উন্নয়নে ও রাজনৈতিক স্থিতি এবং স্থায়িত্ব রক্ষার্থে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন বলে আলোচকরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আন্তঃনদী পানি সমস্যা সমাধান না হওয়ার মূল কারণ হলো যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক নিয়মিত না হওয়া। এটি ভারত সরকারের একটি জটিল মনোভাবের কারণেই হচ্ছেনা বলে অনেকের ধারণা। তবে এ ক্ষেত্রে ভারতের চলমান দৃষ্টিভঙ্গি অবিলম্বে পরিবর্তন করা আবশ্যক বলে মনে করি। কারণ কূটনৈতিক দৃষ্টিতে একটি দেশের বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত অপর একটি দেশ বা তার জনগণের সাথে, সে দেশের নির্দিষ্ট কোনো দলের সঙ্গে নয়। বাংলাদেশে এমন কিছু তথাকথিত দল রয়েছে যারা নেহাত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য নির্দ্বিধায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থও জলাঞ্জলি দিতে পারে। এমন অভিযোগও রয়েছে। জনগণ তাদের বিশ্বাস করেনা। বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ভারতকে এ বিষয়টি অত্যন্ত সচেতনভাবে মাথায় রাখতে হবে। নতুবা বর্তমান অচলায়তনের অবসান ঘটবে না।

শুষ্ক বা খরা মৌসুমে বাংলাদেশের তীব্র পানি সঙ্কট এবং বর্ষা মৌসুমে ভারতের ছেড়ে দেয়া বাঁধের পানিতে সৃষ্ট প্রলয়ংঙ্করী বন্যার বিষয়টি ঢাকাস্থ বর্তমান ভারতীয় হাই কমিশনার বুঝেন কিনা জানিনা। ভারতীয় হাই কমিশনার বীণা সিক্রি একটি কথা

www.pathagar.com

বার বার বলেন যে, গঙ্গার পানি চুক্তির চেয়ে গড়ে বেশি পানি পাচ্ছে বাংলাদেশ। তা সত্ত্বেও কেন বাংলাদেশ পানি কম পায় বলে অভিযোগ করে তা নাকি তিনি বুঝেন না। এর জবাবে বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে বাংলাদেশ গঙ্গা চুক্তির চেয়ে বেশি পানি পাচ্ছে এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ বর্ষাকালে ভারত থেকে যে বানের পানি আসে তা আমাদের প্রয়োজন নেই। ফারাক্কা বাঁধ দেওয়ার আগে বাংলাদেশে শুকনো মৌসুমে গঙ্গার সর্বনিম্ন পানির প্রবাহ ছিল ৭০ হাজার কিউসেক। এখন তা অর্ধেকেরও কম। এ অবস্থায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের পক্ষে কঠিন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের পানি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সবকটি অভিন্ন নদীর পানি বন্টন বিষয়েই অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা উচিত। ভারত বাংলাদেশের জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার কথা বিবেচনায় রেখেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তঃনদী সমস্যার সুরাহা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ভারত বলছে তারা এমন কিছুই করবেনা যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। ভারত তাদের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে কোন আন্তর্জাতিক নদীকে সংশ্লিষ্ট করলে নদীর অংশীদার সকল দেশের সঙ্গে আলোচনা করবে। এ প্রকল্পটি নাকি বর্তমানে পুরোপুরি ধারণার পর্যায়ে রয়েছে। অথচ ভারত ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সরিয়ে গঙ্গা নদীতে ফেলে সেখান থেকেই এই পানি দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে নেয়ার নীল নকসা তৈরী করছে। বাংলাদেশের পানির মোট ৬৫ ভাগ ব্রহ্মপুত্র থেকে আসলেও এ ব্যাপারে কোনো যৌথ গবেষণা নেই। অভিন্ন বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের ভারতীয় সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া নদী সংযোগ প্রকল্প যদি তাদের ধারণা পর্যায়েই থেকে থাকে তাহলে ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী কীভাবে বললেন যে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার পানির আন্তঃ অববাহিকা স্থানান্তরের ধারণার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বলেছেন, তারা নদী সংযোগের সম্ভাব্যতার ব্যাপকভিত্তিক জরিপ শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে তারা নাকি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তাদের সন্তোষের ভিত্তিতেই তা বাস্তবায়ন করা হবে। এটি একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য বলে আমরা মনে করি।

এখানে বাংলাদেশের জন্য প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক কিংবা অভিন্ন কোনো নদীতে ভাটি অঞ্চলের একটি শরিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশী আন্তঃ নদী সংযোগ কিংবা তথাকথিত নদী স্থানান্তর এবং বাঁধ নির্মাণ করে স্বাভাবিক স্রোতধারায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দিতে রাজি আছে কী না। ভারতের সাবেক পানি সচিব রাম স্বামী আয়ার সম্প্রতি বলেছেন নদী সংযোগ খাল খনন কিংবা তথাকথিত নদী স্থানান্তরের ফলে শেষ পর্যন্ত নদীই হারিয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি রাশিয়ার অভিজ্ঞতার কথা

www.pathagar.com

তুলে ধরে বলেছেন, অপরিনামদর্শী পরিকল্পনার জন্য বিশাল হ্রদ কিংবা জলাধারও শুকিয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এ ধরনের প্রকল্পের পরিণাম এবং বাংলাদেশের ওপর তার ভবিষ্যত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। অভিন্ন নদী থেকে পাইপ দিয়ে পানি নিয়ে সেচ কাজ চালানো আর আন্তঃনদী সংযোগ খাল খনন এবং বাঁধ নির্মাণ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ এখনই আপত্তি জানাতে পারে। আশ্রয় নিতে পারে আন্তর্জাতিক সালিশ-এর। নতুবা সাহায্যের জন্য যেতে পারে জাতিসঙ্ঘের কাছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী ইতিমধ্যে কিছুটা আভাসও দিয়েছেন। সে জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য সীমাহীনভাবে ক্ষতিকর অভিন্ন নদীর পানি এভাবে সংযোগ খাল খনন এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রত্যাহার কিংবা বাধাগ্রস্ত করার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য ভারতের বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের সাথে ব্যাপকভাবে মত বিনিময় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের সাথেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি দু'দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়েও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানে আসা প্রয়োজন। নতুবা দু'দেশের মধ্যে সমস্যা, মতবিরোধ ও বিদ্বেষ ক্রমশই বেড়ে যাবে। এতে কোনো নির্দিষ্ট দলের লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ও তার জনগণের সর্বনাশা হয়ে যাবে। এখানে একটি-দু'টি নদী নয়, ৫৩টি অভিন্ন নদী নিয়ে কথা, যার ওপর বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য ও ভূ-প্রকৃতি নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে ভারতের সাথে একটি বাস্তব ভিত্তিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতায় আসতে হবে। একমাত্র তা হলেই সকল বৈরীভাব কাটিয়ে চিরদিন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করতে পারবো।

www.pathagar.com

আমাদের সীমান্তে সমস্যার বেড়াজাল

নয়া দিগন্ত, ২৪ এপ্রিল, ২০০৫

তৎকালীন উপমহাদেশের প্রস্তাবিত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রেডক্লিফ কমিশনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে মূলত বিভিন্ন কুকীর্তির কারণে। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান নয় বরং সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলে রেডক্লিফ ও তার কমিশনের ব্রিটিশ ও ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের অপকর্মের কথাও কোনো মতে ভুলবার নয়। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা শুধু আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি বিশেষ অংশ থেকেই আমাদের বঞ্চিত করেনি, সমস্যা সৃষ্টি করে গেছে বর্তমানে যে সীমানা রয়েছে তা নিয়েও। রেডক্লিফ তার মৃত্যুর আগে এসব কথা নিজেই স্বীকার করে গেছেন। নিজের অপরাধবোধ থেকেই অনেক দুঃখ করে গেছেন সেসব কুকীর্তির জন্য। তাছাড়া অবশ্য এ কমিশনে অন্তর্ভূক্ত প্রস্তাবিত পাকিস্তান (মুসলিম লীগ) অংশের সদস্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিতি এবং ব্যর্থতাকেও একটি অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর কথায় কথায় আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘন, গুলি করে নিরীহ বাংলাদেশীদের হত্যা, কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ ও পুশইন সহ বিভিন্ন কার্যকলাপে অস্থির, উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত্র হয়ে উঠেছে আমাদের সীমান্ত বর্তী অঞ্চলের নিরীহ জনসাধারণ। গত সপ্তাহে ঢাকায় যখন সীমান্তে শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিডিআর এবং বিএসএফ-এর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চলছিল তখনও বিএসএফ-এর অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তে। তাদের গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে একটি নিরপরাধ শিশু এবং আহত হয়েছে অনেকে। পাল্টা গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে বিএসএফ-এর অফিসার সহ দু'জন। অথচ এর জন্য ভারতীয় হাই কমিশনার বীনা সিক্রি দায়ী করেছেন বিডিআর জওয়ানদের। সম্প্রতি ঢাকায় বিডিআর-বিএসএফ-এর সম্মেলন শেষে আয়োজিত এক ভোজসভায় বীনা সিক্রি প্রকাশ্যে দুর্ব্যবহার করেছেন বিডিআর-এর মহাপরিচালকের সাথে। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তারপরও ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস এবং দিল্লী থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুশিয়ার করে দিয়েছে বাংলাদেশকে। অথচ তাদের কারণেই ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি আজও বাস্তবায়িত হলো না। বিভিন্ন অজুহাতে তারা বার বার সীমান্তে সৃষ্টি করে চরম উত্তেজনা। প্রাণ ভয়ে সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার বাংলাদেশী গ্রামবাসীকে পালিয়ে যেতে হয় নিরাপদ দূরত্বে। ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ত হয়ে উঠছে। তাছাড়া অভিন্ন

www.pathagar.com

নদীতে সংযোগ খাল কাটা ও একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার এবং খোঁড়া অজুহাতে সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারতীয় মহলের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার জন্য এদেশের মানুষ ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছে দু'দেশের মধ্যে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় কূটনীতিকদের অশুভ পদচারণা পরিস্থিতিকে বিষিয়ে তুলছে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

ভারত বিভক্তির ২৪ বছরের মধ্যেও অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে কিংবা বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৩৪ বছর পার হয়ে গেলেও ভারতীয়রা বিভিন্ন সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়নি। বরং সেগুলো জিঁইয়ে রেখেছে। ফলে ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত প্রায় প্রতিবছরই কাশ্মীর সীমান্তের মতো অশান্ত হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় এক যুদ্ধাবস্থা এবং চলে অবিরাম গোলাগুলি বিনিময়। এতে গত ৬ বছরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে ৩৭৮ জন নিরীহ বাংলাদেশী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় সেদিন ১০ বছরের শিশু কন্যা নাহিদাকেও জীবন দিতে হয়েছে বিনা অপরাধে। ২০০১ থেকে ভারতের সীমান্ত রক্ষী সৈন্যরা কমপক্ষে ১১৭ বার আন্তর্জাতিক সীমান্ত লংঘন করে বাংলাদেশে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত প্রায় ৬ বছরে বিএসএফের গুলিতে ৪৬৬ জন বাংলাদেশী আহত হয়েছে এবং অপহরণ করা হয়েছে ৪৯১ জনকে। এর মধ্যে নারী ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে প্রচুর।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অমীমাংসিত সীমানা রয়েছে সাড়ে ৬ কিলোমিটার। ১৯৭৪ এ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহলগুলো বিনিময়ের কথা থাকলেও ভারতের কোন উদ্যোগ এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন না থাকায় এ পর্যন্ত ছিটমহল সমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। ১৯৭৪ এর ১৬ মে মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী "১২নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ অর্ধ এবং তৎসংলগ্ন ছিটমহল ভারতের থাকবে এবং এর বিনিময়ে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল থাকবে বাংলাদেশের হাতে। বাংলাদেশের পানবাড়ী মৌজার সঙ্গে দহগ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য ভারত তিনবিঘার সন্নিকটে ১৭৮৮৮৫ মিটার এলাকা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে লীজ দেবে।" বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসেই এ চুক্তি অনুমোদন করে বর্ণনা অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে লীজ দেয়া নিয়ে চলতে থাকে মামলা-মোকদ্দমা। শেষ পর্যন্ত জুন, ১৯৯২ থেকে বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডোর প্রতিদিন ১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করা শুরু করে। বর্তমানে এটি দিনে ১২ ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময় সীমান্তে উত্তেজনা ও গুলিবিনিময়ের কারণে ছিটমহলবাসীদের মধ্যে চরম আশঙ্কা ও উদ্বেগ বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার প্রতাপপুর এলাকার পদুয়ায় তৎকালীন ইপিআর-এর একটি ক্যাম্প ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাক বাহিনী নিরাপত্তাজনিত কারণে নদী দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ২৩০ একর জমিসহ ঐ ক্যাম্প ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে সরে আসে। তখন সেই ক্যাম্পে কৌশলগত কারণে বিএসএফের সৈন্য এবং মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেয়। স্বাধীনতা লাভের পর বিএসএফ বাংলাদেশের ২৩০ একর ভূখণ্ডসহ পদুয়া ক্যাম্প বেআইনীভাবে তাদের দখলে রেখে দেয়। তার ৩০ বছর পর অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল ২০০১ এক ঝটিকা অভিযানে বিডিআর বাহিনী বিনা রক্তপাতে পদুয়া ক্যাম্প তাদের দখলে নিয়ে নেয়। এতে ১৭ জন বিএসএফ জওয়ান বন্দী হয়। অপরদিকে ১৮ এপ্রিল ২০০১ এ ভোর চারটায় শতশত বিএসএফ জওয়ান কুড়িগ্রামের রৌমারীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে বরাইবাড়ী বিডিআর আউটপোষ্ট দখলের উদ্দেশ্যে তা ঘেরাও করে অবিরাম গুলি বর্ষণ শুরু করে। বাধ্য হয়ে জীবন রক্ষার জন্য বিডিআর পাল্টা গুলি শুরু করে। এতে তাদের তিনজন জওয়ান শহীদ হন এবং পাঁচজন আহত হন। এ সশস্ত্র অভিযান শেষ হলে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে ১৬ জন বিএসএফ সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ অবস্থায় পরের দিন অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল রাতে এক যুদ্ধ বিরতি ঘোষনা করা হয়। পদুয়া ও বরাইবাড়ীর ঘটনা পর পর পরিচালনা করে। মনে হয় পদুয়ার প্রতিশোধ নিতেই বিএসএফ বরাইবাড়ীর অভিযান সংগঠিত করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯ এপ্রিল ২০০১ এ সিলেট সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে একটি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের ইচ্ছানুসারে পদুয়া ক্যাম্প থেকে সেদিনই বিকালের মধ্যে বিডিআর জওয়ানদের প্রত্যাহার করা হয়। তারই ভিত্তিতে বরাইবাড়ীতে সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়। বরাইবাড়ী সংঘর্ষের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিএসএফ-এর মহাপরিচালক ভোল পাল্টে বিএসএফ কর্তৃক বরাইবাড়ীতে অনুপ্রবেশ ও বিডিআর আউটপোষ্ট আক্রমনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তারা ১৬ জন বিএসএফ-এর লাশকে বিডিআর কর্তৃক বিকৃত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। একই কায়দার বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া এবং সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্তে অনুপ্রবেশের কথা ভারত অস্বীকার করেছে। এবারও বাংলাদেশের প্রতি কড়া হুশিয়ারী জানিয়েছে ভারত। গত মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রদূতকে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিএসএফ-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত বলে অভিযোগ করেছেন।

২০০১ সালের পর এবারও ঘটনা ঘটেছে এপ্রিলে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আখাউড়া স্থল বন্দর ও ইমিগ্রেশন সেন্টার এখনো (বৃহস্পতিবার) বন্ধ রয়েছে। বেনাপোলের অবস্থা আরও শোচনীয়। দীর্ঘ কয়েক মাইলব্যাপী মালবাহী ট্রাকের বহর সহ পচনশীল অনেক মালামাল আটকা পড়ে আছে বেনাপোলে। সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে বিডিআরকে। স্বাধীনতার পর আখাউড়াতে এবারই প্রথম এ ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় গোলাগুলি, লুটপাট ও বর্বরতা সবকিছুকেই যেন হার মানিয়েছে। অভিযোগ

www.pathagar.com

ওঠেছে যে, বারবার সীমান্ত জুড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে বিএসএফ। বিগত পাঁচ বছরে দেশের উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে এসব ঘটনায় নিহতের অধিকাংশই নিরীহ কৃষিজীবি মানুষ। এখন আবার বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণসহ বিভিন্ন ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে বিএসএফ-এর মহাপরিচালক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার কাজ তারা চালিয়ে যাবেন। এমনকি যেসব স্থানে জিরো লাইনের ১৫০ গজের মধ্যে ধর্মীয় অবকাঠামো (মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান ও অন্যান্য) বা বাজার পড়বে সেসব স্থানেও বাধ্য হয়েই তারা বেড়া নির্মাণ করবে।

বর্তমান ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৬ এপ্রিল বিকেলে। জানা যায় বিএসএফ ভারতীয় অসামরিক লোকদের নিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার নূরপুর গ্রামের বাসিন্দাদের ওপর হামলা করে তাদের সম্পত্তি তছনছ ও মালামাল লুটপাট শুরু করে বলে অভিযোগ ওঠেছে। তাছাড়া বাংলাদেশী কয়েকজন গ্রামবাসীকেও তারা অপহরণ করার চেষ্টা করে বলে জানা গেছে। বিএসএফ-এর জওয়ানদের গুলিতে মারা যায় নাহিদা নামক শিশু কন্যাটি এবং আহত হয় অনেকে। খবর পেয়ে সংগঠিত হয়ে পাল্টা গুলি চালায় বিডিআর জওয়ানরা। গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ২৫০ গজের মধ্যে বিএসএফ-এর একজন অফিসার ও একজন সৈন্যকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ এলাকায় বিএসএফ-এর ইচ্ছাকৃত ও বিনা উস্কানীতে সংগঠিত ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে সরকার। অপরদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ আখাউড়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে বাংকার খননসহ রাতে হেলিকপ্টারে টহলের ব্যবস্থা করেছে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অর্থাৎ গত ছ'দিন যাবত আখাউড়াতে বিরাজ করছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এ অঞ্চলের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ঘর-বাড়ী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। ফলে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলটি একটি বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাঠের ফসল মাঠেই পড়ে আছে। পাকা ধান ঘরে তোলার সাহস নেই কারও। এ অবস্থায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এম মোর্শেদ খান বলেছেন, বাংলাদেশ অচিহ্নিত ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিতকরণ এবং পরস্পরের অধীনে থাকা ভূমি ও ছিটমহলগুলোর সমাধান চায়। তিনি বলেছেন সীমান্ত চিহ্নকরণ শেষ হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছোটখাটো সীমান্ত সংঘর্ষ ও উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে অভিন্ন সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোন কাঠামো নির্মাণের অনুমতি না দেয়ার ব্যাপারে ১৯৭৪ সালে যে সীমান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে বর্তমানে ভারত বিভিন্ন স্থানে তা মানছে না। এক্ষেত্রে ভারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা কেউ বলতে পারছে না।

www.pathagar.com

চীনের কাছে ভারতের শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ

নয়া দিগন্ত, ১৬ এপ্রিল, ২০০৫

জন এডামস্‌কে বলা হয় আধুনিক অর্থনীতির জনক। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তা হলো, কোনো রাষ্ট্রই তার প্রতিবেশী কিংবা নিকটতম অঞ্চলকে অনুন্নত অথবা পশ্চাৎপদ রেখে নিজেদের সাফল্যকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে কিংবা নিশ্চিত করতে পারে না। প্রায় দু'শ' বছর আগে বলা তার এ কথাটি আজও চরম সত্য বলে প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষিতে এ কথার এখন আরও যৌক্তিকতা মিলে। অনুন্নত বা দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলের মানুষ সব বাধা-বন্ধন কাটিয়ে জীবিকা উপার্জনের সন্ধানে ছুটে যায় সমৃদ্ধশালী দেশসমূহে। আগে প্রতিবেশী মেক্সিকোর কর্মজীবী দরিদ্র মানুষ কাজের সন্ধানে পালিয়ে যেতো সম্পদশালী যুক্তরাষ্ট্রে। এখন আর তেমনটা যায় না। কারণ সেখানে এখন লাভজনক কাজের আকাল দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সব সময় মেক্সিকোকে তাদের আধিপত্যের বলয়ে নিশ্চিত বাজার বলে মনে করতো। মেক্সিকোর উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা কিংবা বিনিয়োগ পর্যাপ্ত ছিল একথা বলা যায় না। ফলে মেক্সিকোর ব্যাপক জনগণের ক্রয় ক্ষমতা তেমনভাবে বাড়েনি যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সকল উৎপাদিত পণ্য উপভোগ করবে। সে জন্য অর্থনৈতিক পন্ডিতরা যুক্তরাষ্ট্রকেই মূলত দায়ী করে।

বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী চীন ও ভারত ক্রমশই এখন দু'টি শক্তিশালী উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মতো দেশগুলো যদি তাদের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে না পারে তাহলে মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসন, চোরাচালানি ও আইন-শৃংখলাগত কারণে প্রতিবেশী স্বচ্ছল দেশগুলোর স্থিতিস্থাপকতা, শান্তি-স্বস্তি ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। তাছাড়া লাভজনক বাজার সৃষ্টিতেও ব্যর্থ হবে শিল্প-সমৃদ্ধ প্রতিবেশী দেশগুলো। এ অবস্থায় বাংলাদেশসহ ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর উন্নয়নের ধারাকে বিঘ্নিত কিংবা বাধাগ্রস্ত করার জন্য ভারত নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। বাংলাদেশের মতো একটি শান্তিপ্রিয় দেশকে কখনো সন্ত্রাস ও মৌলবাদের সম্ভাব্য ঘাঁটি কিংবা কখনো ভবিষ্যত ইসলামী বিপ্লবের পরবর্তী স্থান বলে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এর বিরুদ্ধে এক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। একটি দেশী ও বিদেশী চক্র অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রায়ই বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর বা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। এর সাথে ভারতের একটি মহল বিশেষভাবে যুক্ত রয়েছে বলে বলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

'ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিও' এর সাবেক সম্পাদক ফিলিপ বাওরিং সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এ লিখিত এক প্রতিবেদনে বলেছেন যে, 'ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী ও অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়েছে।' তাছাড়া চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও-এর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের প্রেক্ষাপটে বাওরিং দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ভারতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জোর পরামর্শ দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে উপমহাদেশে, ভারতকে চীনের বর্তমান গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে ওঠে আসতে হলে তাকে প্রতিবেশীদের প্রতি তার পুরনো কৌশল এবং বিরূপ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। 'চীনের শিক্ষা' শিরোনামে লিখিত প্রতিবেদনে বাওরিং ভারতকে তার প্রতিবেশীদের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ করারও পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ফিলিপ বাওরিং সম্পাদিত 'ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিওতেই' গত বছর বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অপব্যাখ্যা করে এক বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তার লেখক ছিলেন এক ইহুদী সাংবাদিক, বার্টিল লিটনার। তার প্রতিবেদনের আসল উদ্দেশ্য ছিল কল্পিত মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলামী সশস্ত্র বিপ্লবের ধুয়া তুলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাগুলো ধ্বংস করে দেয়া। এ কৌশল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের একটি শক্তিশালী ইহুদী চক্র বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অনৈক্য এবং অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে চরমভাবে দুর্বল, ব্যর্থ ও অকার্যকর করে তোলার মিশনে নেমেছিল। সে তালিকায় সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত নাম বাংলাদেশের। অভিযোগ ওঠেছে, বাংলাদেশ বিরোধী এ মিশনে ইহুদী চক্রান্তকারীদের সাথে যোগ দিয়েছে ভারতের একটি মহল, যারা ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রধানত বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে ব্যর্থ প্রমাণ করে তাদের কবর রচনা করতে চাচ্ছে।

উপরোক্ত কথাগুলোই যখন বাংলাদেশের সাংবাদিক-কলামিস্ট কিংবা রাজনীতিকদের একাংশ সম্প্রতি বলেছেন তখন তাদেরকে বলা হয়েছে ভারত বিরোধী। অথচ ভারত থেকে যে মহলটি বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলছে কিংবা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে দীর্ঘদিন, তাদের সম্পর্কে কিন্তু আমাদের দেশের একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও গণমাধ্যম কিছুই বলছে না। বরং বিভিন্ন সময় এবং সুযোগ মতো তারাও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য সে কোরাশে যোগ দিয়েছে। মনে হয় তারা যেন বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক। বাংলাদেশের স্বার্থ হানিতে এবং এর বিরুদ্ধে অপবাদ কিংবা এর অপমানে তাদের যেন কিছুই আসে যায় না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল সম্প্রতি বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে কথা বললে নাকি আল্লাহ সহ্য করবে না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় যে মহলটি নানা অজুহাতে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কথা

www.pathagar.com

বলা আর ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা এক নয়। বাংলাদেশের স্বার্থ কিংবা ভাবমূর্তি যারা বিনষ্ট করতে লিপ্ত হবে তারা ভারতীয় হোক আর যুক্তরাষ্ট্রেরই হোক, বাংলাদেশীরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও তাদের প্রতিহত করবে। এটাইতো স্বাভাবিক। এ বিষয়টি সবকিছুর উর্ধ্বে, এখানে ন্যূনতমভাবে কোনো আপস করা চলবে না। এটাই কী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়?

উপরে বর্ণিত অপপ্রচারের প্রেক্ষাপটে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় যখন আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া গ্রেনেড হামলায় নিহত হলেন তখন নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে ভারত পূর্ব নির্ধারিত সার্ক সম্মেলনে যোগ দিল না। সার্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা উঠলো। এ হতাশাব্যঞ্জক সময়ে দু'দিনের সফরে ১০২ সদস্যের এক বিশাল প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশে এলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও। এসেই তিনি বললেন, চীন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও বলেছেন, গত ১১ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেছেন, সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ আরও বড় ধরনের অগ্রগতি সাধন করবে। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মেধাবী। চীন বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে দেখতে চায়। শুধু বাংলাদেশের বন্ধু নয়, এখন থেকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও। তিনি বুঝিয়ে দিলেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বন্ধুহীন নয়। বাংলাদেশ ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্রও নয়। চীনের প্রধানমন্ত্রীর এ সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি, দু'টি সমঝোতা স্মারক ও দু'টি দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এ সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, টেলিযোগাযোগ, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপন, পানি সম্পদ ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ যে চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছে তা বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভর্তুকি দিয়ে বাংলাদেশের পণ্য আমদানি ও বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের আয় বৃদ্ধি করতে এ বছর চীনের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশকে পর্যটনের স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০৫ সালকে তিনি আমাদের বন্ধুত্বের বছর বলে ঘোষণা করেছেন। চীনে বাংলাদেশী পণ্য রফতানি উৎসাহিত করতে চীনের প্রধানমন্ত্রীর দেয়া অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে এক নতুন চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে। সঞ্চার করেছে এক নতুন আশার আলো। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের চুক্তির কারণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন, কৃষি, জৈব প্রযুক্তি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সামনে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ-চীন যৌথ কমিশনের ১১শ' অধিবেশন যখন বিভিন্ন সহযোগিতার সম্ভাব্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আলোচনা হবে খুলনা ও ভেড়ামারায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পাগলায় পানি শোধনাগার ও নগরীর উত্তরাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশনের ভবিষ্যত নিয়ে। এ অবস্থায় প্রয়োজন সরকার ও ব্যবসায়ী মহলের বিভিন্ন পর্যায়ে চীনের অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবগুলো নিয়ে সমীক্ষা শুরু করা। কারণ শত প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশের হতাশ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাহলে এর ভবিষ্যত উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সকল স্বপ্নের সমাধি রচিত হবে। সুতরাং বিরাজমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে শত অপপ্রচার ও চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করেই এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে চীনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হোক আমাদের অমূল্য পুঁজি। এর সাথে সাথে আধুনিক অর্থনীতির জনক জন এডামস্-এর তত্ত্বকথা ভারত যদি স্মরণে রাখে তাহলে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ সত্যিই একদিন সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হবে। তাকে দারিদ্র্যপীড়িত, পশ্চাৎপদ ও পরনির্ভরশীল থাকতে হবে না। এ যুগ এককভাবে সমৃদ্ধি অর্জনের নয়, আঞ্চলিকভাবে উন্নয়ন না ঘটলে অনগ্রসরতা, অস্থিরতা, বৈষম্য, চোরাচালান, অবৈধ অভিবাসন, মানুষ পাচার এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কোনটারই অবসান ঘটবে না। এতে এ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিঘ্নিত হবে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়ন। এ যুগে আধিপত্যবাদী রাজনীতি এবং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বেড়াজাল দিয়ে কারও অগ্রগতি ঠেকানোর অর্থ হবে নিজের অগ্রসরতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আঞ্চলিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় চীন স্থিতিশীলতা সৃষ্টির যে পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে এসেছে ভারতের উচিত তা উপলব্ধি করা। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভারতের অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে এমন কথা কোনোভাবেই বলা যাবে না।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিস্থাপকতায় চীনের ভূমিকা অপরিসীম

নয়া দিগন্ত, ৮ এপ্রিল, ২০০৫

গণচীন সম্ভবত বাংলাদেশের সময়ের পরীক্ষিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু। প্রয়োজনে বাংলাদেশ চীনকে সবসময় পাশে পেয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ কোনো মহলেরই একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। চীন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে তাঁবেদার কিংবা নতজানু করে রাখার নীতিতে বিশ্বাস করে না। দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ক্ষেত্রে গণচীন একনিষ্ঠভাবে তার পঞ্চশীলা (পাঁচনীতি) নীতিতে বিশ্বাস করে। তারা কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার পথ অত্যন্ত সচেতনভাবে পরিহার করে চলে। সে কারণেই বাংলাদেশ ও গণচীন সম্ভবত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা ও অভিন্ন অবস্থানের ভিত্তিতে পরস্পরের বিশ্বস্ত অংশীদারে পরিণত হতে পেরেছে। ঢাকা-বেইজিং সম্পর্কের ৩০তম বার্ষিকীতে ৭ এপ্রিল দু'দিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসার প্রাক্কালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও এক বাণীতে বলেছেন, চীন বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে দেখতে চায়। সে লক্ষ্যে চীন বাংলাদেশকে বস্তুগত ও নৈতিক সম্ভব সকল রকম সাহায্য দিয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। জিয়াবাও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, তার এ সফর বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরো জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

১৯৭৫ সালের ৪ অক্টোবর গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তখন থেকে গত তিন দশকে অর্থাৎ ৩০ বছরে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। চীন বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণসহ আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মৈত্রী সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে। তাছাড়া আরো একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব চীনের বিবেচনাধীন রয়েছে। ঢাকায় নির্মিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র আমাদের দু'দেশের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে চীনের এক উজ্জ্বল উপস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ বছর মার্চ পর্যন্ত চীনের প্রায় ২৪৭ মার্কিন ডলারের ১০৭টি প্রস্তাব বাংলাদেশের বিনিয়োগ বোর্ডে তালিকাভুক্ত হয়েছে। চীনের সাথে আমাদের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তাদের বিনিয়োগের এ নতুন সম্ভাবনা বাংলাদেশের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে বলে অনেকে ধারণা করছেন। খুলনা ও ভেড়ামারায় দু'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পাগলায় একটি পানি শোধনাগার, টেলিযোগাযোগ খাতে উন্নয়ন, ঢাকার উত্তরাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ঢাকা-লাকসাম রেল লাইন উন্নয়নসহ বেশ

www.pathagar.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে চীনের অবদান রাখার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তাছাড়া দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, শিক্ষা, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও চীনের সাথে সহযোগিতামূলক আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণচীনের ১৩৭ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে ১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়ে গেছে যাতে প্রায় ২৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ঢাকার সাথে চীনের কুনমিং ও বেইজিং-এর সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া সড়ক পথে কুনমিং-মিয়ানমার ও কক্সবাজারের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ তথ্যগুলো নিঃসন্দেহে যে কোনো বাংলাদেশীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। সে কারণেই এ তথ্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চীনের প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও অকৃপণভাবে বাংলাদেশীদের "অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান" বলে প্রশংসা করেছেন। বিশ্বায়নের এ সূচনালগ্নে একটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষ চক্র যখন যৌথভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করতে ব্যস্ত, কখনও মৌলবাদ অথবা কখনও সন্ত্রাসের সম্ভাব্য ঘাঁটি হিসেবে আমাদের ভাবমূর্তি ও উন্নয়নের সম্ভাবনা তছনছ করে দিচ্ছে তখন বিশাল গণচীনের এ প্রশংসা বাক্য আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অগ্রযাত্রার জন্য এক বিরাট আশারআলো হিসেবে পথ দেখাবে বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল নস্যাৎ করতে আমাদেরকে সাহস যোগাবে বলে অনেকে বিশ্বাসও করেন। চীনের প্রধানমন্ত্রীর সম্যক ধারণা রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে। বাংলাদেশ ও চীন পারস্পরিক দিক থেকে আস্থাশীল দু'টি দেশ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণই হচ্ছে এই আস্থাশীলতার ভিত্তি, বলেছেন জিয়াবাও। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া সহযোগিতা সংলাপ'-এর মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে যোগদানের পরই চীনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই অঞ্চলে একটি বড় শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। তাদের মতে, ভারতের সাথে চীনের বৈরী সম্পর্ক না থাকলেও ভারত-মার্কিন আতাঁত গণচীনকে নয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে ধারণা করেছেন তারা। এ অবস্থায় চীনের প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ এশিয়া সফর অত্যন্ত তাৎপর্য ও বৈশিষ্টমণ্ডিত বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

গণচীনের প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও এর দক্ষিণ এশিয়া সফর শুরু হয়েছে পাকিস্তান থেকে। তারপর তিনি এসেছেন বাংলাদেশে। ঢাকা সফর শেষে শ্রীলংকা হয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী যাবেন ভারতে। সেখানে তিনি চারদিন অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

জিয়াবাও দক্ষিণ এশিয়ার সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভারতও চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে চায় বলে মন্তব্য করেছে বহুবার। তাছাড়া ভারত তিব্বত নিয়ে তার আগের অবস্থান থেকে এখন সরে এসেছে। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারেও দু'দেশ সমানভাবে আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে এখন দু'দেশের মধ্যে আলোচনাও চলছে। এ অবস্থায়ও একদিকে বিশ্বায়ন এবং অপরদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির স্লোগানের অন্তরালে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এশিয়াতে ভারতকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে শক্তিশালী করতে চায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহিত করার জন্য। এতে দক্ষিণ এশিয়ায় সংকট ও উদ্বেগ ক্রমশ আরও ঘণীভূত হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইসের সাম্প্রতিক ভারত সফরকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাস ও মৌলবাদের প্রেক্ষাপটে ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে মন্তব্য করেছেন রাইস। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়েও ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে কন্ডোলিজা রাইসের "ইন্ডিয়া টুডে"কে দেয়া এক সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ ওঠেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত ও ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঠেকানোর নামে এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহকে অস্থির ও দুর্বল করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এর মাঝে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র অতীতে বহুবার বাংলাদেশকে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উদার গণতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছে। তারপর হঠাৎ এমন কী ঘটে গেল যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে? রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সন্ত্রাস ও মৌলবাদ এক নয়। বাংলাদেশকে বিশ্বের অনেক মানুষই মূলত একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলে বিবেচনা করে। তাহলে এদেশটির বিরুদ্ধে এত অপপ্রচার কেন? একটি মহল পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের সম্ভাব্য ঘাঁটি কিংবা ইসলামী বিপ্লবের পরবর্তী স্থান অথবা একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এটি এখন সামগ্রিকভাবেই এদেশের মানুষের কাছে একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোটের সরকার বিরোধী আন্দোলন, হরতাল ও ভাঙচুর পরিস্থিতিকে কিছুটা জটিল করে তুলেছিল। আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার হত্যাকাণ্ডকে বহু অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বহুদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে সমৃদ্ধি ও বিনিয়োগের একটি সম্ভাবনাময় সময়ে দেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দেশের স্বার্থ ও রাজনীতি সচেতন মানুষের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা কোনো অশুভ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

www.pathagar.com

কিবরিয়া হত্যা, নেপালে রাজনৈতিক পরিবর্তন কিংবা সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে এতো তোলপাড়ের মধ্যেও গণচীন নির্বিবাদে তার সুচিন্তিত অভিমতটি জানিয়ে দিতে ভুল করেনি। চীনের নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং এর সদস্যদের ঐক্য ও সহযোগিতা জোরদার করার জন্য আহবান জানিয়েছে। তাছাড়া অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে সার্ক সম্মেলন পর্যবেক্ষণ করার আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে তারা। চীনের বর্তমান রাজনীতি ও কূটনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অনুসৃত পঞ্চশীলা নীতিতে অটল থাকা। অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। চীন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নয়, বরং সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আস্থাশীল হতে চায়। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিস্থাপকতা এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কারণে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। সে কারণেই হয়তো চীনের সাথে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেছে। এটিকে উন্নয়ন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে আমাদের দু'দেশের মাঝে সহযোগিতার পরিমাণ আরো অনেক বাড়াতে হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন। কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত চীনের অমূল্য অভিজ্ঞতা আমাদের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখবে বলে অনেকেই মনে করেন। আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে চীনের বন্ধুত্বকে পুঁজি করে এগিয়ে যাওয়া কৌশলগত দিক থেকে আমাদের জন্য অত্যন্ত হিতকর হবে বলে জনমনে একটি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

www.pathagar.com

রাজনীতি হোক উন্নয়নের চালিকা শক্তি

নয়া দিগন্ত, ২ এপ্রিল, ২০০৫

গরীব-ধনী, শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই অকৃপণভাবে নিজের দেশকে ভালবাসে। নিজের মায়ের মতোই গভীর মমতায় তাকে জড়িয়ে থাকে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে? যারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তারা কি দেশদ্রোহী নয়? নয় কী জাতির শত্রু। ক্ষমতার রাজনীতিতে দলগতভাবে রাজনৈতিক বিরোধিতার বিধান রয়েছে। তার অর্থ দেশের স্বার্থের বিরোধিতা নয়। রাজনীতিগতভাবে বিরোধীদের দিয়েও যদি দেশের স্বার্থ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। এটাই গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। কোনো দলই চিরদিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন থাকে না। তাই বলে ক্ষমতাসীন দলকে গঠনমূলক কিংবা উন্নয়নমূলক কাজেও কি বাধা দিতে হবে? এটা কোন ধরনের বিরোধিতা?

আমাদের দেশে রাজনীতিতে এখন এক ধরনের অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক ও অসুস্থ মানসিকতা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ একটি নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে না দেয়া এবং তার শাসনকাল শেষ হওয়ার আগেই টেনে হিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামানোর অপচেষ্টা। তথাকথিত আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস-রাহাজানির মাধ্যমে দেশে অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করা। এতে উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য সৃষ্টি হয় সীমাহীন দুর্ভোগ। কোনো কোনো দল মনে করে তারা ক্ষমতায় না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যাহত হয়, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি শেষ হয়ে যায় এবং দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতিও বদলে যায়। কেউ কেউ মনে করে তারা ক্ষমতায় না থাকলে অন্যের নেতৃত্বে এদেশে উন্নয়ন হবে কেন? এদেশে যেন তারা ছাড়া আর কেউই কোনো কিছু করার অধিকার রাখে না। তারা ক্ষমতায় না থাকলে দেশটি ধ্বংস হয়ে গেলেই বা কী আসে যায়। এ দেশটির মালিকানা যে তাদের নয় বরং জনগণের, এ সত্যটি মেনে নেয়ার রাজনৈতিক মানসিকতা এখনও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। অথচ এর মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার ৩৪টি বছর কেটে গেছে। এখনও আমাদের রাজনৈতিক মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হলো না। তাই সর্বত্রই আজ একটি প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলে। তা হলো, আর কতদিন এভাবে চলবে? এদেশে জনগণের শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধির পথে রাজনীতিই যেন আজ অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে দাবি উঠেছে, এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

www.pathagar.com

এই বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে পৃথিবীর সকল জাতি এবং দেশ যখন সংগঠিত হয়ে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমরা তখন একে অপরের পায়ে কুড়াল মারার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছি। এতে দেশ এবং জাতির কোন কল্যাণ হবে না এবং নিজেদের স্বার্থও সিদ্ধি হবে না। একটি নির্বাচিত সরকারকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণই আবার ক্ষমতায় রাখতে কিংবা তা থেকে সরাতে পারে। কতিপয় দলীয় কর্মীর জ্বালাও-পোড়াও কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকারকে অস্থির করা কিংবা তার উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করা বিরোধী দলের একমাত্র কাজ হতে পারে না। এভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি জাতিগতভাবে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। এ রাজনীতি কোনক্রমেই দেশাত্মবোধক কিংবা গণতান্ত্রিক হতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি কোন মতেই নিয়মতান্ত্রিক এবং গঠনশীল কর্মকাণ্ডের আওতায় আসে না। জাতীয় স্বার্থ বিবর্জিত রাজনৈতিক কর্মকান্ড সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ ও জাতিকে পিছিয়ে দেয়। সে কারণেই বিশ্বব্যাপী আজ রাজনীতিতে একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, তা হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়া রাজনীতির নামে দেশে শুধু প্রতিহিংসা ও নৈরাজ্যই প্রলম্বিত হবে। সফল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

এসব কারণেই যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে তার প্রতিফলনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। একুশ শতকের সূচনায় ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক কিংবা পাকিস্তান আমলের আধা-ঔপনিবেশিক ধারার কৌশলগত আন্দোলনের দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সুশীল ও সুশিক্ষিত সমাজের শাসন কায়েম করা। পেশী শক্তি ও কালো টাকার প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে তরুণ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের সমাবেশ ঘটাতে হবে রাজনীতিতে। এটা না করতে পারলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা যাবে না। তার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতিও গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ, রাজনীতি বাংলাদেশে ক্রমশ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। সবাই সংসদের সদস্য এবং মন্ত্রী হতে চায়। কিন্তু কেন? এখানে কিসের এতো আকর্ষণ? যারা সাফল্যজনকভাবে কোনো দিন একটি মুদি দোকানও চালাতে পারেনি, যাদের না আছে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, না কোনো অভিজ্ঞতা, তারাও পার্লামেন্ট সদস্য হতে চান। কালো টাকা যেমন সাদা টাকাকে বাজার থেকে নিষ্ক্রমণ করে তেমনি পেশীশক্তি ও কালো টাকার মালিকদের প্রভাবে সত্যিকার দলীয় নেতা-কর্মীরাও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সুশীল সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ

www.pathagar.com

অনেকটা বন্ধ হবে। একমাত্র তাহলেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটা সুস্থ রাজনীতির সুবাতাস বইতে শুরু করবে। কায়েমী স্বার্থবাদী ও ঘুণে ধরা রাজনৈতিক দল, যারা রাজনীতিকে তাদের 'সোল এজেন্সি' কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগকে তাদের জন্মগত অধিকার বলে মনে করে, তাদের ভুল ধারণা ভাঙবে।

এদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের ভবিষ্যত কিংবা জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে যারা ব্যক্তিগত অথবা দলীয় স্বার্থকে স্থান দেয়, যারা ক্ষমতা লাভের জন্য দেশকে ঠেলে দেয় নাশকতা, অরাজকতা ও অস্থিরতার দিকে, তারা আর যাই হোক উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তারা বাংলাদেশের অগ্রগতি চায় না, চায় অবাধ লুটপাটের লাইসেন্স। নেহাত ক্ষমতা লাভের জন্য যারা বাংলাদেশকে পরাশ্রয়ী ও নতজানু করে রাখতে চায়, তাদের কাছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন চূড়ান্ত নয়। নীতিগতভাবে এদেশে তাদের সে দাসত্বসুলভ রাজনীতি বন্ধ করার দাবি উঠেছে এখন। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতির পক্ষে প্রচারণা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশে বর্তমানে রাজনীতির দু'টি ধারা চলছে। একটি ধারা উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি ও জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করছে এবং অপরটি জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণের বিরোধিতার রাজনীতি করছে। তিনি জনগণের কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একশ্রেণীর সংবাদপত্রের সমালোচনা করেছেন যারা প্রায়ই গুরুত্ব সহকারে এমন সংবাদ প্রকাশ করে, যা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। অথচ দেশের সাফল্যের সংবাদ তারা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে না। সরকার সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতে নিবেদিতভাবে কাজ করছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এ অবস্থায় তথাকথিত ক্ষমতা লাভের প্রশ্নে দেশের কিছু রাজনৈতিক দল কোনো নির্বাচিত সরকারের শাসনকাল, উন্নয়ন কার্যক্রম ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও, বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশে এক চরম অস্থিরতা ও অরাজকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। এ কৌশল অত্যন্ত পুরনো। এ মানসিকতা ঔপনিবেশিক আমলের। কোনো না কোনো দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দলীয় স্বার্থের সাথে ১৪ কোটি মানুষের বৃহত্তর স্বার্থ এক করে দেখা একটি গণবিরোধী কাজ। তাছাড়া উৎপাদন, উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের একটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও উপযুক্ত সময় আছে। সেটা পেরিয়ে গেলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। যে কোনো বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে হরতাল দিয়ে এবং বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি করে উন্নয়নের ধারা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে দেয়া কোনো দেশপ্রেমিকের কাজ নয়। কারণ এর সাথে দেশের ১৪ কোটি

www.pathagar.com

মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সুতরাং হরতাল দিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি কিংবা অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এখন কোনো মতেই দেশবাসীর কাম্য নয়। দেশে এখন প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষ রয়েছে, যাদের কোনো কর্মসংস্থান নেই। তাদের অনেকেই শিক্ষিত এবং অনেকেরই বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে। এখনও এদেশের শতকরা ৪৪ ভাগ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্য সীমার নিচে। শিল্পায়নের গতি এখনও তেমনভাবে উল্লেখ করার মতো নয়। পুঁজি কিংবা বিনিয়োগের অভাবে যেন থমকে আছে সকলই। এ অবস্থায় দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের হিসেবে প্রতিদিনের হরতালে দেশের ক্ষতি হয় ৩৬০ কোটি টাকা। আর আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম শাহ এএমএস কিবরিয়ার হিসাবে প্রতিদিন ৩৮৬ কোটি টাকা। এ অবস্থায় বিরোধী দলের সরকার পতনের আন্দোলনের কৌশল হিসেবে হরতাল কী আমাদের জন্য নেহাত 'গরীবের বিলাসিতা' নয়? খেটে-খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' নয়? শিক্ষার আলো কিংবা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য নয় কী সীমাহীন প্রবঞ্চনা?

গত বৃহস্পতিবারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের ডাকা হরতালকে কী একটি সফল কর্মসূচী বলা চলে ? সেদিন কোন ধরনের যানবাহন চলেনি রাজধানী ঢাকায়, কোন কোন অফিস, সংস্থা কিংবা ব্যাংক বন্ধ ছিল? অথচ এ হরতালকে কেন্দ্র করে বিরোধীদল জনমনে ভীতি, উদ্বেগ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের হরতালের পিছনে ন্যূনতম কোন জনসমর্থন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে কারণেই উপরোক্ত এ বিষয়গুলো আজ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এ আত্মঘাতী রাজনৈতিক কৌশল যে কোনোভাবে হোক বন্ধ করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের স্বার্থ হতে হবে সকল দল-মতের উর্ধ্বে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ভারত, যুক্তরাজ্য কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সকল দলকে তাদের ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নেহাত দলীয় ক্ষমতার প্রশ্নে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং জনগণের স্বার্থ হানি ঘটতে পারে এমন সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে এটিই হওয়া উচিত দেশের সুশীল সমাজের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর এ ব্যাপারে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে হবে। অতীতের সকল কোন্দল ও সংকীর্ণতা ভুলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাপকভিত্তিক উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা আবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। নতুবা আইন করে হরতাল এবং হরতাল চলাকালীন সময়ে ভাঙচুর, বোমাবাজি ও নৈরাজ্য বন্ধ করার দাবি ওঠেছে দেশের সর্বত্র। এ বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি ঐকমত্য গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হলে জনগণের রুদ্ররোষ তাদের ওপর নেমে আসতে পারে। আসতে পারে কঠোর আইন। সেগুলো কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের জন্য সম্মানজনক কিংবা মর্যাদাকর নাও হতে পারে।

www.pathagar.com

এবার ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কন্ডোলিৎসা!

নয়া দিগন্ত, ২৪ মার্চ, ২০০৫

একজন সাংবাদিক-কলামনিস্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বিরুদ্ধে আমার একশ' হাজার অভিযোগ রয়েছে। একজন অতি সাধারণ মানুষেরও তা থাকতে পারে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি সারা বিশ্বে এমন অপ্রিয় একটি মানুষ কীভাবে তার দেশে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হতে পারেন? এখানে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কি বহিঃবিশ্বের মানুষের সুখ-দুঃখে কিংবা সমস্যা-সংকটে আন্দোলিত হয় না? নিজ দেশ থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত হওয়া এবং স্বাধীকার আদায়ে দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রামরত ফিলিস্তিনীদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কিংবা জনগণের কী কোন দায়-দায়িত্ব নেই? কোন সহানুভূতি কিংবা সমবেদনা নেই ইরাকের নিরপরাধ মানুষের জন্য? কোথায় গেল যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কিংবা মানবাধিকারের বুলি? সবই কী তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামভীতি ও নির্লজ্জ স্বার্থের কারণে ঘটছে। এর পাশাপাশি ভারত আরেক রাষ্ট্র যার শাসকগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে আয়তনে এবং শক্তিতে কিছুটা বড় হওয়ার কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে মোটেও কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে না বলে অভিযোগ ওঠেছে। পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভূটানের কথা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকালেও ধরা পড়বে ভারতের সকল অসংগতি ও অবাঞ্ছিত আচরণের চালচিত্র। সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ-এর অপতৎপরতা থেকে শুরু করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও পানির ন্যায্য হিস্যা বণ্টনে বৈষম্য, অভিন্ন নদীতে যেখানে সেখানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে রূপান্তরের অপকৌশল এবং সর্বোপরি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য আচরণ বাংলাদেশীদের সম্পূর্ণভাবে বৈরী করে না তুললেও মানুষ ভারতকে বন্ধু ভাবতে পারে না। এক্ষেত্রে একদিকে আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং অপরদিকে ভারতের মহান জনগণকে আমাদের পক্ষে টানতেও অপারগ হয়েছি আমরা। এ যুগের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার গণমাধ্যম, সেক্ষেত্রেও আমরা এগুতে পারিনি মোটেও। নতুবা ভারতের পত্র-পত্রিকা কেন আমাদের পক্ষে থাকবে না। বাংলাদেশের দলীয় পর্যায়ে স্থাপিত হয়েছে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। এ ব্যর্থতা কার? দেশবাসীর আঙ্গুল কিন্তু এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে।

ভারতের সাথে এমনই যখন আমাদের সম্পর্ক তখন অতি সম্প্রতি ভারত সফরে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কন্ডোলিৎসা রাইস। তাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এমন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলে বিশ্বব্যাপী অশ্বেতাঙ্গদের আর কোন বিরোধী শক্তির প্রয়োজন নেই বলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলেই অভিযোগ ওঠেছে। যে কারণে বুশ দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন, সে কারণেই রাইসকেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। তাদের নাকি কাজ হচ্ছে ইহুদীবাদের স্বার্থ দেখা এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরোধ সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে রাখা। এক্ষেত্রে এখন নাকি যোগ দিয়েছে ভারতের শাসকগোষ্ঠী। এ মিশনে মধ্যপন্থী কংগ্রেস দলের সাথে সাম্যবাদী দলের নেতাদের ব্যবধান এখন আর বিশেষ কিছুই নেই বলে অভিযোগ ওঠেছে। বলে নেয়া ভালো, এ মন্তব্য আমার ব্যক্তিগত নয়। বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান দেশ ভারতের সাথে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে সেটা কার্যত এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং আধিপত্য ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি কৌশল। দ্রুত ক্ষমতা অর্জনকারী ও শক্তিশালী গণচীনকে সামরিক ও অসামরিক বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিহত করার লক্ষ্যেই নাকি যুক্তরাষ্ট্র এখন ভারতকে বেছে নিয়েছে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের জন্য সমর্থন দিচ্ছে। সেটা চীন বুঝবে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোর এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। কারণ প্রতিবেশী কারোরই ভারতের সাথে সুসম্পর্ক নেই। প্রতিবেশীদের অভিযোগ হচ্ছে ভারত কাউকে মাথা তুলতে দেয় না। সবসময় নতজানু করে রাখতে চায়। কোথাও শিল্পায়ন হোক, উন্নয়ন ঘটুক কিংবা কেউ সমৃদ্ধি অর্জন করুক সেক্ষেত্রে ভারতের কোনো সহযোগিতা কিংবা সহায়তা নেই। বরং ক্ষুদ্র দেশগুলোকে কীভাবে ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো যাবে সে ব্যাপারে শুধু শাসকগোষ্ঠীই নয়, ভারতের গণমাধ্যমের একটি অংশও তৎপর হয়ে ওঠেছে। এ ব্যাপারে ইহুদী লবিও যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠেছে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে ভারতীয় এবং ইহুদী লবি অপপ্রচারমূলক কিংবা তথ্য-সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে মার্কিনীদের সহায়তা বা মদদ পাচ্ছে প্রচুর। তাদের কাজ হলো এ অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মান্ধতার ধুয়ো তুলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে অস্থির করে তোলা এবং কোনো ক্ষেত্রেই শক্তি সামর্থ্য অর্জন করতে না দেয়া। সে হিসেবে অনেকেই আজকাল পাল্টা প্রশ্ন তুলেন যে ভারত ও ইসরাইল কী ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দুত্ব ও ইহুদীবাদ নিয়ে এ দু'টি দেশে যে ধরনের বাড়াবাড়ি হচ্ছে সংখ্যালঘুদের ওপর তা তো ইসলামের নামে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তো বহিঃবিশ্বের মানুষ শান্তির দ্বীপ বলে জানে। তাছাড়া গণতন্ত্র এখানে ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত রেকর্ড ভারতের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের রেকর্ড নেই। এ অবস্থায়ও তারা আমাদের গণতন্ত্রকে সুসংহত

www.pathagar.com

এবং মানবাধিকারের রেকর্ডকে আরো উজ্জ্বল করতে সাহায্য না করে বরং মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের ভিত্তিহীন অপবাদ এনে আমাদের সকল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেয়। এতে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে? একটি বহুজাতি, বহু ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বিশাল দেশের প্রতিবেশীদের মধ্যে যদি অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তারাও কী শান্তি কিংবা স্বস্তিতে বসবাস করতে পারবে? এতগুলো বলার কারণ একটিই। ভারত এশিয়ার একটি পরাশক্তি হতে চায়। তারা চায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন। অথচ প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। এ ব্যাপারে তাদের রেকর্ড উজ্জ্বল করার দায়িত্ব নেবে কে? যুক্তরাষ্ট্রকে এগুলো বুঝে দেখতে হবে।

কন্ডোলিৎসা রাইসের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রটিয়ে দেয়া হলো যে ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করেছে। বলা হয়েছে, নেপাল ও সুনামি ত্রাণ তৎপরতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যকার সহযোগিতায় উৎসাহিত হয়েই নাকি ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ব্যাপারে দু'টি দেশকে একযোগে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে রাইস নাকি দেশটির সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাইস কী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু জানেন? পরে রাইসের বক্তব্যের এবং বিশেষ করে 'ইন্ডিয়া টুডে'তে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের বহু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামসহ সাতটি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে ভারত বারবার বাংলাদেশকে জড়িয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা এমনও অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ বেশ কিছু ভারতীয় বিদ্রোহী গ্রুপকে আমাদের ভূখন্ডে ঘাঁটি করার অনুমতি দিয়েছে। এ সমস্ত ঘাঁটি থেকে নাকি ভারত বিরোধী তৎপরতা চালানো হয়। বাংলাদেশ বারবার এ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং এমনও বলেছে যে, তোমরা দেখাও বাংলাদেশের কোথায় তোমাদের বিদ্রোহীদের ঘাঁটি আর কোথায়ইবা মৌলবাদী আল-কায়েদার আস্তানা রয়েছে। ভারত পারেনি। তারা যে তালিকা দিয়েছে তাতে অনুসন্ধান করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস নেপালে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, ভারত ও আমেরিকার একটি আঞ্চলিক দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে ক্রমবর্ধমান ভূমন্ডলীয় দায়িত্ব। সুতরাং বাংলাদেশের ব্যাপারেও তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্যাটা কী? কারা বাংলাদেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে? যে বাংলাদেশকে অতীতে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের উদার

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বার বার সার্টিফিকেট দিয়েছে, সে বাংলাদেশে হঠাৎ নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় কেন? কারা এর জন্য দায়ী? যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ ও তাদের ঢাকাস্থ দূতাবাস কী এগুলো জানে না। অবশ্যই জানে। তারপরও বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা ভারতকে টেনে আনে কেন? অবস্থা দেখে মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র বাঁদরের পিঠা ভাগ করার নীতি অবলম্বন করতে যাচ্ছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাতটি রাজ্য, কাশ্মীর ও গুজরাটে তাদের মানবাধিকার লংঘনের রেকর্ড দেখেও সেগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার পূর্ব শর্ত না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের হাতে তুলে দিতে চায় বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব। প্রতিবেশী একটি স্বাধীন দেশে ভারত কোন আইন বা বিধানে হস্তক্ষেপ করবে। এতে বুঝা যায়, 'সেভেন-ইলেভেন' এ নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র তার কূটনৈতিক নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিশোধ লিপ্সায় একে একে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করেও যুক্তরাষ্ট্র ক্ষ্যান্ত হয়নি। হাত বাড়াচ্ছে ইরান ও সিরিয়ার দিকে। এখন নতজানু করতে চায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশকেও। তাদের এ অপকৌশল কতটুকু বাস্তবায়িত হবে জানি না। তবে কন্ডোলিৎসা রাইসের উক্তি বাংলাদেশের জনগণকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশ ভারতের তত্ত্বাবধানে তার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে– কন্ডোলিৎসার এ ধারণা ভুল।

কন্ডোলিৎসা রাইস যদি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্ববিরোধী কথা বলেন, তা হলে তিনি শুধু বিতর্কিতই হবেন না, চীনের মতো শক্তিকেও উস্কানি দেবে তার উদ্ভট কথাবার্তার সমুচিত জবাব দিতে। বুশ কিংবা কন্ডোলিংৎসা ক্ষমতায় চিরস্থায়ী হবেন না। আজ রিপাবলিকান দলের পরিবর্তে ডেমোক্রেটিক দল ক্ষমতাসীন হলে পরিস্থিতি হয়তো সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতো। সেটি হয়নি। তার পরিবর্তে যা ঘটছে সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে ক্রমশ একটি অত্যন্ত অনিরাপদ স্থানে পরিণত করছে। সবকিছুকে ভারসাম্যহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে সমস্ত সংকট সৃষ্টি হবে তা বুশ সাহেব কিন্তু কন্ডোলিৎসারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন না। তাছাড়া ক্ষমতার প্রশ্নে তারা আজ ভারতের মতো নতুন যে সমস্ত দানব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারাই একদিন বিশ্ব শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ভারত নিজেই আজ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। অভিযোগ করছে বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। সাহায্য চাচ্ছে বাংলাদেশের। আবার সেই ভারতই এখন মার্কিনীদের আস্কারায় স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধান করার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে কে কাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে বুঝা যাচ্ছে না। তবে এতটুকু বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সে ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশীরা কারো 'ডিকটেশন' পছন্দ করে না

নয়া দিগন্ত, ১৯ মার্চ, ২০০৫

গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাপনী ভাষণের মধ্যদিয়ে শেষ হলো জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। বিভিন্ন কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ অধিবেশন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলসমূহের বর্তমান আন্দোলন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থান আরো সুস্পষ্ট হয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ চলবে তার জনগণের ইচ্ছায়, আইন প্রণয়ন করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং দেশের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন সরকার। এখানে কারো চোখ রাঙানোর কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ কারো 'ডিকটেশনে' চলবে না। এটাই প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত কথা। তার এ বলিষ্ঠ বক্তব্য ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে দেশে-বিদেশে।

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের আগেই একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অপরদিকে নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যত রদ-বদল সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি নিয়ে নতুন করে মাঠে নেমেছে আওয়ামী লীগ। সাথে রয়েছে তার নেতৃত্বাধীন কয়েকটি ছোট বিরোধী দল। বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ এখনও ভুলে যায়নি যে, মূলত আওয়ামী লীগের তুমুল আন্দোলনের মুখেই গৃহীত হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান। উদ্দেশ্য ছিল এদেশের সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা। সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক সরকারে বিশ্বাস করে- বিশ্বের তেমন কোনো দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নেই। কারণ এটি অন্তর্বর্তীকালীন একটি ক্ষণস্থায়ী সরকার হলেও এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বের কোথাও নেই। এর মূল কারণ একটিই। এটি কোনো নির্বাচিত সরকার নয়। বিশ্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য কিংবা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতসহ কোথাও এর কোনো অস্তিত্ব নেই। সংসদীয় পদ্ধতির রাজনীতিতে এটি এক অদ্ভূত শিশু। এর কোনো পিতা-মাতার পরিচয় নেই। নেই কোনো আইনানুগ ধারাবাহিকতা বা শক্তিশালী ভিত্তি।

তৎকালীন বিএনপি সরকারকে সংসদে আইন পাস করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতে হয়েছিল। চাপের মুখে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেন একটা জনপ্রিয়, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জন্য ছিল এক ধরনের আত্মসমর্পণ। এ বিধানকে কার্যকরী করতে গিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতা ছেড়ে নতুন করে নির্বাচন দিতে হয়েছিল এবং শিকার

www.pathagar.com

হতে হয়েছিল এক ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ব্ল্যাকমেইলের। তবুও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত '৯৬-এর নির্বাচনের পরাজয়কে বিএনপি হাসি মুখে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আজও জনমনে প্রশ্ন রয়ে গেছে সে নির্বাচন কী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? আওয়ামী লীগ সেদিন এ বিষয়টি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কারণ তারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। যেভাবেই হোক বিজয়টাই ছিল সেদিন তাদের কাছে মুখ্য বিষয়। আবার সেই আওয়ামী লীগই যখন একই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে গেল তখনই প্রশ্ন তুললো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা দিক নিয়ে। তাই সর্বত্রই একটি প্রশ্ন অত্যন্ত সোচ্চারভাবে এখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– যেভাবেই হোক আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্যই কী সবকিছু করতে হবে? বার বার বিধান ভাঙতে হবে?

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটি মূলত আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে এমন কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটেনি যে কথায় কথায় তা পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতি বা একটা পদ্ধতি কোনো ছেলে খেলা নয় যে কথায় কথায় তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্যাভিজ্ঞ মহলে ইতোমধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। তা হলো ঃ তত্ত্বাবধায়ক (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকার পদ্ধতিতে নয় বরং নির্বাচন কমিশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা আবশ্যক। কারণ নির্বাচনে কারচুপি রোধ কিংবা পেশী শক্তি ও কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ করতে চাই কঠোর ব্যবস্থা। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনকে আরও নিরপেক্ষ এবং আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে কারোরই কোন আপত্তি নেই। এদেশে গণতান্ত্রিক সকল নির্বাচনকে শঙ্কামুক্ত ও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে বলে সবাই বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনানুগভাবে তেমন কিছুই করতে পারে না। পারে সম্মিলিতভাবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো।

আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতার আত্মীয়তার বন্ধন খুঁজে বের করেছে। এ বন্ধনের কারণে নাকি নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব হতে পারে। তাছাড়া তাদের আরো দাবি, বর্তমান সরকারের ক্ষমতা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের মধ্যদিয়ে প্রধান বিচারপতিকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের কথা হলো ওই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টই সকল দল ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এরপরও যদি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বা তাদের নির্বাচনী জোটের ভরাডুবি হয় তাহলে তাদের নেত্রী মুহূর্ত দেরী না করে হয়তো বলবেন, 'নির্বাচনে পুকুর চুরি হয়েছে, ঘটেছে বিশাল ভোট ডাকাতি'। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। তারপর আবু সাঈদ সাহেবকে বানিয়েছিলেন প্রধান নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনার। তাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ২০০১ সালের নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগের পরাজয় ঘটলো তখন আওয়ামী লীগ নেত্রী অভিযোগ করলেন, 'বেড়া দিলাম ক্ষেত রক্ষার জন্য কিন্তু আমার বেড়াই ক্ষেত খেয়ে ফেলেছে।' কিন্তু এই অভিযোগ আওয়ামী লীগ তাদের পছন্দের বিচারপতি হাবিবুর রহমানের (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান) আমলে করেনি। কারণ সে নির্বাচনে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ জয়েছিল। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিএনপিপন্থী জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস কিন্তু তারা তাতে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হেরে যাবার পর থেকে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে তারা নানান অভিযোগ আনা শুরু করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে এবং এটিকে ইস্যু করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট এখন আন্দোলনে যাওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা পরিবর্তন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নয়া দাবি নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে দেশের কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ১৯৯৬ এবং ১৯৯৯ সালে দু'টি রিট হয়েছিল। গণতন্ত্রের স্বার্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের (ত্রয়োদশ সংশোধনী) এ সংশোধনী আনা হয়েছে বলে কারণ দেখিয়ে রিট দু'টিই খারিজ করে দেয়া হয়েছে। আদালতের সে রায়কে উপেক্ষা করেই আওয়ামী লীগ এখন আবার নতুন করে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবি তুলেছে। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট কোনো ছাড় দেবে না বলে আগেই উল্লেখ করেছে। এতে সামনের দিকে অর্থাৎ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ যখন দেখবে তাদের জেতার কোনো আশা নেই তখন বেঁকে বসে নির্বাচন বর্জন করতে পারে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৯৫-'৯৬ সালের মতো বোমাবাজিসহ চরম সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করতে পারে এ ধারণা অনেকের। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কি কি করতে পারে সম্প্রতি তার একটি লম্বা ফিরিস্তি পাওয়া গেছে প্রেসক্লাবে কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায়।

সেদিন আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে যারা বিতর্কিত করতে চায়, তারা গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নস্যাৎ করে আপোষকামিতার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায়। তিনি বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি ইতোপূর্বে মীমাংসিত হয়েছে। এটা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তোলার নামে দেশে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। কারণ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরপর তিনটি নির্বাচন প্রশ্নাতীতভাবে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। তবে এসব কথায় আওয়ামী লীগের 'চিড়ে ভিজবে' কী না বলা কঠিন। বলেছেন আওয়ামী লীগের একজন সমালোচক। তিনি বলেছেন, তারা

www.pathagar.com

এখন নিজের অতীত ক্ষত নিজে চাটলেও এ বিষয়টি নিয়ে দেশে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এতে দেশের অর্থনীতি কিংবা উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত বা বাধাগ্রস্ত হলেই বা তাদের কী? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশ থাকলো কি থাকলো না, এতে নাকি কিছু আসে যায় না, বলেছেন সে সমালোচকটি। এ মুহূর্তে দেশে আওয়ামী লীগের ন্যূনতম কোনো সাংগঠনিক কার্যকলাপ চোখে পড়ে না। সংগঠন না করে শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ১৯৯৫-'৯৬ আর ২০০৫-'০৬ এক জিনিস নয়। গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়া এখন বহু এগিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও একেবারে পিছিয়ে নেই। ঘরে বসেই গ্রামে-গঞ্জের মানুষ এখন সকল তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া অতীতের লুটপাট ও সন্ত্রাসের গডফাদার তৈরির যে রাজনীতি তার পাশাপাশি জনগণ এখন একটা উন্নয়নের ধারা সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কারও ভয়ভীতিতে আজকাল গ্রামে-গঞ্জে কেউ কাউকে ভোট দেয় না। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে গত সাধারণ নির্বাচনে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গত ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশব্যাপী এক নীরব ব্যালট বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচন কমিশনে ব্যাপক রদবদল আনার দাবি জানিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন কমিশনকে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে। নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করে রিটার্নিং অফিসারদের কমিশন থেকে পাঠানোরও দাবি ওঠেছে। এগুলো যৌক্তিক দাবি। নির্বাচন কমিশন যত শক্তিশালী হবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া ততই স্বচ্ছ হবে। পেশী শক্তি, কালো টাকা ও জাল-জালিয়াতির পরিমাণ ততই কমে আসবে। অতীতে বহুবার দাবি উঠেছে দেশের সকল পর্যায়ের ভোট গ্রহণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠানের জন্য। এ দাবিটিও বিবেচনা করে দেখা যায়। রাজনীতিতে সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোকিত মানুষকে এগিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক। দেশের প্রবীণ রাজনীতিক অলি আহাদের বর্ণনা অনুযায়ী 'গরুর দালাল', কালো টাকার মালিক, চোরকারবারি, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, মাস্তান ও চাঁদাবাজদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ রাজনীতি এখন জনসেবা নয়, ক্রমশ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। কিছু কিছু সংসদ সদস্য গম থেকে শুরু করে ব্রিজ, কালভার্ট ও রাস্তা নির্মাণের কাজেও 'পারসেন্টিজ' চায় বলে অভিযোগ ওঠেছে। এরা যে দলেরই হোক এদেরকে রুখতে হবে। নতুবা গণতন্ত্র ও রাজনীতি কোনটাই মুক্তি পাবে না। রাজনীতি নিরেট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

এ অবস্থায় আসল কাজ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট এখন বলছে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার না করলে তারা আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে না। তারা নির্বাচন কমিশন সংস্কারের ব্যাপারে যতটা না সংকল্পবদ্ধ তার চেয়ে অনেক

www.pathagar.com

বেশি দৃঢ়চিত্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের ব্যাপারে। সরকার বলছেন, 'এ বিষয়টি সাংবিধানিকভাবেই ঠিক করা হয়ে গেছে।' তারপরও তারা একথা বলছে দেশে একটা অরাজকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য। আন্দোলনের নামে হরতাল দিয়ে, ভাঙচুর করে, উন্নয়নকে ব্যাহত করে তথাকথিত জনপ্রিয়তা লাভের জন্য। দেশব্যাপী এ অভিযোগ ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এ লেখার ওপরের অংশে এ ব্যাপারে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আগামী নির্বাচনের পূর্বে বাদবাকি সময়টা আওয়ামী লীগ তার নেতৃত্বাধীন ছোটখাট দলগুলো নিয়ে অযৌক্তিক অনেক দাবি-দাওয়া তুলে মাঠ গরম রাখতে চাইবে। কিন্তু সেটা যদি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলে সরকারকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে এখন থেকেই। কোন প্রকার অন্যায়, অনিয়ম, সন্ত্রাস-রাহাজানিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কারণ সংসদীয় রাজনীতি করলে ব্রিটেন ও ভারতসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের মতই সুশীল ও সভ্যভাবে করা উচিত। সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে আজ এটা, কাল সেটা নিয়ে জনজীবন বিপন্ন করা যাবে না। জনগণ কাউকে রাজনীতি করার লাইসেন্স দেয়নি। সে সমস্ত রাজনীতিকরা রাজনীতি করে তাদের দলীয় স্বার্থে। আবার কেউ কেউ করে ব্যক্তি স্বার্থে। জনস্বার্থে যারা রাজনীতি করে তারা দেশের মানুষের স্বার্থ দেখে, উন্নয়নের ধারায় অবদান রাখে ও সাহায্য করে। দেশের স্বার্থে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে ঐক্যবদ্ধ হয়। ত্যাগ স্বীকার করে এবং প্রকৃত অর্থে জনসেবা করে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বিরোধী দলগুলো সে পথে নেই। তারা চায় ক্ষমতা। কোন্ অধিকারে তারা এ দাবি তুলে তা আজও বোঝা গেল না। বিশ্বের মানুষ একুশ শতকের নয়া পথে পা বাড়ালেও এরা এখনও পড়ে আছে ঔপনিবেশিক আমলে। এরা পাকিস্তান আমলের ধারায় বা কৌশলে রাজপথে আন্দোলন করে। হরতাল করে, ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলে, যাত্রীসহ বাস পুড়িয়ে, গাড়ি ভাঙচুরসহ অন্যান্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করে একটি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটাতে চায়। এটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। এ দেশে ১৯৯৫-'৯৬ সালের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে।

এ কথা অনস্বীকার্য, বর্তমানে এ দেশে রাজনীতি চর্চা কিংবা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই। তেমনি কারার অন্তরালে আবদ্ধ নেই কোনো বিরোধীদলীয় রাজনীতিক কিংবা সাংবাদিক। এ অবস্থায় রাজনীতিকে কোনো আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দিকে না নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। জনগণের মতামতের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না দেখিয়ে তাদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকে দূরে থাকতে হবে। নতুবা সংঘাতময় রাজনীতি দেশ ও তার জনগণের কোনো কাজে আসবে না। এতে হিতে বিপরীত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় বিরোধীদলের উচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হোক আর নির্বাচন কমিশনের সংস্কার নিয়েই হোক, সরকারি দলের সাথে বৈঠকে বসা। এখন রাজধানী ঢাকায় বসেই সব করতে হবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। কারণ তাতে বাংলাদেশের মুক্ত মানুষ বিরোধীদলের প্রতি ক্রমশ আরো বিরূপ হবে।

www.pathagar.com

'বাঁচাও নদী ... বাঁচাও বাংলাদেশ'

নয়া দিগন্ত, ১২ মার্চ, ২০০৫

'ফারাক্কার ফাঁদে পদ্মা গেছে
মেঘনা যাবে বরাক বাঁধে
ব্রহ্মপুত্র ধুধু বালু
সব হারিয়ে তিস্তা কাঁদে।'

আমি কবি নই তবুও ভারতের আন্তঃনদী প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমাদের ৫৩টি অভিন্ন নদীর যে হাল হবে তারই একটি খন্ড চিত্র তুলে ধরার চেস্টা করেছি ওপরের ক'টি পংক্তিমালায়। আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে কুড়িগ্রামের চিলমারীতে যখন লক্ষাধিক বিক্ষুব্ধ মানুষের সমাবেশ ঘটেছে কিংবা টিপাইমুখ অভিমুখে চলেছে লং মার্চ তখন ভারত তাদের গজালডোবা বাঁধের সবগুলো গেট বন্ধ করে দেয়ায় তিস্তা নদীতে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বাঁধটি তিস্তা নদীর উজানে ভারতের প্রায় ৬৪ কিলোমিটার অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হয়েছে। ভারত পানি আটকে দেওয়ার ফলে তিস্তা সেচ প্রকল্প এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, তিস্তা সেচ প্রক্রিয়া চালু রাখতে সর্বনিম্ন ১০ হাজার কিউসেক পানির প্রয়োজন। তিস্তায় পানির প্রবাহ না থাকায় নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলায় মরুভূমির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া খবরে প্রকাশ ১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় ছাড়কৃত পানি বাংলাদেশ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে না বলে অভিযোগ তুলেছে ভারত। সেই অজুহাতে ভারত উজানে আরও পানি প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারতের মতে বাংলাদেশ নাকি ছাড়কৃত পানি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। যথাযথ পদক্ষেপ না থাকায় ফারাক্কায় ছাড়কৃত বাংলাদেশের পানি নাকি বঙ্গোপসাগরে পড়ে যাচ্ছে। ভারতের এই বক্তব্যকে চুক্তি অনুযায়ী পানি না দেয়ার খোঁড়া অজুহাত বলে মনে করছেন বাংলাদেশী পানি বিশেষজ্ঞরা।

গত কয়েক মাসে ফারাক্কা বাঁধ থেকে আসা গঙ্গার নির্ধারিত পানির অভাবে পদ্মাসহ সংযুক্ত নদীগুলো যখন নাব্যতা হারাচ্ছে, পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাচ্ছে না সেচের জন্য এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরে বাড়ছে লোনা পানির পরিমাণ, তখন ভারত দিচ্ছে এ সমস্ত খোঁড়া যুক্তি। ইতোমধ্যে এসমস্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যাংগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরবনের নদী সংলগ্ন গাছপালার আগায় এক ধরনের মড়ক দেখা দিয়েছে। এসব অঞ্চলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ যতই বিঘ্নিত হচ্ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে লবণাক্ততা। এতে এ এলাকার ফসলাদি

www.pathagar.com

বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ক্রমশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র। এ অঞ্চলের চিরচেনা দৃশ্যপট হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। উজানে অভিন্ন নদ-নদীতে বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে ভারতীয় পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ২০টি ছোট ছোট নদী ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে এবং পরিণত হয়েছে কতগুলো বালির স্তূপে। এ অবস্থায় ভারত বলছে ফারাক্কার ছাড়কৃত পানি নাকি আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। বাংলাদেশের এ পানির নাকি কোনো প্রয়োজন নেই।

ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল যখন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে তখন ভারত মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করে বিতর্কিত 'টিপাইমুখ বহুমুখী জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র' নির্মাণ করতে চলেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রবহমান সুরমা ও কুশিয়ারা নদী পানির অভাবে শুকিয়ে যাবে। ফলে আবহমান বাংলাদেশের বিশাল নদী মেঘনা হারাবে তার স্রোতস্বিনী ধারা। অন্যান্য নদ-নদীর মাঝে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র মূলতঃ বাংলাদেশের পানি প্রবাহ সঞ্চালন করে। কৃষিতে নদী আমাদের সেচ কাজের প্রধান উৎস। তাছাড়া নৌপরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ নদীগুলো আমাদের শরীরের শিরা-উপশিরার মতো বয়ে চলেছে। অগণিত নদীকে কেন্দ্র করেই আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ। আমাদের ভূ-প্রকৃতি ও সকল জীব-বৈচিত্র। ভারতের সাথে আমাদের যে ৫৩টি অভিন্ন নদী রয়েছে, তার অবাধ প্রবাহের ওপরই প্রকৃত অর্থে নির্ভর করছে আমাদের চিরায়ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব।

ভারতের অভ্যন্তরে গজালডোবা বাঁধের সব গেট বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বর্তমানে তিস্তা প্রবাহ শূন্য হয়ে পড়েছে। তিস্তা সেচ প্রক্রিয়া চালু রাখতে আমাদের প্রয়োজন হয় ১০ হাজার কিউসেক পানি। সেখানে ডিসেম্বরে পানির প্রবাহ ছিল ৩ হাজার কিউসেক, জানুয়ারিতে ১৮শ' এবং গত মাসে তা নেমে এসেছিল মাত্র ১২শ' কিউসেকে। এখন তিস্তা সেচ প্রকল্প পানি শূন্য। একদা প্রমত্তা তিস্তা এখন তার অস্তিত্বের জন্য ক্রন্দন করছে। তাই গত ৪ মার্চ আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি আয়োজিত লংমার্চ ও মহাসমাবেশ উপলক্ষে চিলমারী বন্দরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বালু চরে জমায়েত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষ। তাদের দাবি ছিল 'নদী বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, বাঁচাও বাংলাদেশ। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ বাতিল করো, বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত মানি না, মানব না। এই গগন বিদারী স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠেছিল কুড়িগ্রাম শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে চিলমারী বন্দরের ব্রহ্মপুত্র-নদের ধুধু বালুচর। বক্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল না করা হলে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে না খাওয়া ও সেচ কাজের জন্য। তাছাড়া আর্সেনিকের মতো মারাত্মক রোগে মারা যাবে এ দেশের সাধারণ মানুষ, বিরাণ হবে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু।

www.pathagar.com

ভারত তার দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ৩৭টি আন্তর্জাতিক নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে রিজার্ভার নির্মাণ ও খাল খননের মাধ্যমে নদীর গতি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ভারতের এই ভয়াবহ প্রকল্পগুলো কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না বলে উলেখ করেছেন বাংলাদেশের পানি ও প্রকৃতি বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, উপমহাদেশের ২৫০টি আন্তর্জাতিক নদীর অধিকাংশেরই উৎপত্তি হিমালয়ে। এ অবস্থায় ফারাক্কার পর বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখে ভারত বাঁধ নির্মাণ করতে সক্ষম হলে সমুদ্র উপকূল থেকে ধেয়ে আসা লোনা পানি দেশের ২৪০ মাইল মিঠা পানি নদীর ভিতরে চলে আসবে, নদী-নালা, খাল-বিল সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে যাবে। এ দেশের মানুষের বেঁচে থাকার যে মূলভিত্তি কৃষি, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও সবুজ বনানী বিপর্যস্ত হলে ভয়াবহ ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা অনেকগুণ বেড়ে যাবে এ অঞ্চলে। এ আশঙ্কায় ৯ ও ১০ মার্চ রাজধানী ঢাকার মুক্তাঙ্গন থেকে টিপাইমুখ (সিলেট) অভিমুখে লং মার্চের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল "ভারতের নদী আগ্রাসন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি।" এতে সব মিলিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। যথাক্রমে চিলমারী ও টিপাইমুখ অভিমুখে আয়োজিত লংমার্চ এবং জন সমাবেশ এ কথাই প্রমাণ করেছে যে ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, বাঁধ নির্মাণ ও একতরফা পানি প্রত্যাহারের ঘটনা ও উদ্যোগে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কতটুকু ক্ষুব্ধ এবং উদ্বিগ্ন। তারা এর একটি চূড়ান্ত সমাধান চায়। এ বিষয়টি নিয়ে আজ শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, ইউরোপ ও আমেরিকায়ও শুরু হয়েছে এক যুগপৎ পরিবেশবাদী আন্দোলন।

এ অবস্থায় ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী বলেছেন যে, স্থগিত হয়ে যাওয়া সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পানিসম্পদ নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে জটিলতা কাটাতে সার্ক সম্মেলনের পরে প্রথমে সচিব পর্যায়ে এবং তারপর মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হবে। মুন্সী বলেছেন, ' আমরা বারবার বলেছি প্রথমে তিস্তায় পানি প্রবাহ আপাতত কতটুকু রাখা হবে, কীভাবে হবে তার একটি খসড়া তৈরি করতে হবে। সার্ক সম্মেলনের পর প্রথমে সচিব পরে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এতে তিস্তার পানি বন্টনের বিষয়টি অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেচের পানির অভাবে এ অঞ্চলের ইরি-বোরো চাষ এর মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে কোটি কোটি টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর প্রিয়রঞ্জন বাবু বলেছেন, যা হয় সার্ক সম্মেলনের পর হবে। অথচ তিনি জানেন না, কেউ এখনও জানে না, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ পর্যন্ত আবার কবে অনুষ্ঠিত হবে। সার্ক সম্মেলনের অনিশ্চয়তার মতো তিস্তার পানি বন্টনের বিষয়টিও এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে অভিন্ন নদী

www.pathagar.com

সংযোগ করার যে পরিকল্পনা ভারত সরকারের হাতে রয়েছে, তারমধ্যে হিমালয় থেকে প্রবাহিত নদীগুলোর সংযোগ স্থাপন নিয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্তে আসছে না ভারত। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে এক অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মুন্সী বলেছেন, নদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের নদীগুলোকেই এখন গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত। তবে হিমালয় থেকে আসা নদীগুলো সংযোজনের জন্য সমীক্ষা বর্তমানে করিয়ে রাখা হচ্ছে। এ ধরনের বিষয় নিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী ধৈর্য ধরে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারলেও বাংলাদেশ পারবে না। কারণ এতে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পানির অভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন শুরু হয়েছে এক মরুকরণ প্রক্রিয়া। পানির অভাবে আমাদের নদীগুলো ক্রমশ নাব্যতা হারাচ্ছে, ভরাট হয়ে যাচেছ। মৎস্য, জীব ও উদ্ভিদ জগৎ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে দেশের অনেক অঞ্চলে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা। এ অবস্থায় দেশের বিপন্ন ও বিক্ষুব্ধ মানুষ মাঠে নেমেছে। এখন আমাদের সরকারের কী করা উচিত তা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা কর্তৃপক্ষই ভালো জানেন। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এ ভাবে আর চলবে না। জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের এই বাংলাদেশের চির - সর্বনাশ।

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমন কমিশনের ভবিষ্যত নিয়ে জনমনে প্রশ্ন

নয়া দিগন্ত, ৫ মার্চ, ২০০৫

ঢাকার কিছু সমালোচনামুখর গণমাধ্যম সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমান স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কি স্বাধীন মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য? আইনানুগভাবে আত্মপ্রকাশ করার তিন মাস পরও কমিশন তার মৌলিক কার্যপ্রণালীটিই ঠিক করতে পারেনি এ পর্যন্ত। কমিশনের হাতে গোনা কয়েকজন অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নেহাত তর্ক-বিতর্কেই কাটিয়ে দিয়েছেন এ গুরুত্বপূর্ণ সময়টা। তাই দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি এখনও। অথচ এ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেক। দুর্নীতি কবলিত জাতি সঙ্গত কারণেই আশা করেছিল এবার বুঝি অবসান ঘটবে ঘুষ, দুর্নীতি, পরস্ব অপহরণ ও লুটপাটের মাৎস্যন্যায়। কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়। সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি ও লুটপাটের শেকড় এত গভীরে চলে গেছে যে, সর্বশক্তি দিয়েও তাকে হঠাৎ করে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতার গত ৩৩ বছরে দুর্নীতি এদেশে প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এহেন অবস্থায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমেই চাই কিছু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও কর্মকর্তা। কিন্তু ঘটেছে তার সম্পূর্ণ উল্টো, এটিই হচ্ছে গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, যারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য কমিশনের সাথে এখনও লেগে আছেন, তাদের মন্তব্য।

নবগঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন এখতিয়ার দিয়ে ফৌজদারি আইনের সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ রাখা হয়নি কারও জন্য। সে অবস্থায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলেছিল, কমিশন দুর্নীতি দমনে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে মনোভাব বদলাবে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি বাড়বে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আরও অন্তত শতকরা দু'ভাগ বেড়ে যাবে। অপরদিকে দেশের মানুষ ঘুষ ও শোষণ-দুর্নীতির হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাবে। এরই ভিত্তিতে তাই এখন প্রশ্ন ওঠেছে, শিশু কমিশনের দাঁত গজানোর পালা শেষ হবে কবে? তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশনটি গঠিত হয়েছে মূলত অবসরপ্রাপ্ত কিছু বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। তাছাড়া এদের কোন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাও নেই। ফলে তদন্ত কমিশনের জনবল, বেতন, কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্য-কলাপের কোন সুস্পষ্ট কৌশল প্রণালী নির্ণীত হয়নি এখনও। তাছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান এবং সদস্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার দ্বন্দ্ব লেগেই আছে সারাক্ষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং রাষ্ট্রদূত মনিরুজ্জামান মিঞা অভিযোগ এনেছেন কমিশনের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খান যেভাবে কমিশন পরিচালনা করছেন তার সঙ্গে তিনি একমত নন। এ বিষয়টি একাধিকবার সরাসরি চেয়ারম্যানকে জানালেও তিনি নাকি প্রফেসর মিঞার কথার কোন গুরুত্বই দেননি। এ ব্যাপারে বারবার শুধু পাশ কাটিয়ে গেছেন চেয়ারম্যান। ঐ বিষয়টি তার জন্য অত্যন্ত অসম্মানজনক বলে উল্লেখ করেছেন মিঞা সাহেব। তাই দুর্নীতি দমন কমিশনে আর থাকতে চাচ্ছেন না তিনি। তিনি বলেছেন, 'এখানে আমি স্বস্তিবোধ করছি না।'

উল্লেখিত বিষয়টি প্রফেসর মিঞা নাকি প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেননি। তাই তিনি বর্তমান সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে মনস্থির করেছেন। তবে এখনও সবকিছুই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার আলাপ-আলোচনার ওপর। একথা ঠিক যে, ড. মিঞা প্রথম থেকেই একটি বিষয়ে জোর দিয়ে এসেছেন আর তা হচ্ছে নবগঠিত স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কোনো স্টাফ নেয়া ঠিক হবে না। অন্যথায় মানুষ ভাববে দুর্নীতি দমন কমিশন হচ্ছে নতুন বোতলে আবার সেই পুরনো মদ পরিবেশনের অপকৌশল। এতে না পাবে কমিশন কোনো স্বচ্ছতা, না দমন হবে দুর্নীতি। মাঝখান থেকে বর্তমান জোট সরকার পড়বে এক অসহনীয় তোপের মুখে। সে কারণে বিলুপ্ত ব্যুরোর কর্মকর্তাদের নতুন করে কমিশনের বিভিন্ন দায়িত্বে দিতে বিচারপতি খান যে উদ্যোগ নিয়েছেন প্রফেসর মিঞা তার বিরোধিতা করছেন। বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কারণ এক্ষেত্রে মিঞা সাহেবের অবশ্যই কিছু যুক্তি রয়েছে।

নবগঠিত স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান অবস্থার জন্য বিচারপতি সুলতান হোসেন খান কিংবা প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা কোনো মতেই সরকারকে দায়ী করছেন না। তারা বলেছেন, এ ব্যাপারে সরকারের দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য কোনো হাত নেই। সরকার কোনো ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করেনি। এটি সম্পূর্ণভাবে বর্তমান স্বাধীন কমিশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে জন্মলগ্ন থেকে কমিশনের যে হাল হয়ে আছে তাতে এ পর্যায়ে সরকারের পরামর্শ বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। নতুবা বর্তমান বাক-বিতন্ডায় কমিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এতে নিঃসন্দেহে সরকারের ভাবমূর্তি ম্লান হবার আশংকা রয়েছে। কারণ সার্বিক বিবেচনায় সরকারের এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ফলেই কিন্তু এ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে। তাছাড়া এটি ছিল সরকারের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার। এটি অকার্যকর কিংবা ব্যর্থ হলে আগামী নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটকে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। সুতরাং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সাফল্য ও ব্যর্থতায় বর্তমান সরকারের কোন দায়-দায়িত্বই নেই একথা বলা যাবে না।

দুই 'বুড়ো খোকার' দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থানগত দ্বন্দ্বের ফলে নবগঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এ অবস্থাকে আর চলতে দেয়া যেতে পারে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। কারণ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে নেয়া কার্যকরী ব্যবস্থা বর্তমান সরকারের দু'টি উল্লেখযোগ্য অর্জন বলে দেশব্যাপী বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে র‍্যাবের যে সাফল্য তার সাথে কোনো দিক দিয়েই তুলনা করা যায় না দুর্নীতি দমন কমিশনকে। কারণ দুর্নীতি দমন কমিশন এখনও তার যাত্রাই শুরু করতে পারেনি। বারবার শুধু হোঁচট খাচ্ছে। প্রথমত যে বিষয়টি সূচনা থেকেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তা হচ্ছে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বয়স। দ্বিতীয়ত এদের কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নেই এবং তৃতীয়ত এদের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্রে রয়েছে আকাশ-পাতাল ফারাক। অনেকের ধারণা এ কমিশনে একজন অবসরপ্রাপ্ত কেবিনেট সচিব পর্যায়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল। তাহলে এতে কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্ম প্রণালী নিয়ে বিরোধ বাঁধতো না। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে কমিশনে এখনও কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের অবসান হয়নি। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগগত বিভ্রাট ছাড়াও দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে কোন্ পর্যায়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তার কোনো কৌশল নির্ণীত হয়নি। এ ব্যাপারে একটি কৌশলগত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত ছিল, যা কার্যকরীভাবে এখনও হয়নি।

বহু কারণে স্বাধীন দুর্নীতি দমনের কার্যকারিতা এ জাতির জন্য এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি শুধু সামাজিক সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে করেছে বিপর্যস্ত এবং রাজনীতিকে অনেকাংশে করেছে কলুষিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পর পর কয়েকবার বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে বিশ্বের বুকে দুর্নীতিতে 'নাম্বার ওয়ান' দেশ হিসেবে। এ কলঙ্ক তিলকের ছাপ পড়েছে সমগ্র জাতির ওপর। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের মতে দুর্নীতি আমাদের উন্নয়নের পথে এখন প্রধান অন্ত রায়। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী টরকেল প্যাটারসন সম্প্রতি ঢাকা সফরকালে বলেছিলেন, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই শক্ত হাতে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে হবে। কারণ এ বিষয়টি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। দুর্নীতির কারণে এদেশে শুধু বিদেশী বিনিয়োগকারী নয়, শিল্প-কারখানা স্থাপনে উৎসাহী দেশীয় উদ্যোক্তারাও অনেক সময় পিছিয়ে যান। কারণ লাইসেন্স বের করা থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে তাদেরকে অবাঞ্ছিত বহু সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। ঘুষ দিলে সব ঠিক, কোথাও ধর্ণা দিতে হয় না। বাসায় কিংবা অফিসে বসেই সকল কাজ সমাধা করা যায়। আয়কর, কাস্টমস, বিদ্যুৎ বিভাগ, দলিল পত্র রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, রাজউকসহ এমন বহু অফিস আদালত আছে যেখানে প্রকাশ্যে ঘুষ-দুর্নীতি চলছে। নিম্ন আদালতসমূহের অবস্থা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে।

এ অবস্থা সরকার হয়তোবা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ দিনে দিনে মানুষ যতই মূল্যবোধ হারাচ্ছে ততই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। একদিকে নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ ফেলে দিচ্ছে, অপরদিকে ঘুষের টাকায় করছে মেদ বৃদ্ধি। এদের

www.pathagar.com

কাছে ধর্ম-কর্ম বা ন্যায়নীতির কোনো মূল্য নেই। এভাবেই জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ঘুষ-দুর্নীতি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এর বিস্তার রোধ এবং এই সামাজিক ব্যাধি সারানোর জন্য চাই একটি আপাদমস্তক অপারেশন। ওপর থেকে মলম লাগিয়ে সারানো যাবে না এ ব্যাধি। সর্বক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমনের মতো দুর্নীতির দমনের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী তার সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। সুতরাং নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি– এই দুই ব্যাধি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে এ সময়ের এক নম্বর চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে সরকার যত কঠোর হবে, তার জনপ্রিয়তাও পাল্লা দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ততই বেড়ে যাবে। বাংলাদেশে সাধিত হবে এক নীরব বিপ্লব। এক্ষেত্রে ন্যূনতম কোনো দুর্বলতা কিংবা ছাড় দেয়া সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার জন্য মারাত্মক পরিণাম ডেকে নিয়ে আসবে।

আমরা কথায় কথায় মূল্যবোধের কথা বলি। প্রচার করি গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বাণী। পরিবর্তনের ধারা শুরু হতে হবে এ বাণী প্রচারকদের মধ্য থেকেই প্রথম। অর্থাৎ রাজনীতিকদের মাঝেই ত্যাগ ও পরিবর্তনের ধারা সূচিত হতে হবে প্রথম। তাদের দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে। দেশের থানা, পুলিশ ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানকারীদের মধ্যে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এর নেতৃত্বে থাকবেন আমাদের সুশীল সমাজের কর্ণধাররা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এর পাশাপাশি চাই সৎ, ত্যাগী ও আদর্শবাদীদের নেতৃত্ব। খারাপ বা মন্দ অর্থ অর্থাৎ কালো টাকা যেমন ভালো টাকাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে তেমনি খারাপ নেতৃত্বও ভালো, নীতিবান ও আদর্শবান নেতা-কর্মী কিংবা রাজনীতিবিদদের মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেয়। প্রবীণ রাজনীতিক অলি আহাদের ভাষায় এখন 'গরুর দালালরা'ও আসছে রাজনীতিতে। সন্ত্রাসী, মাস্তান, পেশী শক্তি ও কালো টাকার মালিকদের হাত থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও নিষ্কলুষ করতে না পারলে দুর্নীতির কালো থাবা থেকে এ দেশ কখনও পরিত্রাণ পাবে না। আজ দেশব্যাপী স্লোগান ওঠা উচিত যে, 'দুর্নীতির হাত থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করো।' এ লক্ষ্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে প্রয়োজন শুদ্ধি অভিযান। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বয়কট করতে হবে। নতুবা আমাদের যেমনি মুক্তি আসবে না, তেমনি আমাদের মাঝে প্রকৃত দেশপ্রেমও সৃষ্টি হবে না।

এ অবস্থায় নবগঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা বলে শেষ করা যাবে না। এদেশ ও জাতির জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো দুর্নীতি রোধ করা এবং দুর্নীতিবাজদের দমন করা। এ অবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশনের যে কোনো দুর্বলতা দুর্নীতিবাজদেরকেই আশার আলো

www.pathagar.com

দেখাবে। তাদের হাতকে আরও শক্তিশালী করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান সম্প্রতি বলেছিলেন, দুর্নীতিবাজদের ধরা হবে এবং দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন আপস করা হবে না। গোয়েন্দা কার্যকলাপের জন্য সোর্স নিয়োগ করা হবে। সমাজের রুই-কাতলা সবার ব্যাপারেই তদন্ত হবে। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রফেসর মিঞার বক্তব্যও ফেলে দেয়ার মতো নয়। বাতিল করা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কমিশনে না টেনে আনাই উত্তম হবে। কারণ দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তাদের অতীতের রেকর্ড খুব উজ্জ্বল নয়। যদি তা না হতো তাহলে এদেশ দুর্নীতিবাজদের এতবড় অভয়ারণ্যে পরিণত হতো না। তাই দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটা আবশ্যক। এ কাজটি যখন কমিশনের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্যদের দিয়ে এত দিনেও হয়নি তখন সরকারকেই সে দায়িত্ব নিতে হবে। এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ নয়, পরামর্শ প্রয়োজন। নতুবা অতি দ্রুত এই কমিশন একটি উদাহরণমূলক তামাশায় পরিণত হবে এবং কমিশন গঠনে সরকারের দীর্ঘ প্রচেষ্টা বিফলে যাবে, যা দেশবাসীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

www.pathagar.com

তেত্রিশ বছরের মধ্যে হরতালে কেটেছে প্রায় সাড়ে তিন বছর

নয়া দিগন্ত, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

গণতন্ত্র কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে আমরা কে কতটুকু বুঝি, আমি জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, গণতন্ত্র জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। মানুষের অধিকারের পথ ধরেই গণতন্ত্র নামক বিষয়টি এগিয়ে এসেছে। এইচ এফ এমিয়েল, আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের একজন মুখপাত্র ছিলেন। তিনি গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বার্থ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন। তার কথা হলো, 'আমি গণতন্ত্রের অধিকার অস্বীকার করি না, কিন্তু যতো দিন পর্যন্ত জাতীয় স্বার্থের জ্ঞান থাকবে দুর্লভ আর অহংকার থাকবে প্রবল, ততো দিন পর্যন্ত ওই অধিকারগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, সে সম্পর্কে আমার কোন উচ্চাশা নেই।' গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে হরতালকে মানুষের একটি অধিকার বলে গণ্য করা হয়েছে। তবে তা কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত, সেটা বলা হয়নি। সে কারণেই হরতালের ব্যবহার এবং অপব্যবহার নিয়ে দীর্ঘদিনের একটি বিতর্কমূলক ইতিহাস রয়েছে।

সামন্তবাদী, উপনিবেশবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী বিধি-ব্যবস্থায় হরতালের ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ এক রকম। পুঁজিবাদী কিংবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্য রকম। পরাধীন একটি জাতি কিংবা জনগোষ্ঠীর কাছে হরতালের কার্যকারিতা আর স্বাধীনতা প্রাপ্তদের কাছে তার উপযোগিতা এক নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে হরতালের উপযোগিতা কিংবা কার্যকারিতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্যই এত কথা। এ কথা ঠিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের মাঝে হরতালের কার্যকারিতা ক্রমশ কমে এসেছে। হরতাল আজকাল আর দাবী আদায়ের কোনো হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই হরতাল এখন রাজনৈতিক অঙ্গণে নয়, বরং সীমিতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা শ্রমিকদের মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা টিকে আছে। তাও আবার বিভিন্ন সরকারের যুগোপযোগী শ্রমনীতি এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহের দর কষাকষির কারণে তার আগের ধার এখন আর তেমনটা অনুভূত হয় না।

স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায়ে হরতালকে একটি 'গরিবের বিলাসিতা' ছাড়া আর কোনো ভাবেই বিবেচনা করা যায় না। কারণ হরতাল দিয়ে আজকের যুগে কোনো নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এটা জেনেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন বিভিন্ন সময় হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে, তখন এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়ায়। এতে জনজীবন বিঘ্নিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কল-কারখানার উৎপাদন এবং উন্নয়নের অব্যাহত ধারা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহায় শহর-নগরের খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠি। তাছাড়া, ছাত্র সমাজ পিছিয়ে পড়ে বিভিন্নভাবে এবং বিপর্যস্ত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এ হরতাল যদি রাজনৈতিকভাবে বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়ার পথ কিছুটাও প্রশস্ত করতো, তা হলে না হয় একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু তা নয়। এতে বরং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হিসেবে বর্তমানে প্রতিদিন ক্ষয়-ক্ষতি হয় ৩৬০ কোটি টাকার উপরে। এ অবস্থায় এটিকে একটি আত্মঘাতিমূলক কিংবা জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ ছাড়া আর কি বলা যায়। কথায় কথায় অহেতুক হরতাল ডেকে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা হয়। যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই, সেখানে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আসবে কোন ভরসায়। তাছাড়া এতে দেশীয় অর্থনীতিকেও ধ্বংস করা হয়।

এখানে কিছু ভীতিজনক তথ্য তুলে ধরা আবশ্যক মনে করি। ২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪৭ দিন হরতাল পালিত হয়েছে। এতে উপর্যুক্ত হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে ১৬,৯২০ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পর গত ৩৩ বছরে এদেশে সর্বমোট হরতাল ডাকা হয়েছে ১২৪২ দিন। সে হিসেবে ৩৩ বছরের মধ্যে এ দেশে প্রায় সাড়ে তিন বছর হরতাল পালিত হয়েছে। এতে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম, যারা হরতালকে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের কোনো ব্যর্থতা থাকলে সংসদে গিয়ে তার সমালোচনা করা বিরোধী দলের কর্তব্য। তাছাড়া, সংসদের বাইরে কিংবা ভেতরে তারা সরকারের পদত্যাগও দাবী করতে পারেন। এটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অংশ। কিন্তু হরতালে হরতালে দেশ অচল করে দেয়া হবে– এমন কোনো হুমকি একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের কাছে আশা করা যায় না। এটি কাঙ্খিত নয়।

গত হরতাল পরবর্তী এক সভা থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ জলিল এ ধরনের একটি হুমকি দিয়েছেন। এ ধরনের একটি ধ্বংসাত্মক অর্থাৎ দেশ অচল করে দেয়ার হুমকিতে শেষ পর্যন্ত কে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? সম্ভবত এত কিছু চিন্তা করে তিনি কথাটি বলেননি। তবে প্রকাশ্যে এ ধরনের হুমকি দেয়ার আগে অবশ্যই তার চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ছিল। কারণ হরতালে দেশ অচল হলে সরকারের কতটুকু ক্ষতি হবে? ক্ষতি যদি কারও হয়, সেটা হবে এ দেশের মানুষের। ২১ আগস্ট এবং ২৭ জানুয়ারীর গ্রেনেড হামলাসহ বোমাবাজি ও মানুষ হত্যার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পদত্যাগ দাবী করেছে। এ পদত্যাগের দাবী এবং উপর্যুক্ত ঘটনার তদন্ত দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে হত্যা রহস্য উদঘাটিত হবে না। হত্যা রহস্য উদঘাটন

www.pathagar.com

এবং দোষীদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধানের জন্য শক্তিশালী তদন্ত আবশ্যক। তাছাড়া হারতাল দিয়ে তদন্তের কোনো সুরাহা হবে না। তাহলে এ অবস্থায় হরতাল দিয়ে স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত করে এবং দেশের ক্ষতি সাধন করে বিরোধী দলসমূহের লাভ কতটুকু ?

বর্তমানে দেশে একটি নির্বাচিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সংসদে এদেরকে অনাস্থা দিয়ে ভোটে পরাজিত করার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নেই। তাছাড়া জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের ভাষায় সরকার পতনের মতো জনসমর্থনও তাদের নেই। একথা যে কোন বাস্তববাদী মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য। গত প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও অতি বর্ষণের ফলে দেশের আমন ফসল বেশ কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে। তাতেও চালের দাম বাড়ার কথা নয়। তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে কিছুটা যে বাড়েনি তা নয়। সম্প্রতি দেশে খোলা বাজারে চাল বিক্রি শুরু হয়েছে। শহর-নগরের কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া চালের কিছুটা দাম বৃদ্ধির কারণে দেশব্যাপী আপামর জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন ক্ষোভ নেই। কারণ বাস্তব অবস্থাটা তাদের জানা আছে। কয়েক টাকা চালের মূল্য বৃদ্ধিতে তারা যতটা না অখুশী, তার চেয়ে অনেক বেশি সন্তুষ্ট যে দেশে চাঁদাবাজি, রাহাজানি, মাস্তানী, খুন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বহুলাংশে কমেছে। এখন তারা শান্তি-স্বস্তিতে আছে। বাড়ী–ঘরে নিরাপদে ঘুমাতে পারছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে বেচা-কেনা চালিয়ে যেতে পারছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা এখন জনগণই সর্বত্র বলা শুরু করছে। এর মাঝে ২১ আগস্ট ও ২৭ জানুয়ারীতে যা ঘটেছে, তা এ ক্ষেত্রে দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এ ঘটনা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে। এগুলো দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছে। এর সাথে দেশী-বিদেশী শক্তির যে হাত রয়েছে তাও উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ।

তদন্তের কাজ চলছে, তবে এখনও ধরা পড়েনি কেউ। এটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ রয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ চায় অতি দ্রুত এ গ্রেনেড ও বোমা হামলা রহস্য উদঘাটিত হোক। দেশ ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাক। দেশের উন্নতি হোক এবং সমৃদ্ধ হোক দেশ। গ্রেনেড হামলার ঘটনা নিয়ে যারা হরতালে হরতালে দেশকে অচল করে দিতে চায় তাদের সাথে দেশের মানুষ একমত নয়। সুতরাং জোর করে ওপর থেকে এগুলো জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। কোনো অবস্থাতেই এ দেশের মানুষ অর্থাৎ উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী মহল, সাধারণ মেহনতী জনতা কিংবা ছাত্র সমাজ এখন আর দাবী আদায়ের হাতিয়ার বা সেকেলে কৌশল হিসেবে হরতালকে মেনে নিতে রাজি নয়। ব্যবসায়ী মহল কিংবা শিল্প-কারখানার মালিকরা হরতালের বিরুদ্ধে এরমধ্যেই সোচ্চার

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছেন। কারও অযৌক্তিক রাজনৈতিক স্বার্থে তারা কেন হরতালের দুর্ভোগ পোহাবে? কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ। আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা, অর্থাৎ সংসদ সদস্য ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার মন্তব্য অনুযায়ী প্রতি দিনের হরতালে বাংলাদেশের দৈনিক ক্ষতি হয় ৩৮৬ কোটি টাকা। এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কি বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে পোষাণো সম্ভব? সে কারণেই আজ সর্বত্র দাবী উঠেছে আইন করে হরতাল নিষিদ্ধ করার জন্য। গত কয়েকদিন যাবত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তাদের বক্তব্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন মহলের চাপের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

দেশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল এজেন্ডার (সিএনএ) একটি প্রতিনিধি দল গত ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হরতাল বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের আহবান জানিয়েছেন। তারা হরতালকে জাতীয় স্বার্থ ও দেশের অর্থনীতির পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, দেশের জনগণ হরতালের বিপক্ষে। তাছাড়া হরতাল ডাকলেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেড়ে যায় এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় কারও রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্য দেশে কথায় কথায় হরতাল দেয়া যাবে না বলে সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া তারা আরও অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান ব্যবস্থায় অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের কোথাও আর হরতালের অস্তিত্ব নেই। এমনকি প্রতিবেশি পশ্চিমবঙ্গেও হরতাল নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আমাদের অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ বাংলাদেশকে হরতাল, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশে যাতে নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হয় তার বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিয়েছে তারা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংকসহ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন সহযোগিরা হরতাল, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস বলেছেন, 'আমি আশা করি বাংলাদেশ কখনো ভীতিকর শক্তির ক্ষমতা গ্রহণ মেনে নেবে না।' তিনি বলেছেন, 'হরতালের বিরুদ্ধে আমি আগেও বলেছি।' হ্যারি কে টমাস আরও বলেছেন যে, 'সকলকেই এ দেশের ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে। অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। হরতাল অর্থনীতির ক্ষতি করে। কে ডাকলো সেটি কোনো বিষয় নয়।' রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি ন্যায় সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত টমাস বলেছেন, 'এ দেশে আমেরিকার প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে। আমরা বাংলাদেশী পোশাক শিল্পকে উৎসাহিত করি। সিনেট ও কংগ্রেস এ ব্যাপারে একটি বিল পাস করাতে লবিস্ট কাজ করছে। এ অবস্থায় তাদের

www.pathagar.com

আস্থা অর্জন করতে হলে চাই হরতাল, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের অবসান। নতুবা বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে।'

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী লিয়ন ব্লাম বলেছেন, 'একজন মুক্ত মানুষ তিনিই, যিনি তার চিন্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে ভয় পান না।' গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত এবং নিঃসংশয় করতে হলে সর্ব প্রথম আমাদেরকে কাটিয়ে উঠতে হবে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। এ অভিমত চিন্তাশীল মহলের। এ দেশে রাজনীতির নতুন প্রেক্ষিত রচনা করতে হবে। সংবিধানকে করতে হবে অর্থবহ। নতুবা সব কিছুই প্রহসনে পরিণত হবে। সে কারণেই দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুফল এ দেশের মানুষ ভোগ করতে পারবে। হরতাল ও নৈরাজ্য যদি জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই আইন করে এগুলো বন্ধ করতে হবে। জনগণের স্বার্থেই তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার দিতে হবে। নতুবা কারো ভয়ে কিংবা অহেতুক সমালোচনার আশংকায় দেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টেকানো যাবে না। রাজনীতির নামে, অধিকারের নামে এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের নামে যারা অনাধিকার চর্চা করে, উচ্ছৃংখল ও অরাজনৈতিক কার্যকলাপে মানুষকে উস্কানী দেয় এবং নিজেদের খেয়াল খুশীতে অপরিণামদর্শী ও ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়ায়, তাদেরকে রুখতে হবে জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই। এতে ক্ষমতাসীন জোটের শংকিত হবার কিছু আছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন না। প্রত্যেক পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থেই সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হয়। নতুবা জাতি এগোয় না। এর নামই নেতৃত্ব। যথাসময়ে এ নেতৃত্ব নিজের দূরদর্শিতার প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে, ব্যর্থতা জাতিকে কুরে কুরে খাবে। এসব ভেবেই বর্তমান জোট সরকারকে সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। বাস্তব সিদ্ধান্ত ; তা যত কঠিনই হোক, সরকারকে নিতেই হবে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে বিশ্বব্যাপী মানুষ বাস্তববাদী, সিদ্ধান্তে অটল ও শক্তিশালী সরকারকে ভালবাসে।

www.pathagar.com

শ্যাম সরণের অপব্যাখ্যা ও ভারতীয় মনোভাব

নয়া দিগন্ত, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

বড় দেশ বলে ভারতীয় নেতারা হয়তো পরস্পর বিরোধী অনেক কথাই অতি সহজে বলতে পারেন। সুবিধা-অসুবিধা যা-ই থেকে থাকুক ভারতের কারণে অতীতে সাত বারের মধ্যে ছ'বারই ৭-জাতি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পিছিয়ে গিয়েছিল। অথচ সে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম সরণ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে বলেছেন গত ২০ বছরেও সার্কের সদস্যরা একটিও প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেনি। সার্ক শুধু আলাপ-আলোচনার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। এ কথাটি ঠিক নয়। ভারতের সদিচ্ছা থাকলে সার্কের সবচেয়ে বড় দেশ হিসেবে এতো দিনে অনেক কিছুই করা সম্ভব হতো। সার্ক নিয়ে বাংলাদেশের মতো এতো উৎসাহ আর কারও ছিল না। গত দুই দশকের অধিকাংশ সময় মূলতঃ কাশ্মীর সমস্যা এবং পারমাণবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই ব্যস্ত ছিল ভারত ও পাকিস্তান। সে অবস্থায় সার্ক কোন দিন মোটেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে কেউ বিশ্বাস করেনি।

ভারতের 'সপ্তকন্যা' অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য কিংবা জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সৃষ্ট কোনো নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে ভারত এবারের ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন বর্জন করেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেপাল রাজার রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাংলাদেশের হবিগঞ্জে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়ার হত্যাকান্ড দু'টি দেশের দু'টি বিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়। এতে ভারতের অনিরাপদ বোধ করার কারণ কী ? শ্যাম সরণ বলেছেন, প্রতিবেশী দেশের মাটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ এবং ভারত বিরোধী তৎপরতা নিয়ে নাকি তারা চিন্তিত। যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে দ্বি-পাক্ষিক কূটনীতির ভিত্তিতে বিরাজিত সকল সমস্যা সমাধানে ভারতের এত চিন্তিত হওয়ার কারণ কী ? ভারত তো দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতেই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূর করতে পারে যাবতীয় ক্ষোভ ও অবিশ্বাস এবং নিরসন করতে পারে সকল উত্তেজনার। তা না করে সেদিন শ্যাম সরণ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো যদি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং ভারতের ক্ষমতাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে কাজ করে তাহলে তা বরদাশত করা হবে না। এটি কি একটি সরাসরি হুমকি নয়। এর সাথে আধিপত্যবাদী মনোভাবের ব্যবধান কতটুকু ? এ ধরনের মনোভাব নিয়ে বহুপাক্ষিক বা আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা তো দূরের কথা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও হয়তো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

শ্যাম সরণ আরও বলেছেন, সকল প্রতিবেশী দেশকে নিয়ে নাকি আঞ্চলিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চায় ভারত। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকেও ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা বুঝতে হবে, বলেছেন ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো ভারতের আঞ্চলিক উন্নয়নের পথে বাধা হলো কে ? কারা ভারত আক্রমন কিংবা তাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায় ? এক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে ভারতের একটি

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার চিত্র ফুটে ওঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং অরুনাচল কিংবা জম্মু ও কাশ্মীরসহ বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা অথবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংঘাত ভারতকেই সমাধান করতে হবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য তো তার প্রতিবেশীরা কোন মতেই দায়ী হতে পারে না। ভারত স্বাধীন হয়েছে এখন থেকে ৫৮ বছর আগে অথচ গত প্রায় ছ'দশকেও ভারত তার অখন্ডতাকে নিশ্চিত ও নিঃসংশয় করতে পারেনি। তার পরেও বৃহৎ দেশ ভারত, কৃষি শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি। যে ভারতের পক্ষে এত কিছু সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে কি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় ? তার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে এবং প্রতিবেশীদের সাথে আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন ছিল, ভারত সরকার কী গত ৫৮ বছরে সে ব্যাপারে আন্ত রিকভাবে কোনো প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ নিয়েছে ? ভারত বরং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা জারি করে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে সে সমস্ত অঞ্চলের দাবি-দাওয়া এবং সমস্যাকে।

শ্যাম সরণ বলেছেন, ভারতকে বিপদের লক্ষণ হিসেবে নয়, বাণিজ্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে সকলের দেখা উচিত। এর জন্য ভারত প্রতিবেশী দেশসমূহের উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করতে নাকি প্রস্তাব করেছে। শ্যাম সরণের এ উক্তির সাথে অনেকেই একমত হতে পারবে না। কারণ ভারতের সাথে বাংলাদেশের পর্বত প্রমাণ বাণিজ্য ঘাটতি থাকার কারণে বাংলাদেশ গত প্রায় এক দশক যাবত ভারতকে বার বার অনুরোধ করেছে বাংলাদেশের ২৫টি ক্যাটাগরির কতগুলো পণ্যসামগ্রীকে ভারতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে। বিরাজমান বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমিয়ে এনে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে ভারত এ পর্যন্ত কোন অবদানই রাখেনি। বাংলাদেশকে যেখানে ক্ষেত্র বিশেষে ইউরোপ, নর্থ আমেরিকার কানাডা এবং এমন কি এশিয়ার থাইল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশ শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে সেখানে ভারত শুধু বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখারই চেষ্টা করেছে। তারা আন্তরিকভাবে কোনো সহযোগিতা করেনি। তাছাড়া তারা সারাক্ষণ বাংলাদেশের পেছনে লেগে আছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট আদায়

www.pathagar.com

এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার লক্ষ্যে। এতে কি বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না ? ভারত কথায় কথায় অভিযোগ করে যে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাটি রয়েছে। কিন্তু কোথায় ? ভারত সেগুলো শনাক্ত করতে পারে না। মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তারা চিহ্নিত করে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের ঘাটি হিসেবে। এ সমস্ত কারণে এ দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের মাঝে ভারত বিদ্বেষ যে ক্রমশ দানা বাধছে না একথা বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ভারত যতই হুমকি-ধামকি দিক তাতে মানুষের মনোভাব বদলাবে বলে মনে হয় না। কারণ এ ব্যাপারে চাই বৃহত্তর সমঝোতা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা।

ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন হলো না বলে উত্তেজিত হয়ে বিবৃতি দেয়া কিংবা বৈরী প্রচার বন্ধ করে আমাদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশ তৈরী করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন শ্যাম সরণ। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিবেশী দেশকে সাহায্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে ভারত। তার এ বক্তব্যে বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী মহলের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভারতের এ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ অতীতে কখনও দেখেনি এ অঞ্চলের কেউ। তাদের ধারণা ভারতের আধিপত্যবাদী এবং আগ্রাসী মনোভাবের কারণেই সার্ক এগুতে পারেনি। ভারত চায় না এ অঞ্চলের দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে সয়ম্ভর হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ এবং অগ্রগতি সাধন করুক। তারা চায় এগুলো ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে চিরদিন নতজানু হয়ে থাকুক। অথচ শ্যাম সরণ অভিযোগ করেছেন যে, ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেও প্রতিবেশীদের তরফ থেকে নাকি কোন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে পাল্টা প্রশ্ন ওঠেছে যে, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের এ দুরবস্থা কেন ? কেন সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিবেশ? ভারতকেই এর সুরাহা করতে হবে।

সেদিন এ সমস্ত প্রশ্নের কিছুটা জবাব দিয়েছেন ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদ্বীপ নায়ার। অন্যান্য বিষয়ের মাঝে তিনি প্রথমেই ভারতের সমালোচনা করেছেন, ঢাকায় ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলন বর্জন করার জন্য। তিনি বলেছেন, সার্ক সম্মেলনে যোগদানে ভারতের অক্ষমতা প্রকাশ ছিল নয়াদিল্লীর সবচেয়ে অপরিপক্ক কাজ। বর্ষীয়ান ভারতীয় কলামিস্ট বলেছেন, আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমরা এখনও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে একটি 'ওয়ার্কিং রিলেসন্স' গড়ে তুলতে পারিনি। তিনি বলেন, ভারতে কদাচিৎ বাংলাদেশের উল্লেখ করা হয় এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যমেও বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় না। সার্ক সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে অপারগতার কথা কী কারণে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং টেলিফোন তুলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করতে পারলেন না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের এক সময়ের কূটনীতিক কুলদ্বীপ নায়ার। তিনি বলেন, তাতে কি কূটনৈতিক রীতিনীতি লংঘন করা হতো। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, খালেদা জিয়া পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত বাংলাদেশের প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিয়েছে। ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী শক্তি সম্পর্কে

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত যত কথা বলেছে, উদার ও গণতন্ত্রীদের সম্পর্কে তার তুলনায় কোনো কথাই বলেনি।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ভারতের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সাবেক জোট সরকারের মতো ধর্মান্ধ কিংবা সাম্প্রদায়িক নয়। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশে একটি চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। তারপরও বিভিন্ন পর্যায়ে এ দেশটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তের কোনো শেষ নেই। বর্তমান এ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে ভারতকে বরং সর্বাগ্রে তার 'রুদ্ধদুয়ার' মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। নতুবা তার 'নিরাপত্তার সঙ্কট' কোন দিনও কাটবে না। প্রতিবেশীদের ওপর খুব বেশি খবরদারী কিংবা আধিপত্য খাটাতে গেলে ভারত বরং প্রতিবেশীদের আরও বেশি বৈরী করে তুলবে। এতে তার বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ্যগুলো আরও সাহস সঞ্চয় করতে পারে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ কিংবা খড়্গহস্ত না হয়ে ভারতের বরং উচিত তার নিজের ঘর আগে ঠিক করা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'সাত কন্যা' এবং কাশ্মীর সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান করা। নতুবা এ বিশ্বায়নের যুগে সমগ্র দুনিয়া যখন একে একে তাদের সমস্ত দুয়ার খুলে দিচ্ছে তখন ভারত একে একে তার সমস্ত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। নির্যাতন, নিষ্পেষন, অপশাসন ও শোষণের মাধ্যমে এ যুগে কোন মুক্তিকামী জনগোষ্ঠীকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং স্বাধিকার ও মানবাধিকার অর্জন এখন এ যুগের দাবি। এগুলো বাদ দিয়ে 'মুক্ত বিশ্বের' ধ্যান-ধারণা মোটেও কাজ করতে পারে না। সুতরাং বিশ্বের সকল জাতিরই এখন প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল অবলম্বন করা। অতীতের সামন্তবাদী, উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী কিংবা আধিপত্যবাদী মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এখন কোন অগ্রগতি সাধন করা যাবে না।

ভারত সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসম্যান এডল্‌ফাস টাউনস্-এর একটি সাম্প্রতিক উক্তি দিয়ে আজকের লেখা শেষ করতে চাই। কংগ্রেসম্যান টাউনস্ অভিযোগ করে বলেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেকের স্বাধীনতার গ্যারান্টি এবং পূর্ণ মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও স্বাধীন ভারতে ৫৮ বছর যাবত কার্যত এটি (সংবিধান) সেভাবে কাজ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের তকমা আঁটা ভারত তার মুসলমান, শিখ ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের চরমভাবে নির্যাতন করে যাচ্ছে। তিনি তার কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এ পর্যন্ত কত লাখ সংখ্যালঘু হত্যা করা হয়েছে তার একটি ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, এ ধরনের রেকর্ড নিয়ে ভারত প্রতিবেশীদের বৈরি আচরণ রোধ করতে প্রয়োজনে যে কোনো ব্যবস্থা নেবে বলে যে হুমকি দিয়েছে তা কি খুবই অস্বাভাবিক? এ ধরনের মনোভাব নিয়ে তাদের আঞ্চলিক সহযোগিতা কতটুকু সম্ভব? তাই এখন সর্বাগ্রে চাই তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

www.pathagar.com

সার্ক সম্মেলন, বিরোধী দলীয় আন্দোলন ও অবরোধের ওকালতি

নয়া দিগন্ত, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি ভারতই হয়তো ভালো বুঝবে, আমরা বুঝি না। তবে একথা অনেকটা জোর দিয়েই বলা যায় যে, এ মুহূর্তে কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথেই ভারতের তেমন মধুর সম্পর্ক নেই। সেজন্য বড় রাষ্ট্র হিসেবে অনেকে ভারতকেই দায়ী করেন। জনসংখ্যা, আয়তন এবং এমনকি সামরিক শক্তির দিক থেকেও ভারত অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ দেশ এবং বৃহৎ শক্তি। বহিঃবাণিজ্য এবং সামরিক শক্তির দিক থেকে অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও গণচীনের সাথে চলছে ভারতের নীরব প্রতিযোগিতা। এ খেলায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কথা বাদ দিলেও বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বর্তমান আঞ্চলিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা নিয়ে।

নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং বাংলাদেশে কিবরিয়া হত্যার ছুঁতো ধরে ভারত একদম শেষ মুহূর্তে ঢাকায় প্রস্তাবিত সার্ক সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে তার অপারগতার কথা জানিয়েছে। এ বিষয়টিকে শুধু বাংলাদেশ নয়, সার্কের কোনো সদস্য রাষ্ট্রই সহজভাবে নিতে পারেনি। না পারার অসংখ্য কারণ রয়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং এমনকি নেপালও এ ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছে। নেপালে যা ঘটেছে সেটা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সার্ক সম্মেলনের অব্যবহিত আগে নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র সেখানকার ক্ষমতাসীন সরকার ভেঙ্গে দিয়ে জরুরীভাবে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান পাকিস্তান এবং বর্তমান সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাণীকে নিয়ে যথাসময়ে সম্মেলনে যোগ দেবেন। অপরদিকে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জে কিবরিয়া হত্যার পর বাংলাদেশ সরকারও যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বের করার যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এটাও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এমন ঘটনা শুধু ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যেই নয়, খোদ দিল্লীতেও যে কোন সময় ঘটতে পারে। কারণ দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় একথা বলা যাবে না। পাকিস্তানের আফগান সীমান্তেও যে কোন সময় গোলযোগপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এ পরিস্থিতি নিয়েই আজকের দক্ষিণ এশিয়া এগিয়ে চলছে। তাছাড়া শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও সন্ত্রাস-নৈরাজ্য থেকে আজ আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তা হলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে সার্ক সম্মেলন নিয়ে দিল্লীর এই বিশেষ আশংকা ও উদ্বেগের প্রকৃত কারণ কি ছিল?

www.pathagar.com

কথায় বলে সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়? মধ্যপ্রাচ্য কিংবা মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক ও গণ অসন্তোষ, মুক্তি সংগ্রাম ও সন্ত্রাস- নতুন নয়। এ অঞ্চলে গায়ের জোরে কোনো কোনো দেশ সে অসন্তোষকে চাপা দিয়ে রেখেছে নতুবা সেখানে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস, হামলা এবং পাল্টা হামলা ভয়াবহ রূপ নিতে পারতো। ভারত এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারি করে অতীতে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশে কোথাও জরুরী অবস্থা নেই তবুও সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে গেল। তাই এটি শুধু বাংলাদেশীদের জন্যই নয়, সার্কভুক্ত সকল দেশের নাগরিকদেরই মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বর্ধিত উন্নয়ন ও উৎপাদনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ১৫০ কোটি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই একদিন সার্ক গঠন করা হয়েছিল। এটি বিবাদমান কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সাতটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছে। দুঃখ-দারিদ্র্য, সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা দূর করে এ অঞ্চলে একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তোলাই ছিল সার্কের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সার্ক গঠিত হওয়ার গত দুই দশকেও এক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে অনেকে ভারতকে দায়ী করেন। অভিযোগ করেন যে, ভারতের কূট-কৌশলের কারণেই বার বার সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানের সদস্যদের মাঝে হাজারও দ্বিপাক্ষিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তারা আঞ্চলিকভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু সার্ক এগুচ্ছে না ভারতের কারণে, এ অভিযোগ এখন বিভিন্ন মহলের।

বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী দৈনিক, 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' গত সপ্তাহে সার্কের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনে শেষ মুহূর্তে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ভারতের সমালোচনা করেছে। ৭-জাতি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ার জন্য ভারতকে দায়ী করা হয়। এক রিপোর্টে ট্রিবিউন বলেছে, একটি অনাকাঙ্খিত সময়ে এশীয় সম্মেলন স্থগিত হয়ে গেলো। বিশেষ করে যে মুহূর্তে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কোন্নয়নে অগ্রগতি হচ্ছিল। তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, সার্ক সত্যিই এগুচ্ছে না ভারতের কারণে। ভারত বিভিন্ন অজুহাতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিংবা তা জিঁইয়ে রেখে প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশগুলোকে তার ওপর নির্ভরশীল ও নতজানু করে রাখতে চায়। এ ধারণা আজ সার্কের সদস্যভুক্ত দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গণচীনসহ বিশ্বের বড় বড় সকল দেশই চায় সার্কের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা আসুক এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হোক। দূর হোক ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং পশ্চাদপদতা। সঙ্গত কারণেই তারাও এখন সন্ধান করছে ভারতের শাসক গোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্যটি। আয়তন, লোক সংখ্যা এবং সামরিক শক্তিতে বৃহৎ ভারত যে আধিপত্যবাদী মনোভাব

www.pathagar.com

নিয়ে প্রতিবেশীদের বিচ্ছিন্ন ও অস্থির করে তোলার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে তা ভারতের জন্য কোনভাবেই সুফল বয়ে আনতে পারে না বলে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা।

বিশ্বের একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের মতো কোনো অবস্থাতেই ভারত যেন নিরাপত্তা বোধ করে না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিবেশীদের মাঝে সৃষ্টি করে রাখে অস্থিরতা। ভারতের ব্যাপারে নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন হাজারও অভিযোগ। এ অবস্থায় সার্ক দেখিয়েছিল কিছুটা আশার আলো, জনমনে সৃষ্টি করেছিল কিছুটা প্রত্যাশা। কিন্তু ভারত তার একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বারবার তা দূরে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। আরও আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন এবং প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারত জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ্য নিয়ে কোনদিনই নিরাপদ বোধ করতে পারবে না। প্রতিবেশীদের মাঝে সন্ত্রাস এবং অস্থিরতা চলতে থাকলে ভারত কোনমতেই স্বস্তি বোধ করতে পারবে না। ভারতের প্রতিবেশীদের মাঝে সন্ত্রাসসহ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যতই অবনতি ঘটবে ততই বৃদ্ধি পাবে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা, যা একদিন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, তাদের মাঝে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশীল সমাজের উদ্ভব ভারতে জন্য অনেক বেশি কাম্য হওয়া উচিত বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে। তাছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভারতের অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। তাতে দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের জীবিকার সন্ধানে ভারতে ভীড় জমানোর সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া কমে আসবে চোরাচালান কিংবা অবৈধ বাণিজ্যের পরিমাণ। সার্ক অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে ভারত। এ কথা বলেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরাল। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের উচিত প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্যা মিটিয়ে ফেলা এবং বাণিজ্য ঘাটতিসহ বিভিন্ন ব্যবধান ঘুচিয়ে আনতে প্রতিবেশীদের যথাসম্ভব সাহায্য করা। কিন্তু ভারতের শাসক গোষ্ঠী এসব কথা অতীতে কোনদিনই শুনেনি। ভবিষ্যতে কি হবে জানি না।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে সম্প্রতি কিছু বাংলাদেশী ভারতের কলকাতা গিয়েছেন। তাদের মাঝে কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী ও মুনতাসীর মামুন অন্যতম। তারা কলকাতার বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধী ভবনে সভা করেছেন কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের একটি অংশের উপস্থিতিতে। শোনা গেছে, সেখানে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর সাবেক অতিরিক্ত সচিব বিভূতি নন্দীও উপস্থিত ছিলেন। গাফফার চৌধুরী এবং মুনতাসীর মামুন নাকি সেখানে ওকালতি করেছেন যে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত চুপ করে বসে থাকলে ভুল করবে। বাংলাদেশের 'জঙ্গিপনা' ঠেকাতে ভারতের নাকি অবিলম্বে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা উচিত। সাতদিন ভারতের সীমানা সিল করে রাখলে নাকি বাংলাদেশের অবস্থা করুণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কথাগুলো তারা বলেছেন ১ ফেব্রুয়ারী। এর আগে গত ২৭ জানুয়ারী হবিগঞ্জে এক গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া নিহত হয়েছেন। প্রতিবাদে হরতাল ডেকেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। ৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। শেখ হাসিনা হুমকি দিলেন, ঢাকায় বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের জীবনের নিরাপত্তা দেবে কে? একথা শুনেই কি-না জানিনা নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে সার্ক সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। এতে বুঝা গেল না তিনি কার কাছে তার নিরাপত্তা আশা করেছিলেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস থেকে দিল্লীতে যে সমস্ত তথ্য পাঠানো হয় তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য অনেক সময় বুঝে ওঠতে পারি না। কারণ বাংলাদেশ সরকার যেখানে বলেছে যে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সেখানে বিরোধী দলীয় নেত্রীর কথা কিংবা দু'একটি পটকার আওয়াজে যদি ভারতীয় নেতারা কাপড় নষ্ট করে ফেলেন তা হলে তারা এতবড় ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন কীভাবে? সুতরাং সঙ্গত কারণেই এখানে ওঠেছে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। এ অভিযোগ নানা রকম গুজবের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে এখন বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিলাত-আমেরিকায়।

এবার আসা যাক গাফফার-মুনতাসীরের অর্থনৈতিক অবরোধের প্রশ্নে। তারা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন, সীমান্ত সিল করে দিতে। গাফফার-মুনতাসীর সাহেবরা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের খবর রাখেন বলে মনে হয় না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পর্বত প্রমাণ। প্রতি বছর বৈধ এবং অবৈধ পথে প্রায় ৩৬০০০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য সামগ্রী আসে বাংলাদেশে। অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে যায় মাত্র ৯০০ কোটি টাকার মালামাল। বাংলাদেশ ভারতের পঞ্চম বৃহৎ আমদানিকারক। গাফফার-মুনতাসীর সাহেবদের ভারতের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কথাবার্তার কারণে সরকার যে তাদেরকেই এখনো কেন অবরোধ করেনি, সেটাই বরং ভেবে দেখার বিষয়। প্রায় ১৫ কোটি মানুষের এক বিরাট বাজার বাংলাদেশ। এ বাজার বাংলাদেশের প্রাচ্যমুখী অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে একদিন এমনিতেই চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের দিকে ক্রমশ ছড়াবে। তখন এ বাজার ধরে রাখাই হবে ভারতীয় কূটনীতির একটি অন্যতম সাফল্য। কিন্তু অতীতের ঘৃণে ধরা যে 'মাইন্ডসেট' নিয়ে ভারত প্রতিবেশীদের সাথে কূটনীতি চালাচ্ছে তা একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতি কিংবা বিশ্বায়নের যুগে অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে। দেশীয় এবং আন্ত

www.pathagar.com

র্জাতিক কোনো শক্তি এখন বাংলাদেশের উপকার না করুক, যদি বিরুদ্ধাচারণ না করে তাহলে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তার আমদানি-রফতানির ব্যাপারে। এক্ষেত্রে ভারত কী ধরনের অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে? বাংলাদেশ এখন আর সাহায্য চায় না, চায় বাণিজ্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কিংবা তার কট্টরপন্থী সমর্থকদের অনেক অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু অগণতান্ত্রিকভাবে একটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে তারা যে সমস্ত কথা বলেন তা আসলে শেষ পর্যন্ত এ দেশ এবং তার জনগণের বিরুদ্ধেই যায়। এটি একটি গণবিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজ। এটি কোন দেশপ্রেমিকের কাজ নয়। এ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে দেশে এসে বলুন। বিদেশের মাটিতে বসে কেন? এটি একটি অসুস্থ মানসিকতা এবং বেঈমানের কাজ। ২১ আগস্ট এবং ২৭ জানুয়ারির গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশের সকল মানুষই উদ্বিগ্ন। এ দেশের সকল মানুষ এ হামলার রহস্য উদঘাটনে আগ্রহী। সম্ভব হলে এসে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন। ভারতের কাছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ওকালতির পরিবর্তে দেশে নাশকতামূলক কার্যকলাপ কীভাবে বন্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সাহায্য চাইতে পারেন। এতে ভারত নিজেও উপকৃত হবে।

www.pathagar.com

রাজনীতি এখন বিচারকের কাঠগড়ায়

নয়া দিগন্ত, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

একথা ভেবে দুঃখ হয় যে, স্বাধীনতার গত ৩৩ বছরেও এদেশের রাজনীতি কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে মুক্তি পেল না। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের রাহুগ্রাস কাটিয়ে গণতন্ত্র পেল না অবাধ স্রোতের গতিধারা। আপামর মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠার নিরন্তর প্রচেষ্টা বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর খেয়াল-খুশি এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বেড়াজালে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখনই উন্নয়ন বা অগ্রগতির কিছুটা সুবাতাস বইতে শুরু করে, জনগণ যখনই কিছুটা সুদিনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে, ঠিক তখনই এদেশের ওপর নেমে আসে একটা না একটা পরিকল্পিত আঘাত। কখনও তা ইস্যুহীন গণআন্দোলনের নামে, কখনও সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বাতাবরণে নতুবা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী অপপ্রচার ও চক্রান্তের কারণে। এদের হাতে সাধারণ মানুষের ভাগ্য এবং দেশের ভবিষ্যত যেন জিম্মি হয়ে আছে। রাজনীতির নামে কারো কারো কায়েমী স্বার্থ, আধিপত্য ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব দেখলে মনে হয় এদেশটা যেন তাদের জমিদারী আর এর বাসিন্দারা হুকুম বরদার। এ অধিকার, মনোবৃত্তি এবং ধ্যান-ধারণা তারা কোথায় পেল? রাজনীতি ও গণতন্ত্র– এ দু'টি শব্দের অর্থ যদি কারও কাছে ব্যবসায়িক লাইসেন্সের মতো বুঝায়, তাহলে সে লাইসেন্স বাতিল করার সময় বোধ হয় এসে গেছে। নতুবা এদেশের কোন ভবিষ্যত দেখা যাচ্ছে না।

ষড়যন্ত্র যদি এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের একটি হাতিয়ার বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে না গণতন্ত্র, না আজকের বাংলাদেশের অসুস্থ রাজনীতির ন্যূনতম তরক্কির কোন সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় দুঃখ হয় এদেশের একজন কৃতি সন্তান, শাহ এএমএস কিবরিয়ার জন্য, তার মৃত্যুটা বোধ হয় ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো কাজে আসলো না। মাঝখান থেকে রাজনীতিতে এসে তার মতো একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন মানুষকে চক্রান্তের শিকার হতে হলো। আমাদের মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন, 'আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, আল্লাহও কৌশল করিয়াছিলেন। আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' (আলে-ইমরান, ৫৪)। এখানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, নেহাত রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য যারা দেশ এবং জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তা শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না। অর্থাৎ কারও ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত কিংবা এমনকি দলগত স্বার্থ কিংবা সুযোগ-সুবিধার জন্য আল্লাহপাক একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্ষতি হতে দিতে পারেন না। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেম হচ্ছে আমাদের ঈমানের অঙ্গ। সেখানে দেশের বিরুদ্ধে, তার জনসাধারণের বিপক্ষে যারা নেহাত ক্ষমতার জন্য ষড়যন্ত্র পাকায়, নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এবং ফ্যাসাদ বাধায়, তাদের কোন কিছুই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তারাই হবে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

www.pathagar.com

সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট কূটনীতিক কিবরিয়া সাহেবের হত্যাকান্ড বাংলাদেশের জনমনে হাজারো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আমাদের রাজনীতিকে দাঁড় করিয়েছে নতুন করে এক বিচারকের কাঠগড়ায়। কেউ অভিযোগ করছে, সার্ক সম্মেলনকে বানচাল করার জন্যই নিরপরাধ কিবরিয়া সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে সে বিতর্কে যাব না। কারণ সার্ক সম্মেলন এমনিতেই পিছিয়ে গেছে। নেপালের ঘটনায় ভারত যে ভূমিকা নিয়েছে তাতে সার্ক সম্মেলন হয়তো সঙ্গতভাবেই পিছিয়ে যেতো। একটু ধৈর্য্য ধরলে কিবরিয়া সাহেবের অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক হত্যাকান্ডের সাথে আজ কেউ আর সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক খুঁজে দেখতো না। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী সচেতন জনগণের মাঝে একটি ধারণা জন্মে গেছে।

২১ আগস্ট এবং কিছুটা বিরতির পর ২৭ জানুয়ারির গ্রেনেড হামলা এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত পরিকল্পিত। এটা এখানেই শেষ হবে না। এ ঘটনা নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহল ইতোমধ্যে বহু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তবে দলমত নির্বিশেষে কিবরিয়া হত্যায় সবাই যে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যারা এ দুর্ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাদের কথা আলাদা। এখন দেশব্যাপী প্রশ্ন উঠেছে কারা এ ঘটনার জন্য দায়ী? কী তাদের উদ্দেশ্য? এটিই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে মূল আলোচ্য বিষয়। যারা এ দেশটাকে ভালবাসে, এ দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করতে আগ্রহী, এদেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বদ্ধপরিকর, তারা মনে করেন কোনভাবেই এ অবস্থাকে আর চলতে দেয়া যেতে পারে না। এ মুহূর্তে গ্রেনেড হামলা, বোমাবাজি, আন্দোলনের নামে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং হরতালসহ গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ আমাদের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সর্বনাশা প্রভাব ফেলবে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে কোন মতেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাতে শিল্পায়ন, উৎপাদন, রফতানি বাণিজ্য এবং উন্নয়নের গতি শুধু থেমেই যাবে না বরং যা অর্জিত হয়েছে তাও হারিয়ে যাবে ধারাবাহিকতার অভাবে। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সন্দিহান হয়ে পড়বে। পিছিয়ে যাবে তাদের নিজের নিরাপত্তা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজিত অনিশ্চয়তার প্রশ্নে। এতে হয়তো নির্দিষ্ট কোন দলের কতিপয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি নাও হতে পারে তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সারা জাতি এবং বাংলাদেশ।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী সূচিত হয়েছে নয়া দর্শন– বিশ্বায়নের তত্ত্ব ও বাজার অর্থনীতি। এটাকে আমরা কোনমতেই ঠেকাতে পারবো না। এতে যোগ দিয়েই নিজেদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথা বলতে হবে, আদায় করে নিতে হবে আমাদের স্বার্থ। নতুবা 'ডাবলিউটিও রেজিম', অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধানে ক্রমশঃ দখল হয়ে যাবে আমাদের বাজার। বিশ্বের শিল্পোন্নত ও উৎপাদনশীল দেশগুলোর পণ্য-সামগ্রীতে সয়লাব হয়ে যাবে আমাদের বাজার। অনৈক্যের কারণে,

www.pathagar.com

অস্থিতিশীলতার কারণে এবং সর্বোপরি বিনিয়োগ ও উৎপাদনের অভাবে এ প্রতিযোগিতায় অনতিক্রমনীয় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়বো আমরা। বাংলাদেশে তখন ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেটি কোনো বিবেচ্য বিষয় হবে না। তখন বাংলাদেশ চিহ্নিত হবে একটি অনুৎপাদনশীল, পিছিয়ে পড়া এবং হতদরিদ্র দেশ হিসেবে। সে অবস্থায় কোথায় হবে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থান? হতাশাগ্রস্ত বেকার জনসংখ্যার ক্ষোভ এবং আক্রমণের মুখে তখন ক্ষমতা ধরে রাখা কিংবা রাজনৈতিক ব্যবসা ধরে রাখা কারও জন্যই খুব লাভজনক হবে না। যারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দেশকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে এক চরম সংঘাত ও সংকটের দিকে তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে তাই আজ সঙ্গতভাবেই বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে গ্রেনেড হামলার তদন্ত নিয়ে। কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্বকে শুধু প্রশ্ন কিংবা বিতর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল আন্তরিকতা নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সাম্প্রতিক হামলার সকল রহস্য উদঘাটনের লক্ষ্যে। অপরাধী যে-ই হোক খুঁজে বের করতে হবে তাদের। এখানে জাতির বা দেশের স্বার্থের চেয়ে জাতীয় দুশমনের উদ্দেশ্য বড় হতে পারে না। সুতরাং শত ব্যর্থতার মাঝেও সকল পর্যায়ে গোয়েন্দা তৎপরতা কিংবা তদন্তকারীদের সম্ভাব্য সকল তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করার মতো মহৎ দেশপ্রেমিকের কাজ আর কিছুই নেই। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাত-শত্রুতার অপকৌশল বন্ধ করতে হবে। একটি নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা ব্যর্থ করার অপচেষ্টা রোধ করতে হবে। গণতন্ত্রে ষড়যন্ত্র কিংবা চক্রান্তের কোন স্থান নেই। যেটি আছে তা হলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের সামনে তার অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা। ভালো কাজের প্রশংসা করা এবং মন্দ কাজের নিন্দা করা। গায়ের জোরে কোনো নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করার চক্রান্তক না করে সকল অবস্থায় গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা হিতে বিপরীত হতে পারে। পাকিস্তানের দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকের রাজনীতির ইতিহাস থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা নেয়ার আছে। পাশাপাশি শ্রীলংকা এবং আজকের নেপালের পরিস্থিতিও বাংলাদেশকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়।

দেশীয় বিরোধী রাজনীতির পাশাপাশি ইদানিং একটি বিদেশী অপশক্তিও অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ ও তার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে কখনও সন্ত্রাসবাদের একটি সম্ভাব্য উৎসস্থল এবং মৌলবাদের ঘাঁটি বলে উল্লেখ করে যাচ্ছে। কখনও আবার নিজ থেকেই বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সারা বিশ্ব যখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করে তখনও সে মহলটি কীভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করা যায়, তার চেষ্টায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী এ ধরনের

www.pathagar.com

কার্যকলাপের পরিমাণ যেন ক্রমশ বেড়ে যায়। আর এবারতো ইসলাম-পছন্দ একাধিক দলের সাথে জোট বেধেছে বিএনপি, অতএব, সে মহলের বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্ত যে আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে সেটাতো বলাই বাহুল্য।

চূড়ান্ত কথা হচ্ছে বাংলাদেশ চলবে তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন কোন দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তেমনি কোন দলকে উৎখাতও করা যাবে না। সে মানুষগুলোকেই আজ সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত উৎঘাটন করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। দেশী-বিদেশী অপশক্তিকে রোধ করে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে তাদের অপচেষ্টাকে পরাস্ত করতে হবে। তাই এখন চাই সর্বস্তরের জনসাধারণের বৃহত্তর ঐকমত্য। কারণ এখনই দেশপ্রেমিকদের চূড়ান্ত যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়।

www.pathagar.com

দেশ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কবলে

আমার দেশ, ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া একটা সরকার কোন রাজনৈতিক কূট কৌশলেই তিনটি সমস্যাসঙ্কুল বছর পেরিয়ে চতুর্থ বর্ষে এসে নিজেরাই দেশটাকে অস্থিতিশীল করতে পারে না। তাহলে তার সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়া, সাফল্য, অর্জন এবং সর্বোপরি ধারাবাহিকতার পরিকল্পনা ম্লান হয়ে যাবে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির আলোকে ব্যাহত হবে তার সকল পদক্ষেপ ও কৌশল। এ অবস্থায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঘটে যাওয়া গত ২১ আগস্ট কিংবা ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জে সংঘটিত গ্রেনেড হামলার জন্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন সরকারের দিকে যতই অঙ্গুলী নির্দেশ করুক না কেন বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তথ্যাভিজ্ঞ মহলকে কিন্তু দৃষ্টি ফেরাতে হয় অন্যত্র।

এ কথা ঠিক যে, দেশে এখন গণআন্দোলন করার মতো রাজনৈতিক তেমন কোনো ইস্যু নেই। তাই ঘটনার তাৎপর্যে মনে হয় সাম্প্রতিক বোমা হামলার উদ্দেশ্য বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা নয় বরং সরকার ও বিরোধী দলকে একটি চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে দেশটিকে অস্থিতিশীল কিংবা পঙ্গু করে দেয়া। দেশপ্রেমিক বিরোধী দল, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের উচিত হবে এ বিষয়টির দিকে কিছুটা মনোনিবেশ করা বা দৃষ্টি দেয়া। কারণ চরম উস্কানিমূলক ঘটনাবলীর ফলে দেশ যদি একটা গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায় তাহলে সবাইকেই তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। ধারাবাহিক সংঘাত, সংঘর্ষ কিংবা সশস্ত্র সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত, পর্য্যুদস্ত এবং ভেঙ্গেপড়া দেশ শাসন কারও কাম্য হতে পারে না।

আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া একজন সাধারণ রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী মানুষ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিক। ঠিক এ সময়টিতে তার ওপর পরিকল্পিতভাবে আঘাত হেনে সকল মহলে বাংলাদেশ ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ ও গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে মরহুম কিবরিয়ার তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু ছিলনা, যারা কোন না কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করতে পারে। তার হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা সকল মহলের দৃষ্টি

www.pathagar.com

আকর্ষণ করার চক্রান্ত করেছে। বাংলাদেশের চলমান সকল গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে ওঠেপড়ে লেগেছে। তারা বাংলাদেশে একটি অসহনীয় অস্থিরতা সৃষ্টি করে এর অগ্রগতি রুখে দিতে চায়। জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সরকার যেমন বিরোধীসহ সকলের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তেমনি কোন সরকারের পক্ষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হবে না। তাছাড়া আইনের শাসন না থাকলে কোন দেশেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা একটি স্থিতিশীল পরিবেশ অর্জন করা সম্ভব নয়। সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানো ঘোলা জলে মাছ ধরার মতো। এ প্রক্রিয়া বরং পর্যায়ক্রমে আরও দুর্বিষহ অবস্থাই সৃষ্টি করবে। একটি স্থিতিশীল সমাজ কিংবা উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ে তুলতে মোটেও কাউকে সাহায্য করবে না। এতে সংবিধান বহির্ভূত শক্তিকেই বরং ক্ষমতার রাজনীতিতে নাক গলাতে উৎসাহ যোগাবে।

দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড, বিশেষ করে বিরোধী দলের গণজমায়েত কিংবা জনসভাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যেসব সশস্ত্র কর্মকান্ড শুরু হয়েছে তা থেকে সরকার ও বিরোধী দল সবারই শিক্ষা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। সরকার কিংবা নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থাকে সব ব্যাপারে দোষারূপ করার আগে নিজেদেরও কিছু কিছু ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা রাজনৈতিক সমাবেশ অথবা সভা সমিতিতে উপস্থিত জনসংখ্যার মাঝে দেখা যাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আধিক্য। তাছাড়া পুলিশ পাহারায় কোন গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। কিন্তু অবস্থা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে মনে হয় পূর্ব সরকারি অনুমতি, অনুসন্ধান, তল্লাশী এবং কঠোর পুলিশী নিরাপত্তা ছাড়া কোন সভা-সমাবেশই আয়োজন করা সম্ভব হবে না। এটি কারও কাম্য হতে পারে কিনা কিংবা কেউ মেনে নেবে কিনা জানি না। তবে দেশে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সভা-সমাবেশের পরিমাণ বেড়ে যাবে। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ণাঙ্গ পুলিশ পাহারায় সে সমস্ত সংখ্যাতীত সভা-সমাবেশের নিরাপত্তা বিধান করার মতো শক্তি কী বাংলাদেশের আছে? না কি তা সম্ভব? সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দল, সকলেরই একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা বা ঐকমত্যে আসতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় যে প্রশ্নটি জরুরিভাবে বিবেচ্য তা হচ্ছে, এ ধরনের গণবিরোধী কিংবা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কারা এ সর্বনাশা কার্যকলাপের জন্য দায়ী। কাদের হাত রয়েছে এ ধরনের মারাত্মক ঘটনার পেছনে। প্রয়োজন হলে দেশীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর পাশাপাশি অনুসন্ধান করে দেখতে

www.pathagar.com

হবে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনায় কোন বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে কিনা? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এখন থেকে কয়েক মাস আগে সিলেট সীমান্তে মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে ধরা পড়েছিল কয়েকজন বিদেশী নাগরিক। তাদের সাথে যোগাযোগ ছিল একটি স্থানীয় সন্ত্রাসী দলের। সীমান্তের ওপার থেকে এসে ধরা পড়া বিস্ফোরক দ্রব্যের খবর দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। এ ব্যাপারে পুরো দেশবাসীকেই হুঁশিয়ার হতে হবে। এবারের হামলায় যে গ্রেনেড ব্যবহার হয়েছে তা হচ্ছে আরজিএ ৭৪ কিংবা ৭৫। বলা হয়েছে, এগুলো বিদেশ থেকে আনা। দেশের এনএসআই, ডিজিএফআই, র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে তদন্ত করে দেখছে বিষয়টি। প্রধানমন্ত্রী যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য সম্ভব সকল ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও আওয়ামী লীগ এ ঘটনার জন্য সরকারকে দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবি করেছে তবুও বলা যায় সাক্ষী, প্রমাণ ও তদন্ত ছাড়া এ ধরনের দোষারোপ কোন দায়িত্বশীল কাজ নয়। এতে দ্বন্দ্ব ও ব্যবধান আরও বাড়বে। হরতাল এ সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারবে না। এতে জনগণ ও দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব বাদ দিয়ে আলোচনায় বসার আহবান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

দোকানপাট হামলা, গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ কিংবা হরতাল দিয়ে জনসভায় বোমা বা গ্রেনেড হামলা বন্ধ করা যাবে না। একথা দেশের একটি বৃহৎ দল হিসেবে অন্তত আওয়ামী লীগের ভালো করেই জানা আছে। এ গণবিরোধী মর্মান্তিক হামলা বন্ধ করতে হলে চাই একটি শক্তিশালী ঐকমত্য। দলমত নির্বিশেষে একটি বৃহত্তর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তা কীভাবে অর্জিত হতে পারে সেটিই এখন দেশের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় মানুষের শোকবার্তা ও বিবৃতি থেকে ফুটে ওঠেছে। এ কথাই প্রতিফলিত হয়েছে বিদেশী কূটনীতিক এবং বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বক্তব্যে। র‍্যাবের দক্ষ কর্মকান্ড এবং প্রতিরোধের মুখে দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিমাণ আশাতীতভাবে কমে এসেছে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে সচেতন জনসাধারণের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা ও তথ্য-উপাত্ত ছাড়া জনসভায় বোমা বা গ্রেনেড হামলার মতো ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ বন্ধ করা কঠিন হবে। গোয়েন্দা কার্যকলাপ বাড়াতে হবে উল্লেখযোগ্যভাবে, এ অভিমত তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে শহর-নগর-এর বিভিন্ন এলাকা এবং গ্রামে-গঞ্জে জনগণের বিভিন্ন অংশের সদস্যদের নিয়ে শক্তিশালী সিভিল ডিফেন্স কমিটি গঠন করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এতে একদিকে যেমন গণসচেতনতা বাড়বে, অপরদিকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরকেও গতিবিধির ওপর নজর রাখাও সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জনসভায় দু'টি সাম্প্রতিক গ্রেনেড হামলা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অশনী সংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ হামলা যেখান থেকেই সংগঠিত হোক না কেন তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নতুবা আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অসামান্য ক্ষতিসাধিত হবে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির এ সূচনালগ্নে বিশ্বব্যাপী সকল জাতি যখন সংগঠিত হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে তাদের ভাগ্য বদলের, দারিদ্র্য দূরীকরণের ও সার্বিক উন্নয়নের আশায় তখন আমরা নিজেরা নিজেদের ক্ষত-বিক্ষেত করতে পারি না। ঠেলে দিতে পারি না এমন এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে যা ঘরে ঘরে আমাদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার দুরভিসন্ধি কিংবা চক্রান্ত নতুন নয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে মৌলবাদীদের একটি সম্ভাব্য ঘাঁটি হিসেবেও তুলে ধরার অপচেষ্টা হয়েছে বহুবার। এর সাথে দেশ-বিদেশের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী মহল জড়িত। বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর কিংবা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে তাদের এতো আগ্রহ কেন? এগুলো বুঝেশুনেই আমাদেরকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি জাতি হিসেবে এটি অবশ্যই আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে এবং আপোষহীনভাবে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং তাতে সফল হতে হবে। নতুবা এদেশের অস্তিত্ব কোন দলের জন্যই অর্থবহ হবে না। এতে আমাদের শত্রুদের মনোস্কামনাই পূর্ণ হবে। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে সবার উপরে যারা এ দেশটাকে স্থান দেয়, ভালবাসে, তাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে একে উদ্ধার করতে।

www.pathagar.com

বাংলা বইপত্র প্রকাশ এবং কমিউনিটি বাংলা স্কুল (সপ্তাহান্তে) চালু করার ব্যাপারে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তারই প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার কম্পোজসহ আধুনিক মুদ্রণালয় থেকে তখন প্রকাশিত হয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাংলা সাহিত্য সংকলন ও বইপত্র। এর পাশাপাশি তিনি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) এবং ব্রিটিশ দৈনিক 'দ্য গার্ডিয়ানের' সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন একজন পেশাজীবী সাংবাদিক হিসেবে। পরে লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সংবাদ ম্যাগাজিন 'ওয়ার্ল্ড টাইমস'–এর সিনিয়র এডিটর নিযুক্ত হন।

গাজীউল হাসান খান তিরানব্বই সালে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন বাংলাদেশের ওয়াশিংটনস্থ দূতাবাসের প্রেস ও তথ্য মিনিস্টার হিসেবে। সেখানেও তিনি বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশ এবং বেতার ও টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে নানাভাবে অবদান রেখে বাংলাদেশী সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন। এরপর আবার তিনি আটানব্বই সালে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় বার্তা প্রতিষ্ঠান, 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার' (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। বাসস প্রধান হিসেবে–যথারীতি নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জনাব খান দেশবিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে নিয়মিতভাবে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখে পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশের রাজনীতি ও অধিকার সচেতন মানুষের মাঝে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিবাচক মতামত গঠন এবং বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদমূলক লেখার জন্য জনাব খান বিভিন্ন মহলে সাধুবাদ পেয়েছেন।

বিলেত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবন–জীবিকা নিয়ে আশির দশকে লেখা গাজীউল হাসান খানের ভিন্নধর্মী উপন্যাস, "বিপন্ন জনপদ" এবং তার সম্প্রতি প্রকাশিত "ইতিহাসের অনুঘটক ও অন্যান্য" পুস্তকটি পাঠক সাধারণের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। জনাব খান কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় ১৯৪৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত অবদানের জন্য বেসরকারী পর্যায়ে তিনি বহু পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

ISBN 984 8685 99-5
9 789848 685990